(উপন্যাস)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মিত্রালয়

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

— সাড়ে চার টাকা —

এই লেখকের

মহালগ্ন

ওঅর অ্যাণ্ড পীস

গ্র্যাণ্ড হোটেল

আনাকারেনিনা

কশাকৃস্

মিত্রালয় ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫ ডি. এল্. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীশশধর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

শ্রীচরণে—

এ বই-এর পাত্র-পাত্রীরা কেউই বাস্তব জীবন থেকে নাম বদ্‌লে, বই-এর মধ্যে এসে জোটে নি—এদের কাউকেই আমি চোখে দেখিনি, এরা ছিল কল্পনা-পথের মানসে, কাজেই কোনো চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অসঙ্গতি হয়েছে ব'লে কেউ অভিযোগ করলে লেখকের প্রতি হয়ত একটু অবিচারই করবেন।

ন বেলা বাগানে বড় জাজিম বিছিয়ে বসবার ব্যবস্থা হয়েছে।
র বস্তির সাঁওতাল মাতব্বরও এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে তোয়াজ
সবাই, তার হাতেই নাকি আহার্য্য বা পানীয় সব-কিছুর ব্যবস্থা!
সল কাজের কথাটা নিয়ে বড় একটা কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।
। অনুকূল বার-কয়েক চেষ্টা ক'রে অবশেষে হতাশ হয়ে বল্‌লে—
। এরা কি এখানে গিল্‌তেই এসেছে?
ন বল্‌লে—তা ছাড়া আর কি!
সময় যতীন চৌধুরী ঠোঁটে পাইপ লাগিয়ে এসে দাঁড়াল। সকলেই
যত্ত ক'রে সম্ভ্রম প্রদর্শন করলে।
যতীন চৌধুরীকে বল্‌লে—তাহলে আর মিথ্যে গুল্‌তুনী না
। ফরেস্টের দিকে আজই যাই।
সি হয়ে বল্‌লে—এই ত চাই। I admire you? অনুকূল
তা তোমরা কোথায় যাবে!
থার খেই ধরে জবাব দেয়—এই আশপাশে একটু টিলা আর
পথে সেখানেই—
ধা দিল—না, না, সে হ'তে পারে না। দশ বারো মাইলের
ড়, জঙ্গল আছে। ধরুন সেখানকার ছবি যা হবে দুর্দ্ধর্ষ!
ই বাসাড়েরা পাহাড়ে শুটিং-এ যাবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে
সেই সময়ে যতীন চৌধুরী রমিতার অত্যধিক উৎসাহের
-আপনি যাই বলুন, মিস্ মজুমদার, আমার কিন্তু বনজঙ্গলে
চ্ছ নেই। সেখানে দেখবার মত কিছু নেই।

...টা কথাই ভাবছি। ঘাটশীলায় এসে

এ বই-এর ... যাত্রীরা ...র পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওখানে যাবার

... বাবু! ব'লে বিস্মিতভাবে রমিতা যতীন

...ধুরীর দিকে তাকাল।

যতীন চৌধুরী কলকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তালিকায় সর্ব্বাগ্রে তাঁর নাম দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এরকম জংলা জায়গায় তিনি আসেন না, দিল্লী বোম্বাই-এর চোস্ত চেহারা দেখ্‌তেই অভ্যস্ত। হঠাৎ এবার কয়েকটি লোকের অনুরোধে একটি চলচ্চিত্রের কাজে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন। রমিতাকে পাহাড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠ্‌তে দেখে তিনি পাইপ থেকে ঠোঁটটা মুক্ত করে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটু হেসে বললেন—ওটা আজকালকার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানুষ যত বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলেছে ততই একদল লোক চীৎকার করছে, দাও ফিরে সে অরণ্য! ... বিভূতি বাঁড়ুয্যের বইগুলো পড়েই আপনাদের এই বন দেখবার ...তিক হয়েছে মিস্ মজুমদার! জঙ্গল মানেই এঁদো অন্ধকার আর ...রোগের আড্ডা। সেখানে মানুষ কেন যাবে? কি দেখতে? হ্যাঁ ... সিনেমায় টার্জানের জংলা ছবি দেখ্‌তে আমারও ভাল লাগে। ... তাই ব'... বনবাদাড়ের জন্যে পাগল হতে হবে তার কোনো মানে নেই। মানুষের সভ্যতা তাকে সুন্দরতর জীবনের অধিকার দিয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষ থাকবে নিজের হাতে গড়া সভ্যতার সম্পদে। সমাজে তার কত... —শুধু বনে যাবার জন্যেই বনে যাওয়ার কোনো হেতু দেখিনা। ...সঙ্গে পশুর পার্থক্য ত অস্বীকার করতে পারেন না।

রমিতা হেসে ওঠে, বলে—আচ্ছা বলুন ত, মানুষের সঙ্গে পশু... ...। চৌধুরী মশাই, আপনি যেভাবে পশুর ছোঁয়াচ ... চেষ্টা করছেন তাতে ভয় হয় বুঝি মানুষের কৌলিন্যটা খুব ঠুন্‌কো।

যতীন চৌধুরী দাঁতে পাইপ চেপে বলেন—বন জঙ্গল নয় ... মানুষকে এত বড় করেছে। শুধু চোখে দেখার দৃষ্টিকে ছাপি...

অনুমান এগিয়ে যায় তাকেই বলে পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার পিছনে থাকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। একটা কিছু গ'ড়ে তোলার জন্যেই চাই সেই গভীর দৃষ্টি। সে দৃষ্টি বাইরের রূপের মোহ কাটিয়ে ভেতরের ঐশ্বর্য্যকে অনুসন্ধান করতে চায়। যে মানুষ ব'সে ব'সে শুধুই পরের কাজের তারিফ করে, তাকে আপনি সমঝদার বা রসিক বলতে পারেন কিন্তু আমি বলব অকর্ম্মণ্য। তার কিছু গড়বার শক্তি নেই, তাই প্রকৃতিকে বাহাদুরী দিয়ে নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু জঙ্গলের বাহ্যরূপটুকুর মোহ কাটিয়ে যে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাতে পেরেছে সে-ই ত মানুষের মত মানুষ।

—খনিজ অভিযান ক'রে যারা মাটির মধ্যে সোনার সন্ধান পেয়েছেন তাদের কোলাহল আর দুরন্তকে সম্মান করা উচিত। তাই বলে জঙ্গলের মানুষকে তুচ্ছ করবার কোনো যুক্তি নেই যতীন বাবু। যারা জয় করে কেবল নিজেদের বিলাস স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে, সামান্য নিজের সুখের জন্ত যারা অন্ত কোনো মানুষকে পশুর পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি সেই বণিকের শেখানো কথাই আপনি বলছেন। তারা একদিন সমুদ্র তরঙ্গ অগ্রাহ্য ক'রে এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করবার জন্যে। তাদের লোলুপতাই বনের সুন্দর শ্যামল রূপকে দেখতে দেয়নি— মাটির বুকে যে রস সঞ্চিত ছিল সেইটুকু শোষণ করবার জন্ত লোভ দৃষ্টি দিয়েছে তারা। আপনারও কথায় সেই লোলুপ মানুষকেই দেখছি।

যতীন চৌধুরী অবজ্ঞাসূচক হাসি দিয়ে রমিতার কথাকে লঘু করবার চেষ্টা করে। তার এ হাসির মধ্যে যেন আদেশের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল।

চাকর চায়ের ট্রে এনে রাখতেই আবহাওয়া হাল্কা হয়ে যায়। সবাই আহার্য্যের প্রতি সুবিচারে মনোযোগ দিল। একটি চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। অনুকূল কিছু খাদ্য রমিতার দিকে এগিয়ে দিল। [illegible] করে বল্লে—মশাই, আর দেরি করা ঠিক নয়। এখান থেকে [illegible] পাহাড়ী রাস্তা একটু সময় হাতে নিয়ে বেরুলো [illegible]। [illegible] আপনার ক্যামেরা আর পাঁজরা গুছিয়ে রেখেছেন ত।

অনুকূল বললে—আমার জন্যে কারুর ঠেকবে না, এখন আপনারা হুকুম করলেই রওনা দিতে পারি। আমার এস্টাটপত্তর সব লরীতে ওঠানো হয়ে গেছে।

—ও, তাই নাকি, তবে আমার ক্যামেরা, রিভলবার আর বাইনাকুলারটা নিয়ে আসি।

রমিতা সবার আগে লরীর উদ্দেশে পা বাড়ায়।

যতীন চৌধুরী বলে—মিস মজুমদার বনে গিয়ে কি-এত শান্তি পাবেন? দেখবেন শেষে সেখানেই তপস্যায় লেগে যাবেন না। আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, সঙ্গে যাই।

—না, না, তাতে আবার আপনার নিজেকে হারানোর ভয় আছে, নইলে নিজের পাশেই বসতে বলতাম। নাঃ থাক, বারো মাইল উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ, দুপুরের কাঠফাটা রোদ, খাওয়া-দাওয়ারও কিছু ঠিকঠিকানা নেই—আপনি পারবেন কেন সহ্য করতে!

ব্রজেন দত্ত রিভলবার ঝুলিয়ে বেশ বীরোচিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বললে—এই ত বীরাঙ্গনার কথা। যতীনবাবু, রমিতা মজুমদারকে তর্কে ঠকানো খুব সহজ কাজ নয়, তা জানেন ত? কলেজে ও তর্কের লড়াইতে পুরস্কার পেয়েছিল। ভাবুন একবার, এক কলেজ মেয়েকে হারানো যে-সে কাজ নয়। ছেলেদের মজা হচ্ছে তারা তর্ক করতে পারে বটে কিন্তু সে তর্কের বনেদ থাকে যুক্তির, আর মেয়েদের যাকে বলে এঁড়ে তর্ক। এঁড়ে-তর্কশাস্ত্র রীতিমত কঠিন। কাজেই—

যতীন বললে—সত্যিই ভয় হচ্ছে বাংলার এমন একটা প্রতিভা বাঘের পেটে চলে যাবে? ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুন। তেমন বয়েস থাকলে নিশ্চয় বন্দুক বাগিয়ে আপনাকে আগলাবার জন্য সঙ্গে যেতুম।

ব্রজেন হেসে বললে—ঘাবড়াচ্ছেন কেন। আমার হাতে অগ্নিবান থাকতে বাবজানুকে কিছু করতে পারবে না। আসুন না যতীনবাবু—আমি একাই একশ'। আপনারও দায়িত্ব নিচ্ছি।

যতীন বল্‌লে—যদি যাই তবে অবিশ্যি ব্রজেনের ভরসায় নয়। কাজ নেই, তোমরা যাও, আমি আজ বিশ্রাম করি।

অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ স্বরে যতীনবাবু রমিতার দিকে তাকিয়ে বল্লে—বেশ লাগ্‌ছে এখানে আলস্য করতে। আমার মতে, রমিতা তুমিও না গেলেই পারতে। তোমার ও-ছবির 'টেকিং' কেটে-জু'ড়ে 'সেট' করা ইডিওতে ব'সে ব'সেই হয়ে যাবে। তুমি বরং থেকে যাও। বনে বনে টো টো করে ঘুরলে মিথ্যে হয়রানী হবে, শরীরটাও খারাপ হবে, রঙ কালো হয়ে যেতে পারে।

রমিতা ঘোরতর বেগে ঘাড় নেড়ে বলে—রং-এর জন্যে অনেক করেছি চৌধুরী মশাই। ওতে রস পাই নে আর। আপনি বাধা দেবেন না।

—কিন্তু সে জন্তুজানোয়ারের রাজ্য। জানো, লাকাইসিনির জঙ্গলে হাতী থাকে। আমার মতে এসব risk না নেওয়াই ভালো। নামজাদা একজন সাহিত্যিক কিন্তু বলেন Beauty with safety and comfort is ideal, মানে, আরামই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য! আর নিরাপত্তা ত গভর্ণমেন্ট আইন ক'রে ধরে রাখতে চায়। তাহলেই বোঝো—

বেশ ঝাঁঝালো গলায় রমিতা বলে—আপনার কথায় মনে হ'চ্ছে লেখকটি নিতান্তই সাহিত্যের অধ্যাপনা ক'রে থাকেন, অথবা খবরের কাগজের সম্পাদক। এক কাজ করুন, ওই ভেতো লেখকটিকে বরং কিছু মূলধন দিয়ে কারবারে নামিয়ে দিন। টাকা মার যাবে না, অবিশ্যি এটাও ঠিক একটা কানাকড়িও মুনাফা হবে না। একটি অনুরোধ করে যাই, একবার সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বেড়াতে যাবেন,—খুব কাছেই! সেখানে সৌন্দর্য্য আছে, বিপদেরও ভয় নেই! ভাত ত হজম হবেই। আর দেখবেন আপনার পূজ্যপাদ আই. সি. সি কিভাবে সুবর্ণরেখার গলায় পা দিয়ে কাজ আদায় ক'রে নিচ্ছে। জয় বিজ্ঞানের জয়—নদীর জলে চড়া পড়েছে জলের রং কালো হয়েছে আপনাদের বিজয় কলঙ্কে। আপাততঃ আপনার মহামূল্য জীবনকে নমস্কার ক'রে বিদায় নিই।

ব্রজেন প্রতিবাদ করে—আপনার জীবনেরই মূল্য কি কম, মিস্ মজুমদার! আপনার জীবন এত অকিঞ্চিৎকর হলে আমি যেতাম না।

রমিতা ঘাড় বাঁকিয়ে তীর্য্যক কটাক্ষে কৌতুকের লহর তুলে বল্‌লে—বলেন কি, আপনি আমার জীবনের দায়িত্ব নিচ্ছেন? হাবভাব দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে দেহরক্ষী হয়েই চলেছেন ব্রজবাবু!

—আজ্ঞে দেহরক্ষীও বল্‌তে পারেন!

—তাই বলুন, দেহের আমার কিছু দাম আছে। জীবনের কোন মূল্য নেই।

ব্রজেন বাধা দিয়ে বল্‌লে—আপনার ওপর অনেক আশা আছে আমাদের ফিল্‌ম্‌ ইন্‌ডাস্‌ট্রির, কাজেই এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারব না।

—আজ পারছেন না, দু'দশ বছর পরে পারবেন—যখন আমার দেহের জৌলুষ নিভে যাবে তখন।

ওদিকে অনুকূল গাড়ী থেকে চীৎকার করছে শোনা গেল—কই, আপনারা যাবেন নাকি ব্রজেন দা! রমিতাদি আসুন।

বি. এন. আর লাইন পার হয়ে দু'খানা লরী গালুডি যাওয়ার গৈরিক-বসনাঞ্চল-বিছানো পথটুকু বাঁদিকে রেখে সাম্‌নের জঙ্গলে প্রবেশ করল। সকালের তরুণ রোদের মায়াতে কিশোরীর কোমলতা, সংকীর্ণ পথের পাশে ইতস্তত ছড়ানো পাথরের গায়ে শিশিরের রেণুগুলি তখনও শুকিয়ে যায় নি। পাতায় পাতায় বনের সবুজ সৌরভ। এখানে সভ্যতা হারিয়ে গেছে। শালের জঙ্গল—তার মধ্য দিয়ে অসংস্কৃত পথ, উঁচুনীচু। আশপাশে বসতির কোনো চিহ্ন নেই। লরীর হৃৎস্পন্দনের প্রতিধ্বনি পাথরের বুকে ধাক্কা লেগে ফিরে আস্‌ছে।

বুরুডিপাস ছাড়িয়ে গাড়ী আবার নীচে নামল। মনে হ'ল ওঠানামার পালা বুঝি এখানেই সমাপ্ত। সমতল পথ। ব্রজেন এতক্ষণ বুরুডির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাসের দৈন্যে বিধ্বস্ত করেছে। রমিতার কানের কাছে অনবরত 'আহা, উহু' ক'রে উত্যক্ত ক'রেছে। সমতলে এসে নামতে তার মুখরতা যেন ক্ষান্ত হয়। মোটরের গর্জনও কমল। এতক্ষণ ষ্টিয়ারিং ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল আর একটা গম্ভীর গর্জনে পাশের প্রস্তরাকীর্ণ উঁচু বনভূমিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে অস্বাভাবিক আতঙ্কের সঞ্চার করছিল।

সকলে নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসল। রমিতাকে অনুকূল প্রশ্ন করে—রমিতাদি, কোনো অস্বস্তি হচ্ছে না ত।

রমিতা শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়। ও যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না। ওর মন এ রাজ্যে নেই।

অনুকূল বলে—পাহাড়ে উঠ্‌তে নাম্‌তে অনেকের গা গুলিয়ে বমি আসে কি না, তাই বল্‌ছিলাম।

সে কথারও কোনো জবাব এল না রমিতার তরফ থেকে।

গাড়ি আবার গর্জন করতে করতে উপরে উঠ্‌তে শুরু করেছে। রমিতার চোখে মুখে শূন্য অভিব্যক্তি আরও ঘনিয়ে এল, আরও নিবিড় হয়ে। দেখ্‌লে মনে হয় ওর বাহ্যজ্ঞান নেই। কি এক স্বপ্নের ঘোরে ও বিভোর।

এক এক জায়গায় গাড়ির গতি এত মন্থর হয়ে আসে, মনে হয় থেমে যাবে, পাহাড়ের চড়াই এখানে সরল রেখার মত খাড়া উপর দিকে উঠে গেছে। লরীটা আস্ফালন করছে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে, যেন হাঁপিয়ে গেছে। ড্রাইভারের মুখচোখে একটা হিংস্রতা ফুটে উঠেছে। পাহাড়কে সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে।

কিছুদূর এসে গাড়ি থেমে গেল। ড্রাইভার বল্‌লে—বাবুসাহেব গাড়ি আর যাবে না, পথ এখানে শেষ।

সামনে কোনো রাস্তা নেই। ঠিকাদারেরা জঙ্গলের গাছ কাটতে কাটতে এতদূর পর্য্যন্ত এসেছে এবং কাঠ নিয়ে যাবার জন্ত তারাই রাস্তা তৈরী করেছে। দেখা যাচ্ছে এখানে আরও গোটা দুই লরী দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ পথে কোনো জনচিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি, কেবলমাত্র কুলুখোর যাবার পথটা যেখানে অন্তদিকে চলে গেছে, তার কাছাকাছি দু'তিনটে খোলার কুঁড়ে নজরে পড়েছিল। ওপরে গাছ কাটা হচ্ছে, তার ঠক্‌ঠক্ শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে পাহাড়ের ঘন অরণ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কাঠুরিয়াদের মিলিত কোলাহল অরণ্যের স্তব্ধ মৌনতাকে উচ্চকিত করে তুলেছে। একখানা গোরুর গাড়ি এক পাশে পড়ে আছে।

বনকাটাদের একজন লোক এদের লক্ষ্য করে আপন মনেই বেশ জোরে জোরে বলে—এরা আবার এখানে কেন এসেছে।

অনুকূল জবাব দিলে—এই বেড়াতে এলাম একটু।

লোকটি আশা করেনি বাবুরা তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারেন। সে অনুকূলের দিকে অপ্রতিভভাবে চেয়ে রইল। তারপর সলজ্জভঙ্গিতে খাটো কাপড়খানা টেনে হিঁচড়ে হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল—শিকার করতে এসেছেন, ত' মেয়েছেলে সঙ্গে কেন?

ব্রজেন বল্‌লে—উনি একজন ভালো শিকারী!

তারপর আড়চোখে রমিতার দিকে তাকাতেই ওর কৌতুকময়ী দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়।

একটু ভিতরে ঢুকে মনে হ'ল এখনও এখানে দিনের খবর পৌঁছয় নি; যেন কোথাও রৌদ্রের বিন্দু পর্য্যন্ত এসে পড়েনি। আশপাশে বড় বড় গাছ। রমিতা সব গাছ চেনে না, চেনে শুধু শাল গাছ। তা ছাড়া যেসব গাছ দেখা যাচ্ছে সেগুলি ওর কাছে একেবারে অপরিচিত। গাছের গায়ে গায়ে অপূর্ব্ব লতাগুল্ম! যেন তপস্বী কোনো বন-ঋষির মাথায় জটাজুট। দু'পাশে কালো রুক্ষ গম্ভীর পাথর দিয়ে ঘেরা পাহাড়, সেই পাথরের রুক্ষতাকে সুশ্যাম সৌন্দর্য্য দিয়ে কামনার মত জড়িয়ে রয়েছে নাম-না-জানা অজস্র লতা, গাছ আর ফুল, ফল। অরণ্য। এ কোন্ পৃথিবী!

রমিতা বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়।

অনুকূল বল্‌লে—আমরা এখানেই কাজ সারতে পারি, তবে মনে হচ্ছে আর একটু ওপরের দিকে গেলে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছনো যেতো। এর চেয়ে সেসব ভালো যায়গা।

ব্রজেন রিভল্‌বারটা একবার হাত দিয়ে অনুভব ক'রে বলে—আবার ওপরে কেন? এখানেও তোমার dense forest—! বাবা এসব কেদ্দানী কায়দার কোনো দরকার ছিল না। কত যে পাহাড় পর্বতের ছবি কলকাতায় ব'সে ব'সে উঠে গেল তার ঠিক নেই।

কিন্তু অনুকূলের উৎসাহের আতিশয্যে ব্রজেনের ক্ষীণ আপত্তি পরাস্ত

হ'ল। দু'জন কুলী ওদের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আগে আগে চল্‌ল। পথ ব'লে তেমন কিছু নেই। পায়ে চলা বন-পথ। লোক চলাচলের কোনো চিহ্ন নেই। সর্বত্রই জঙ্গল। তবে এ অঞ্চলের অরণ্যের বৈশিষ্ট্য, ছোটখাট আগাছার ভিড় বড় একটা নেই। মহীরুহের সমারোহ।

ওদের সঙ্গে এ অঞ্চলের একজন পাহাড়ী ক্রীশ্চান 'ফরেষ্ট গাইড' রয়েছে। সে-ই পথ দেখিয়ে চলছে। ব্রজেন তাকে প্রশ্নবাণে অস্থির ক'রে তুলেছে—আচ্ছা এখানে এই সময়ে বাঘ বেরুতে পারে না? কত বড় বড় সাপ আছে? গাঁয়ের মধ্যে ভালুকে কুল খেতে যায়, সত্যি নাকি? এবং লক্ষ্য করলে দেখা যেত ব্রজেনের একটি হাত সদাসর্ব্বদা রিভলবারের গা ছুঁয়ে আছে।

খানিকদূর ওঠবার পর অন্ধকার অনেকটা হাল্কা হয়ে এল। অম্বুকূল এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি, সে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—শুনলেন ব্রজেনবাবু, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কিছু একটা চলে গেল!

গাইডটি বল্‌লে—ও কিছু নয়, হয়ত বনমুরগী হবে। এখন ভারী শিকার বড় একটা বেরোয় না।

ভারী শিকার বল্‌তে সাধারণত বাঘ নেকড়ে ভালুক ইত্যাদি বোঝায়।

ব্রজেন বল্‌লে—কিছু বলা যায় না। আর এগোবার দরকার কি?

গাইড মোরেন বল্‌লে—আর একটু উঠলে আপনারা ধারাগিরির আসল মুখটা দেখ্‌তে পাবেন। নীচে যে ধারাগিরির ঝরণা দেখচেন তার মুখ এই ওপরে। এখান থেকে জল নামছে।

রমিতা বলে—বেশ ত, গেলেই হয়।

মোরেনকে একটু চিন্তিত দেখা গেল।—অবিশ্যি একটা মস্ত পাথর ডিঙোতে পারলে খুব কাছে হ'ত। কিন্তু সে আপনাদের কাজ নয়। একটু ঘুরে ওপরে গেলে সেখান থেকেও দেখা যাবে সব।

ধারাগিরির উৎসমুখে এসে সবাই শিলাখণ্ডে ব'সে পড়ে। পাহাড়ের খাড়া পথে উঠতে সকলেই ক্লান্ত হয়েছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। দু'পাশে খাড়াই পাহাড়, মাঝখানে নীচ দিয়ে শীর্ণ জলধারা পাথরের

অসমতল খাঁজে খাঁজে বাধা পেয়ে জমে গেছে—একটা ক্ষীণ অবিচ্ছিন্ন রেখা নীচে নেমেছে। আরও খানিকটা নীচে, হঠাৎ পাহাড়টায় যেন ধ্বস নেমেছে। তার নীচে ঝর্ ঝর্ ধারায় ঝিমন্ত পরিবেশ মুখর ক'রে জল পড়ছে। সেই জলধারা অন্ধকার রহস্যাবৃত পথে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে।

পাখীর ডাক এখন আর শোনা যাচ্ছে না, মধ্যাহ্নের রোদ গাছের ফাঁকে ফাঁকে নীচের জলের ওপর পড়ে চিক্-চিক্ করছে। পাখীরা থেমেছে, কিন্তু ঝর্ণার মুখর ধারা সঙ্গীতের রেশ টেনে চলেছে।

ব্রজেন চীৎকার করে উঠ্‌ল—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! আহা-হা-হা, কী সুন্দর।

রমিতা ভ্রূকুটী ক'রল—অত চেঁচিয়ে সবাইকে বিরক্ত করছেন কেন? একটু শান্ত হয়ে বসুন ত! আপনি কি মনে করেন খুব খানিকটা চেঁচালেই সুন্দর জিনিসকে সুন্দর করে দেখা যায়? না দুটো চোখ থাকলেই সব কিছু দেখা যায়!

ব্রজেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়ে বলে—মাপ করবেন, বুঝতে পারিনি।

পরক্ষণে সে আবার বলে ওঠে—আমার মনে হচ্ছে যেন একটু এই পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেলে খুব চমৎকার beauty spot পাওয়া যাবে। যাবেন, মিস্ মজুমদার?

রমিতা আস্তে আস্তে পাথরের ওপর পা রেখে রেখে শাড়ী সাম্‌লে নীচে নেমে যায়। ব্রজেনও তাকে অনুসরণ করে চল্‌ল। বাঁকের কাছে এসে দেখা গেল দু'পাশ বেদীর মত বাঁধানো। মনে হয় এখানে কা'রা অনেকদিন আগে একটা সেতু গড়েছিল। রমিতা বলে—এ কালভার্টটা কিসের?

—ওটা ম্যাঙ্গানীজ কোম্পানী তৈরী করেছিল। শুনেছি, বরাবর এইরকম বাঁধানো কালভার্ট নীচ পর্য্যন্ত রয়েছে। প্রত্যেক বাঁকেই এরকম কালভার্ট দেখতে পাবেন। জানেন, এই ম্যাঙ্গানীজ কোম্পানীটি স্রেফ রাস্তাঘাট তৈরী ক'রেই চৌদ্দ লক্ষ টাকা ফুঁকে দিয়ে দেউলে হয়ে উঠে গেছে।

—তাই নাকি! সত্যি ওদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আজ যদি তারা কৌত হয়ে না যেতো তাহলে বনের এই সৌন্দর্য্য কোথায় থাকৃত তাই ভাবি।

ব্রজেন হঠাৎ রমিতার হাত চেপে ধ'রে বলে—তুমি রাগ ক'রেছো রমিতা? বুঝতে পারি যে অন্যায় হচ্ছে কিন্তু তোমায় দেখলে চুপ ক'রে থাকতে পারি না কিছুতেই। এবারের মত মাপ চাইছি।

রমিতা ব্রজেনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর, আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বল্‌লে—এ ত শুধুই মাপ চাওয়া নয়, আরও বেশি কিছু চাইছেন দেখ্‌চি। তাহ'লে স্পষ্টই শুনুন, তখন রাগ করিনি, কিন্তু এখন করছি।

ব্রজেন ওপরের দিকে লক্ষ্য করল, না, কেউ এদিকে আসছে না। সে বল্‌ল—ব'স, এইখানে একটু ব'স। অনেক কথা বল্‌বার আছে।

রমিতা নিঃসঙ্কোচে বসে প'ড়ে বল্‌লে—বলুন। কিন্তু বিশেষ অনুরোধ, আজ আর ওইসব ভালোবাসার জোলো কথা বল্‌বেন না। তার জন্যে অনেক বাজে সময় পাওয়া যাবে। ওসব না বলেও ত আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে পারেন। বনের জন্তুদের কাছে মানুষের কলঙ্কের খবরটুকু দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

রমিতার কথাগুলি ব্রজেনের কাছে গুরুগম্ভীর মনে হয়। অনেক আশা নিয়ে সে আজকের এই দুঃসাহসিক অভিযানে এসেছে। একটা পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে ব'সে ব্রজেন ক্যামেরাটা নিয়ে তোড়জোড় করছিল। এত সহজ হাল ছাড়বার পাত্র নয় সে। একসময়ে বল্‌লে—একটু এ পাশ ফিরে ব'স ত রমিতা!

রমিতার বিভিন্ন ভঙ্গির অনেকগুলি ছবি তুল্‌লে ব্রজেন। অবশেষে রমিতা বল্‌লে—ওই গাছটার একটা ছবি তুলুন না।

ব্রজেন বলে—আম গাছের আবার ছবি কি!

—আমগাছ নাকি ওটা! তা হোক, বড় চমৎকার ভাবে ওর ডালগুলো জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। আর ওই মোটা মোটা লতাগুলো কেমন পারের গাছটায় জড়িয়ে গেছে? তুলুন, তুলুন—একখানা ছবি ওর তুলুন। গাছের ছবি ভালো লাগে না আপনার?

ব'লে রমিতা ব্রজেনের হাত ধ'রে মৃদু ঝাঁকানী দেয়। এরপর ব্রজেন

অবশ্যই আম গাছের ছবি তুলল—ওটা আমগাছ না হয়ে যদি কচুগাছ হ'ত তাতেও ব্রজেনের আপত্তি হবার কথা নয়।

পিছন দিকে শুকনো পাতায় কি যেন একটা শব্দ হয়। শব্দটা বেশ জোরে জোরে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। চম্‌কে উঠে ব্রজেন ফিরে তাকালে। দেখা গেল অজস্র শুকনো পাতা একসঙ্গে এলো-মেলোভাবে উড়ছে। নিমেষের মধ্যে পাতায় পাতায় গহ্বরটা ছেয়ে গেল। জলের উপর শুকনো পাতাগুলো ভাস্‌তে লাগল।

রমিতা হেসে বলে—ভয় পেয়েছিলেন ত খুব! ভাবলেন, বুঝি এবারে রঙ্গ কর্‌তে এসে প্রাণটাই বেঘোরে যায়! তারপর পাতায় ঢাকা সঙ্কীর্ণ জল রেখার দিকে তাকিয়ে কতকটা আত্মগত ভাবে রমিতা বল্‌লে—ঝরাপাতার গান বুঝি একেই বলে, না ব্রজেন বাবু!

—তোমার আর কি বলো, বেশ কাব্য করছো। তোমায় নিয়েই বিপদ আমার। নিজে যে ঠিক ভয় পেয়েছিলুম তা নয়। হাসছ কিন্তু এসব বনে কোথা দিয়ে কি আসে তার ঠিকানা নেই।

ব'লেই সে রিভলবারটা কেস থেকে খুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরলে। পরমুহূর্ত্তে বনের শান্ত মৌন পরিবেশ কেঁপে ওঠে গুলী ছোড়ার শব্দে।

রমিতার কানমাথা উষ্ণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় কি যেন একটা প্রলয় ঘটে গেল।

ব্রজেন উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লে—দেখেচো আমগাছের মাথায় যে লতাটা ঝুলছিল সেটা ছিঁড়ে গেছে। এ হাতের দাম দেয় কে?

রমিতার বিরস মুখভাব দেখে সে একটু দমে গেল। বিষণ্ণ আবহাওয়া কাটাবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে সে রমিতার হাতে রিভলবারটা দিয়ে বল্‌লে—শিখ্‌বে? গুলী ছোঁড়া শিখ্‌বে?

—না, না। লতাটা নষ্ট করলেন শুধু শুধু! পুরুষমানুষের মন এমনই হয় বটে। অকারণে তারা যে কোনো কোমলতাকে ছিঁড়ে দেয়। একবার ভাব্‌লেন না ব্রজেনবাবু! কি লাভ হ'ল?

—কেন, কি হয়েছে! তোমার মত স্মার্ট মেয়ের মেয়ের মুখে এরকম

পুতুপুতু কথা মানায় না। শক্ত হও। আচ্ছা, একবার নিজে হাতে পরখ করো দেখবে মনটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। রিভলবার কেন শিখবে না! ধরো এটা, ভয় কি।

আগ্নেয়াস্ত্রটিকে দেখে যত হাল্কা মনে হয়—রমিতা হাতে ক'রে দেখলে সেটা আকারের তুলনায় রীতিমত ভারী। কেমন অস্বস্তিকর শীতল এর স্পর্শ। যেন সাপের গায়ের মত ভয়ঙ্কর এর মসৃণতা। রমিতার ইচ্ছে করে সর্ব্বনাশা যন্ত্রটা এখনি ওই নীচের অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দেয়। অসহ্য এ স্পর্শ। তবু একটা কৌতূহলে ওর হাত-পা ঝিম্-ঝিম করতে লাগল।

ব্রজেন হাতে ধ'রে গুলী করার কৌশলটা দেখিয়ে দিলে রমিতাকে।

অগ্নিগর্ভ অস্ত্রটি হাতে ক'রে রমিতার দেহটা কেমন যেন কাঁপতে থাকে। ওর মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সর্ব্বনাশের পক্ষে এর একটি গুলীই যথেষ্ট।

ব্রজেন বলে—এইবারে বেশ ভালো ভাবে লক্ষ্য করো—গাছের গায়ে ওই যে কালো দাগটা দেখতে পাচ্ছ ওইটা তোমার শিকার। ওটাতে গুলী লাগাতে হবে।

রমিতার কানে সে কথা যেন পৌঁছয় না। ওর মনে হয় কোনোরকমে এই সর্ব্বনাশা বস্তুটির হাত হতে পরিত্রাণ পেতে হবে। কি ওর লক্ষ্য, সেটা কতদূরে, কিছুই ভাবতে পারে না রমিতা। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, মনের মধ্যে অহেতুক একটা আতঙ্কের দুঃসহ যন্ত্রণা। ও তাড়াতাড়ি চোখ বুজে হাতের চেটো দিয়ে যন্ত্রটার পিছন দিকে চাপ দিয়ে ঘোড়া টিপলে। তারপর এক মুহূর্ত্তের জন্ত ওর জ্ঞানবুদ্ধি সমস্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি রিভলবারটা ব্রজেনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রমিতা মাটিতে অবসন্নভাবে ব'সে পড়ল। ফলাফল দেখবার কথাটা ভুলে গেছে। রিভলবারের হাত থেকে মুক্তি পেয়েও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পেছন থেকে অনুকূল বললে—ব্রাভো, দিদি আর একটা শট্, ক্যামেরা তৈরী হয়ে গেছে। নিন্ উঠুন। এটা আমাদের ছবির সঙ্গে জুড়ে দেবো। দেশের লোক জানবে বাংলা দেশে বীণা দাস ছাড়াও অন্ত মেয়ে আগুন নিয়ে খেলা করতে পারে। The idea.

রমিতা শিথিল ভাবে পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলে—আমি পারব না। আর তা ছাড়া কার সঙ্গে কার তুলনা করতে পারা যায় সে বুদ্ধিটুকুও যাদের নেই ওদের কোনো কথায় আমি নেই।

ব্রজেন ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে—একটু চা খেয়ে নিন্।

—না না, ঠাণ্ডা জল দাও আমায়।

দূর থেকে সচকিত গোরুগুলির হাম্বা রব ভেসে আসে। পাখীরা ডানা ঝট্‌পট ক'রে উড়ে যায়। বারুদের গন্ধ যেন বনের পবিত্র পরিবেশকে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। একটু ধূসর ধোঁয়া জমেছে গাছের মাথায়।

ব্রজেন লাফিয়ে উঠ্‌ল—The idea, এটা ত বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দিলে খুব চমৎকার stunt হবে।

নিতাই চৌধুরী বল্লে—কিন্তু বই-এর সঙ্গে যে কোনোই সামঞ্জস্য থাকৃছে না হে। বেখাপ্পা একটা 'বাহাদুর কী লেড়কী' গোছের ব্যাপার—

অনুকূল জবাব দেয়—কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ এই সবই চায়। জীবনে যাদের কোনোই বৈচিত্র্য নেই তাদের কাছে রক্ত চন্‌চনিয়ে ওঠার মত কিছু একটা হ'লেই হ'ল।

নিতাই চৌধুরী ঝানু লোক, সে সায় দিয়ে বল্‌লে—ঠিক হয়েছে। রমিতা দেবী আপনি ঘাব্‌ড়াবেন না।

প্রতিবাদ ক'রে রমিতা বল্‌লে—কিন্তু বই-এর সঙ্গে 'লিঙ্ক্' থাকৃছে না,—

ব্রজেন দু'হাত শূন্যে ছুড়ে বলে—আলবৎ বই-এর সঙ্গে লিঙ্ক্ থাকবে। দরকার হলে গল্পের প্যাঁচ পাল্টাতে হবে। সেজন্যে ভাববেন না, লেখককে ত টাকা দেওয়া রয়েছে। এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি আমরা। সব আগে mass appeal—যাকে বলে Success!

—তাই বলে প্রেমের কাহিনীর বইটা রিভল্‌বারের গুলী দিয়ে নষ্ট করবেন?

রমিতা যেন লেখকের পক্ষ নিয়ে কথা বল্‌ছে।

ব্রজেন বলে—বুঝতে পারছেন না, সূক্ষ্ম রসের রসিকরা আমাদের বাংলা ছবি দেখতে আসে না, যারা আসে তারা চায় mass appeal.

রমিতা তবু বল্লে—আমার কিন্তু জনসাধারণ সম্বন্ধে এত অশ্রদ্ধা নেই ব্রজবাবু। আপনাদের রুচিটা জনসাধারণের দোহাই দিয়ে চালান দেওয়া হ'ল আপনাদের পুরনো অভ্যাস।

নিতাই চৌধুরী ওদের তর্কের অবসান ঘটিয়ে বলে—ওসব মুলতুবি রেখে এখন কাজের-কাজটুকু সেরে নিন্। যদি তুলতেই হয় তবে প্রস্তুত হয়ে নিন্।

অনুকূল বল্লে—উঠুন দিদি। ব্রাণ্ডি দেবো? বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।

রমিতা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, বলে—না, কিছু দরকার নেই। এবারে আমি সাম্‌নে তাকিয়ে, লক্ষ্য ঠিক রেখে গুলী ছুঁড়ব। আসুন ব্রজেন বাবু ব্যাপারটা আর একবার বুঝিয়ে দিন ত! এবারে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ!

বেলা পড়ে আসছে। আবার রোদের সোনালী রং কোথায় লুকিয়ে গেছে। ছায়ায় ছায়ায় পাহাড়ের পরিবেশ প্রশান্ত।

ব্রজেনকে অনুকূল তাড়া দিয়ে বল্লে—আমি অনেক খেটেছি, এবারে ব্রজ দা আপনি ওপরের দিকে গিয়ে দু'চারটে 'স্পট' ধরুন! আবার শেষকালে আপনিই দেরী করিয়ে দেবেন।

ব্রজেন বিমর্ষ ভাবেই এগিয়ে যায়। তার পিছু পিছু আর সকলে চলে গেল। শুধু রমিতা একান্তে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। রমিতা বল্লে—আপনারা Spot selection করুন। আমি একটু জিরিয়ে নিই ততক্ষণ।

অনুকূল আপন মনেই বলে—এখানে কিন্তু আপনাকে একা ফেলে যেতে পারব না।

রমিতার চূর্ণ কুন্তলের দু'একটি কপালের ওপর এসে পড়ে ক্লান্ত-সৌন্দর্য্যে মোহ সৃষ্টি ক'রেছে। অনুকূল সামনের দিকে একবার তাকায়, পুনরায় তার দৃষ্টি ফিরে আসে রমিতার মুখের ওপর। কয়েক মিনিট এই ভাবে নীরবে কেটে যায়। তারপর অনুকূল অদূরে একটা শিলাখণ্ডের উপর পা তুলে দিয়ে গালে হাত দিয়ে রমিতার কাছে সরে এসে দাঁড়ালে।

অনুকূল এগিয়ে আসতেই রমিতা সোজা হয়ে উঠে বসল। ওর চোখে সংশয়ের ছায়া পড়েছে। মুখে বিরূপতার আভাষ।

অনুকূল সঙ্কুচিত ভাবে বলে—একটা কথা বলব?

রমিতা ভ্রূকুটীদৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—কি?

—অমন জ্বলন্ত চোখের দিকে চেয়ে কথা বল্‌তে সাহস হচ্ছে না। একটু বরাভয় পেলে আবেদন জানাতে পারি।

পাখীর কাকলিতে মুখর হয়ে উঠ্‌ল বনভূমি। দমকা হাওয়ায় শুক্‌নো পাতায় সাড়া জাগে। আর সেই হাওয়ার দোলায় দুলে ওঠে ধাতুপ ফুলের রক্তিম গুচ্ছ।

অনুকূল ইসারা ক'রে একটা দোদুল্যমান লতাবেষ্টিত গাছের দিকে দেখিয়ে বলে—ওই কুচো কুচো বেগুনী রঙীন ফুলগুলো কেমন লাগ্‌ছে।

—সুন্দর। কিন্তু তোমার কথাটা কী, বল্‌লে না ত?

অনুকূল যেন শেষের কথাগুলো শুন্‌তে না পেয়েই বলে—আর এই নিকষ কালো পাথরের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঝির্‌ঝির্‌ করে নীচের দিকে চলেছে—ওই ওপাশে কেমন সুন্দর প্রজাপতি বসেছে, না!

—আহা ওর ডানায় কি রঙের বাহার।

—ভারী সুন্দর!

ব'লে অনুকূল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রমিতার দিকে তাকায়। আবেশবিস্তৃত আয়তচোখের গভীর চাহনী মেলে দিয়ে রমিতা বলে—বনের এত রূপ!

—একটু আগে ত সেই রূপেরই কথা বল্‌ছিলাম। সেই সময়ে আমার মনে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ছবি ভেসে উঠ্‌ল। এই মুহূর্ত্তে সেটা যেন জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে! আমায় যেন পেয়ে বসেছে।

—কথাটা কি? ভালো ক'রে খুলেই বলো না।

বারকয়েক ঢোক গিলে, উঁচু একটা গাছের দিকে তাকিয়ে অনুকূল মৃদুস্বরে বল্লে—এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো মানবীর নগ্ন ছবি তুলে নেবো। চারিপাশের এমন অকুণ্ঠ সৌন্দর্য্য বিকাশের সঙ্গে নিরাভরণ নারীর সৌন্দর্য্যে সুন্দর ছবি হয়। সে ছবি অপূর্ব!

রমিতা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অনুকূলের দিকে তাকিয়ে বলে—তোমার চোখে বর্ব্বর মানবের আদিম তৃষ্ণার আভাস ফুটে উঠ্‌বে না?

—সকল সন্দেহের অতীত হয়ে? সে কথাটা কি ক'রে বল্তে পারি, এতখানি জড় আমি নই। তবে খোলা মনে বল্‌তে পারি, যে-মুহূর্তে আবার এই ইচ্ছা মনে জেগেছে সে সময়ে বাসনার কোনো উগ্র আলা ছিল না। আমি শুধু সামঞ্জস্যের কল্পনায় আপনার কাঠামোকে মনে মনে সব আবরণ, সব আভরণ মুক্ত ক'রে দেখেছি। আপনার মত এমন সাধারণ সৌন্দর্য দুর্লভ। তারকতা নয়, সত্যি বল্‌ছি।

—না, না, তুমি জান না বলেই এসব বলছ। বনকে উৎপীড়িত কোরো না।

—কিন্তু শিল্পীর সৌন্দর্যপিপাসার দাবীকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আপনি ভুলে যান এখানে কোনো মানুষের উপস্থিতি। মনে করুন আদিম যুগের মানুষ, যার মনের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে বনের পাতার কোনই তফাৎ ছিল না, যারা সভ্যতার মুখোশে নিজেকে লুকোয় নি। এক মুহূর্তের জন্য একবারটি আমার এই অপূর্ব দৃশ্যের সুযোগ পেতে দিন। সভ্যতাকে মুছে ফেলুন। যে বনকে আপনি দেখতে এসেছেন তার কাছে নিজেকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করুন।

রমিতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—আমি সব পারি। আমার ত বাধা নেই, কিন্তু আপত্তি এই যে, তুমি অনর্থক একটা বাজে গোঁড়ামীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। এটা তোমার Snobbery-ও হতে পারে।

—তা যদি মনে করেন তবে প্রতিবাদ করব। অবশ্য আপনার অসম্মত হওয়া এক কথা, কিন্তু আমার মনোবৃত্তিকে বিকৃতভাবে বিচার করবেন এটা ভালো লাগ্‌ছে না। বেশ ত, আপনি বলুন সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। কিন্তু সেটা লুকোবার জন্যে আমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে কি লাভ হবে? অন্য মেয়ে হলে বল্‌তাম না, তবে আপনার মনের প্রসারতায় আমার আস্থা ছিল যে আর্টের খাতিরে আপনি এটুকু পারবেন।

—বেশ, তবে তাই হোক্‌। তোমাকে খোল আনা বিশ্বাস করছি।

ব'লে রমিতা একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে নিলে। জলের ছল্ ছল্ শব্দ, পাতার মর্ম্মর, সহসা এই মুহূর্তে ওর কানের কাছে তীব্র, জাগ্রত হয়ে উঠল—সঙ্কোচের ব্রীড়া যেন সহসা ওকে কুণ্ঠিত ক'রে তোলে। গাছের ডালে একটি পাখী ব'সেছিল, হাতের ইঙ্গিতে রমিতা পাখীটিকে সরে যেতে

ইসারা করল। তারপর একমুহূর্তের মধ্যে আত্মবিজয়িনী নারী বনসৌন্দর্য্যের পটভূমিতে এঁকে দিল আপন মূর্ত্তি। এ নারী অনন্তকালের রমণী, এ রমণী জীব-জগতের প্রতীক! এ প্রতীক পুরুষের চোখে পরম বিস্ময়—অন্ধকারে ঢাকা পৃথিবীর অন্তরের মতই রহস্যময়ী। যুগপরিক্রমার প্রতিটি মুহূর্ত্তে তার সেই বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি আঘাত ক'রে মানবীর মনে একটিমাত্র প্রশ্ন চিরজাগ্রত রেখেছে—"আমার মধ্যে কি এত সম্পদ, কি আছে অনাবিষ্কৃত গূঢ় গোপনতা ?" বিস্মিতের বিহ্বলতা তাকে সচকিত করে, মূক মৌনতায় সে আবিষ্ট হয় আপন রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্রতে। সেই তন্ময় আত্মবিকাশের মুহূর্ত্তগুলিই কি যৌবন ? যার সঙ্গে আদিম জিজ্ঞাসার অঙ্গীকার স্বাক্ষরিত রয়েছে, যে অঙ্গীকার কালপ্রবাহকে অতিক্রম ক'রে রূপের উপান্তকে স্পর্শ করবার দুস্তর সাধনায় সৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে চলেছে!

এক চমকে 'ফ্ল্যাশ বাল্‌বে'র আলোটা জ্বলে উঠে পিছনের আমগাছের মাথায় হারিয়ে গেল। কতকগুলি পাখী কলরব করে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যাওয়ার শব্দ ঘনীভূত পরিবেশকে কেমন হাল্কা ক'রে দিল যেন।

অনুকূল একবার ক্যামেরাটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যদিকে ফিরে চাইল।

ছবি তোলার পর থেকে যেন রমিতা একটা দূরত্ব র[illegible] করতে চায়। চল্‌তে চল্‌তে রমিতা বল্লে—অনুকূলবাবু।

অনুকূল ফিরে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়—কি দিদি!

—আচ্ছা অনুকূল বাবু, আপনি আমায় কী ঠাওরালেন, ঠিক সত্যি কথা বলুন ত!

—ভাবলাম, আপনার মধ্যে সত্যকার শিল্পীর বাস আছে। সত্যি আপনার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করছে। ভাবতেও পারিনি এত সহজে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন।

কিছুদূর চল্‌বার পর রমিতার সন্দেহ হয় বুঝিবা পথ ভুল হয়েছে, তাই বেশ চীৎকার ক'রেই অনুকূলকে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু এরা গেল কোথায় ?

ওপর থেকে যোরেন সাড়া দিয়ে বলে—আসুন, এই বাঁ-দিক দিয়ে উঠে আসুন।

ব্রজেন উষ্ণ কণ্ঠে বলে, তার কথার মধ্যে রীতিমত অসন্তোষ—আপনাদের যত কাণ্ড! এখানে এক কাজে এসেছেন, সেটা হোক আর না-ই হোক, দিব্যি নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জানেন ত বইখানার success-এর অনেকটা নির্ভর করছে এই পাহাড়-জঙ্গলের ওপর। যদি ছবি ঝুলে যায় তখন গাল খেতে আছে শালা ব্রজ দত্ত—! আরও কিছু কঠিনতর কথা তার কণ্ঠনালীর বাঁকা পথে এসে জমে ছিল, কিন্তু রমিতার চেহারা দেখে সেটা হজম ক'রে নিয়ে ব্রজেন সংযত ভাবে বল্‌লে—আসুন রমিতা দেবী, এখন তাড়াতাড়ি দু'চারটে মোটামুটি shot নিয়ে নেওয়া যাক।

ব্রজেনের কথাগুলো যেন শুন্‌তেই পায় না অনুকূল। সে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে—By Jove! ওই পাশ দিয়েই ত hill top-এ পৌঁছুনো যাবে মনে হচ্ছে! দেখেছেন রমিতা দি, ওই খড়ের ঝোপটার ফাঁক দিয়ে আলোর আভা দেখেছেন?

যোরেন হেসে বল্‌লে—ওই সব খড়ের জঙ্গলেই ত বাঘ ঘুমোতে ভালোবাসে।

নিমেষে সকলের মুখের চেহারা বদ্‌লে যায়। কেমন একটা অদ্ভুত আশঙ্কায় পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এতক্ষণ এভাবে কাছাকাছি বিপদকে অনুভব করে নি কেউ। এবারে যেন বনভূমির ভয়ঙ্কর স্বরূপ ইঙ্গিত করে এদের চলে যাবার জন্য।

ত্বরিতে ছবি তোলার কাজ সুরু হয়। অনুকূল এসব দিক দিয়ে ওস্তাদ। এই অল্পবয়সেই সে বেশ নাম কিনেছে। তার চোখ আছে, হাতের কাজও নিখুঁত। ছবি তুল্‌তে সে যেমন তৎপর তেমনি সৌন্দর্য্যসন্ধানী দৃষ্টি তার। কাজেই ব্রজেন দত্ত মনে মনে যতই বিরক্ত হোক, মুখে তার একশ ভাগের একভাগও প্রকাশ করতে পারে না। ব্রজেন নামেই ওপরওয়ালা কাজের দিক দিয়ে সে ষোল আনাই নির্ভর করে অনুকূলের ওপর।

পিছনে পাতার ওপর কিছু একটা এগিয়ে আসার শব্দ হচ্ছে। এবারের

শব্দ শুধু শুকনো পাতা ওড়ার শব্দ নয়। ভারী ভারী পায়ের চাপে শুকনো পাতাগুলো যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শব্দটা এগিয়ে আসছে। ব্রজেন ব্যস্ত হয়ে আগ্নেয়াস্ত্রে হস্তক্ষেপ করে। বোয়েন তাড়াতাড়ি হাত তুলে বলে—উঁহু। বাবুজী, মানুষ আসছে।

তিনটি সাঁওতাল—বৃদ্ধা, তরুণী এবং যুবক। বৃদ্ধার মাথায় একটা ভারী বোঝা। তরুণীর হাড়ে-মাসে জড়ানো সুঠাম দেহ একটি ছোটখাটো কাপড়ে আবৃত, হাতে তার রূপার অলঙ্কার, কণ্ঠে লাল পলার মালা। হাতে একটি তেল চক্‌চকে পাকানো বাঁশের লাঠি, পুরুষটির স্কন্ধে তীর ধনুক এবং পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা।

ব্রজেন ভ্রূকুটি ক'রে বলে—এই, কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

তরুণীটি ওর দিকে চেয়ে সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে—কেনে!

বৃদ্ধা বল্‌লে—যাবো বাগিডি।

রমিতা লক্ষ্য করে যুবতীটির দাঁড়ানোর ভঙ্গি—পিঠের দিকটা ঠিক যেন ধনুকের মত বাঁকা। কালো দেহের চিকন মসৃণ লাবণ্য ওকে মুগ্ধ করেছে। ও বলে—বাগিডি কতদূর? সেখানে যাচ্ছ কেন?

এবারে জবাব দেয় যুবকটি,—রাধাশ্যাম আছে বটে!

তরুণীটি রমিতাকে দেখছে—সরল চোখে বিস্ময়ের কি অপূর্ব অভিব্যক্তি। রমিতার মনে হয় অনুকূল ভুল ক'রেছে ছবি তুল্‌তে। যদি এই মেয়েটির ছবি নেওয়া যেতো তাহলে প্রকৃতির ছন্দে যতিপতন হ'ত না। আহা, ভগবান যেন ওই নিকষকালো পাথর কেটে কেটে এই অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। আর লাবণ্য ঢেলে দিয়েছেন কপিলা গাইয়ের গায়ে যেমন অকৃপণ ভাবে লাবণ্য দিয়ে থাকেন। বনের হরিণী কি এর চেয়েও সুন্দর? রমিতা অবাক হয়ে ভাবছিল। আর সাঁওতাল মেয়েটি বারবার ওকে দেখছিল—দু'জনের চোখেই বিস্ময়!

মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে রমিতা বলে—রাধেশ্যাম কে? কোনো ঠাকুর দেবতা বুঝি!

একথার জবাব দিতে পারল না মেয়েটি, শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

ওরা আর দাঁড়ায় না। সন্ধ্যা হয়ে যাবে—বাজিডি অনেকটা পথ। ওদের ভাবেভঙ্গিতে মনে হ'ল রাধেশ্যাম কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি অর্থাৎ রাধেশ্যামকে চেনে না যারা, তাদের ওরা মানুষের মধ্যে গণ্য করা দরকার মনে করে না।

পরে যোরেন বললে—রাধেশ্যাম হয়ত একজন কুলির ঠিকাদার। ওরা তার কাছে কাজের আশায় যাচ্ছে।

কাজের শেষে নীচে নেমে ওরা দেখলে কন্ট্রাক্টরদের একটা লরীতে কাঠ বোঝাই হয়ে গেছে। আর একটিতে খানিকটা বাকী, এখন গাছ কাটার পালা শেষ হয়েছে। পাহাড়ের উঁচু জায়গা থেকে কাঠ কেটে ঢালু পথের মুখ পর্য্যন্ত গোরু দিয়ে দড়ি বেঁধে ভারী কাঠগুলো টেনে আনা হচ্ছে, তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঢালু পথের গা-বেয়ে গাছপালা ভেঙে কাঠগুলো প্রচণ্ড শব্দ সহকারে নীচে নামছে। এইভাবে কাঠ নামছে আর তার শব্দে চারিদিক মুখর হয়ে উঠছে।

নামবার সময় খুব তাড়াতাড়ি বাসাডেরার নীচে এসে পৌছে গেল ওরা।

যোরেন বললে—একবার আমাদের বস্তিতে যাবেন?

সবাই যেন কেমন আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়। এখানে মানুষের বাস? বিশেষ ক'রে, যোরেনের মত শিক্ষিত লোক এইখানে থাকে!

যোরেন সত্যিই বেশ ভালো লেখা পড়া জানে, হয়ত এ দলের অনেকের চেয়ে তার বিদ্যাবত্তা বেশি।

হাত জোড় ক'রে বললে যোরেন—আপনাদের মত বড় মানুষ যদি আমাদের গাঁয়ে ঢোকে তবে সেটা গল্পকথা হয়ে থাকবে। অনেক-পুরুষ পরেও লোকে বলবে যোরেনের খাতিরে কলকাতার ছবিতোলা বাবুরা এসেছিল। আমাদের বস্তির মানুষরা খুব ভালো। ওরা শহর বলে মৌ-ভাণ্ডারকে। ওরা মৌ-ভাণ্ডারের সাহেবদের মনে করে দুনিয়ার মালিক। অথচ অনেকে বেশ লেখাপড়া জানে, শিক্ষিত। আমাদের এখানে গীর্জা আছে, ছোট ইস্কুলও আছে।

মৌভাণ্ডার—ঘাটশীলার আই. সি. সি. কোম্পানীর এলাকা। সেখানে

হপ্তায় একদিন হাট বসে। সেই হাটে সাঁওতালেরা যায়। হাটে যাওয়া ওদের কাছে উৎসবের মতই একটা আনন্দের দিন। সেদিন সকালে উঠে ওরা আপন মনেই বার বার বলে—হাটে যাবো, হাটে যাবো। জীবনের কত বৈচিত্র্য এই হাটকে কেন্দ্র করে রচিত হয়।

—ইস্কুল?—প্রশ্ন করে নিতাই চৌধুরী।

—হ্যাঁ বাবুসাহেব।

নিতাই চৌধুরী সম্পর্কে যতীন চৌধুরীর কে যেন হয়। তাকে খাতির করে সবাই।

—চলো, দেখে আসি। এই বনের মধ্যেও ইস্কুল—এ সেই ইংরেজ মিশনারীদের কাজ। উঃ, কী সাংঘাতিক জাত। নিতাইবাবু বল্‌ল।

ব্রজেন দত্ত গাড়ীতে বসে রইল। অনর্থক জংলীদের সঙ্গে এভাবে আত্মীয়তা করার কোনো সার্থকতা নেই। আরও অনেকেই গেল না। সারাদিন বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রে সবাই ক্লান্ত। তবে রমিতার উৎসাহ এখনও কম নয়, অনুকূলও গেল।

গ্রামটি ছোট। পাহাড়তলীর ঢালু জমিতে গা-ঘেঁসাঘেঁসি কয়েক ঘর বস্তী। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এদের ঘরবাড়ি। গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা এসে জুটল কলকাতার মানুষ দেখতে।

একটি তেইশ চব্বিশ বছরের মেয়ে নমস্কার ক'রে সামনে দাঁড়াতেই মোরেন বল্‌লে—এ হ'চ্ছে মেরী, আমাদের এখানকার স্কুলের টিচার।

নিতাই প্রশ্ন করে—ক'জন টিচার আছেন?

—স্কুল খুবই ছোট। ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে ষোলো সতেরো জন। মেরীই সবসময় দেখাশোনা করে, দরকার হ'লে আমিও আসি। যে যখন ফুরসৎ পায় স্কুলের কাজ করে। আমাদের নিজের ব্যাপার ত।

মেরী রমিতার কাছে এসে বল্‌লে—আপনি আমাদের কিছু বলুন, শুনব।

রমিতা হেসে জবাব দেয়—কি বলব ভাই, কিছু ত জানি না।

—সত্যি জানেন না? না, আমরা সে সব বুঝতে পারব না, তাই বলতে চাচ্ছেন না। আমাদের সবাই ত জংলী।

রমিতা বলে—না, না, সে কথা মনে করছেন কেন? আমি শুনেছি, আপনারা সবাই শিক্ষিত।

মেরী খুশি হয়ে ওঠে। খুব সরল ওর মন, নইলে এত অল্পে খুশি হ'ত না। মেরী বল্‌লে—গান শুনবেন? রবীন্দ্রসঙ্গীতের বই একখানা পেয়েছি—মোজেভ সাহেব দিয়েছেন, গানও উঠিয়েছি। সুর ঠিক হচ্ছে কিনা একটু দেখিয়ে দেবেন। মোজেভ সাহেব আমাকে অনেক জিনিষ দিয়েছেন। জানেন না তাঁকে? খুব সুন্দর লোক। এখন বিলেতে গিয়েছেন।

রমিতার মন খুশিতে উছলে ওঠে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত! এই খাসাজোরা গ্রামে সাঁওতাল মেয়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাবে!

মেয়েটির ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নেই। ও কারুর অনুরোধের অপেক্ষা করতে জানে না—স্বয়ং সম্পূর্ণ। নিজের মনের ঐশ্বর্য্যে ও ভরপুর। এতটুকু অপ্রতিভতা নেই, নেই কিছুমাত্র বাহুল্য। গান শুরু হ'ল। একটু অন্যরকম শোনায়, যেন সুরের মধ্যে ঝুমুরের টান এসে পড়েছে। তবু এই পরিবেশের সঙ্গে এ গানের সামঞ্জস্য যেন এই সুরের মাধুর্য্যে ফুটে উঠল। রমিতা ইচ্ছা ক'রেই সুরের ভুল ধরল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লীলায়িত ছন্দে মেরী গাইতে থাকে।

গান শেষ ক'রে রমিতার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল—কেমন, খুব সুন্দর গান না?

রমিতা ঘাড় হেলিয়ে বলে—খুব চমৎকার।

একটা গাছের নীচে গিয়ে মেরী বলে—আপনাকে কিন্তু আমার একটি কাজ ক'রে দিতে হবে। আপনি ত কলকাতায় থাকেন—

মেরী আপন মনেই কথা বলে, কথাগুলো যেন ও নিজেকেই শোনায়। এই কথাগুলো যে কতবার ও নিজে নিজে বলেছে তার ঠিক নেই। এই ক'টি কথা নিয়েই ওর জীবন সজীব হয়ে রয়েছে। ওর মনের কথা।

রমিতার হাত ধ'রে মেরী বলে—কলকাতায় ইলিয়াস থাকে। আমার ইলিয়াসকে জানেন ত? ছিপ-ছিপে ফর্সা, হাস্‌লে দাঁতগুলো চকচক করে। কলকাতায় থাকে। অনেক বছর হ'ল যুদ্ধের চাকরী নিয়ে গেছে ইলিয়াস।

কলকাতায় থাকবে ব'লে গেল, তারপর আর খবর পাই নি। ব্যস্ত কাজের মানুষ, হয়ত কাজের চাপে খবর দিতে সময় পায় না, কিন্তু আমার মন মানে না, জানতে ইচ্ছে করে সে কেমন আছে, কি করছে। অবিশ্যি যাবার সময় ও বলেছিল, ফিরতে দেরি হবে। সব ঠিক হয়ে আছে, ও ফিরে এলেই আমাদের বিয়ে হবে। আপনি কলকাতায় গিয়ে ইলিয়াসের একটা খবর নিয়ে চিঠি দেবেন আমাকে। আমার নাম ক'রে বলবেন তাকে, যেন সে চিঠি দেয়, আমি যে রোজ তার কথা ভাবি তা-ও বলবেন। আমাকে যদি কলকাতায় নিয়ে যায় তবে বেশ দুজনে থাকতে পারব, চাকরীও করতে পারব। আর কাজের চাপ কমলেই সে যেন একবার আসে। আসতে বলবেন ওকে।

রমিতা এই সরল মেয়েটির অর্দ্ধ অচেতন তন্ময়তা দেখে অভিভূত হয়ে যায়। মনে হয়, একেই বলে প্রেম। এই প্রেমকে দেখেই বুঝি কবি বলেছেন—'Love is infallible, it has no errors, for all errors are the want of love'. রক্ষিতার নিজের জীবনও ত এমন হ'তে পারত! মেয়েটির মুখের ওপর থেকে ওর দৃষ্টি যেন সরতে চায় না।

মেরী বললে—দিদি, আমার এই কাজটা নিশ্চয় ক'রে দেবেন। তারপর, কলকাতায় গিয়ে যখন থাকব তখন রোজ আপনার ঘরের কাজ করে দিয়ে আসব।

হঠাৎ রমিতার চমক ভাঙলো, ও প্রশ্ন করল,—ইলিয়াসের ঠিকানা কি?

খুব নিশ্চিন্তভাবেই মেরি জবাব দিল—ঠিকানা? শহর কলকাতা। আপনি তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন, অমন টানা টানা ছুষ্টুমী মাখানো চোখ দেখি নি আর কারও। বকের পালকের মত ধবধবে দাঁত—!...মিলিটারীর চাকরী করে সে। নাম ইলিয়াস।

অনেক চেষ্টা করেও রমিতা মেরীকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না যে কলকাতা শহরটা কত বড়। সেখানে টানা টানা চোখ আর ধবধবে শাদা দাঁতওয়ালা মিলিটারী চাকুরে ইলিয়াসকে আবিষ্কার করা যে কত কঠিন কাজ মেরীকে কিছুতেই বোঝানো গেল না। রমিতার কোনো যুক্তিই মেরী মঞ্জুর করল না, অবশেষে ও বলল—আমি যোসেফ কাকাকে অনেকবার

রয়েছি। কিন্তু ওরা ত পুরুষ মানুষ, কি করে বুঝবে আমাদের কথা। মোরেন কাকাও অমনি বলে, কলকাতা নাকি ভারী বিরাট শহর, সেখানে ইলিয়াসকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরা অবিশ্যি চায় যে মেরীটা এই বস্তীতে এইভাবে থেকেই বুড়ো হয়ে যাক্। এমনিতে ওরা সবাই খুব ভালোবাসে আমাকে। কিন্তু আমার যে ইলিয়াসকে দেখতে ইচ্ছে করে—তার জন্যে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছি, তারই জন্যে আমি লেখাপড়া শিখলায়, তার জন্যে যে আমি দিনরাত ভাবি, এটা টের পেলেই মোরেন কাকারা ভীষণ চটে যায়। বলে শহরে হাওয়াতে আমি নাকি গাঁয়ের মেয়েদের মাথা খাচ্ছি সব। আপনার পায়ে ধরে বলছি দিদিমনি, মেয়েমানুষের দুঃখ আপনি ত বুঝতে পারেন, একটু কষ্ট করে খুঁজে বার করবেন ইলিয়াস কোথায় আছে। তাকে খুব খুঁজতে হবে না, এমন চেহারা যে দেখলেই চিন্‌তে পারবেন। সে নিশ্চয় কাজের চাপে ফুরসৎ পায় না। সোজা ত নয়, মিলিটারীর কাজ! সে কেমন আছে জানালেই আমি অনেকটা শান্তি পাবো। তারপর অবসর-মত একবার এসে যেন আমায় নিয়ে যায়। এইটুকু বলবেন।

রমিতা স্তব্ধ হয়ে শোনে। মেরীর দৃষ্টির প্রতিচ্ছায়া পড়েছে রমিতার মনে। মেরীর চোখে মুখে প্রগাঢ় বিশ্বাসের চিহ্ন—সে বিশ্বাস ভ্রান্ত। একদিন হয়ত মেরীর এই অন্ধ আশার স্বপ্ন আর থাকবে না। সেদিনের বিপুল ব্যর্থতার কল্পনা রমিতার মনকে পীড়িত করে। প্রতিটি সরল স্বপ্নালু মনে এমনি একান্ত আশার একটি নীড় গড়ে ওঠে—কিন্তু নষ্টনীড়ের বেদনা যে কত মর্ম্মান্তিক তা রমিতার ভাবতে বাকী নেই। আহা, মেরীর মত সরল মেয়ের জীবনে সেই চরম দুর্দিন যেন না আসে! কে জানে, হয়ত ঠিক এই পার্ব্বতী মেয়েটির প্রেমের নিষ্ঠা রমিতার প্রেমে ছিল না। রমিতা নিজের এই অহেতুক আশঙ্কার মেরীর পবিত্র প্রেমকে অমঙ্গলের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল মনে মনে। বিদায়ের সময় ও মেরীকে আশ্বাস দিল ইলিয়াসের খবর দেবে বলে।

আবার বুরুডি পাস। এবারে পথের রূপ গেছে বদলে। অন্তহর্য্যের

রক্তিম আলোয় ডিনামাইট দিয়ে ফাটানো রুক্ষ পাথরগুলো লোহিতবর্ণ ধারণ ক'রেছে। অপর পাশে অনেক নীচে সমতল পথে পাহাড়ী নদী ব'য়ে চলেছে, সেখানে ঘন অন্ধকার, গাছগুলোর কালো আবছা মূর্ত্তি মানুষের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে, এইখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় এ আর এক পৃথিবী—কি জানি হয়ত বা পৃথিবীর বাইরে! দক্ষিণদিকে উর্দ্ধলোকে ঘন দীর্ঘ বনস্পতির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালো পাথর। মসৃণ কালো কালো পাথর চক্‌চক্ করছে! গাড়িখানা এক একটা বাঁক ঘুরছে আর মনে হচ্ছে ওই সম্মুখে বুঝি পৃথিবীর সীমান্ত আকাশে এসে মিশে গেছে। পিছনে তাকালে দেখা যায় নীচে, অনেক নীচে জল-রেখার মায়াময় রহস্য। তার ওপারে কোন্ রাজ্য, সেখানে কি আছে কে জানে!

মোরেন বল্‌লে,—ওই ওপরে লাকাইসিনি পাহাড়। লাকাইসিনির জঙ্গল এ অঞ্চলের সবচেয়ে নিবিড় বন—সেখানে হাতীর বাস। হাতীরা খেলা করে সেখানে। মোরেন বল্‌লে,—যদি যেতে চান নিয়ে যেতে পারি। খুব জঙ্গল সেখানে।

ব্রজেন মন্তব্য করে—তারপর হাতীতে আমাদের নিয়ে লোফালুফি করুক আর কি। উঃ হাতীর রসিকতা বড় সংঘাতিক। মশাই, আসামে—ডুয়াসের জঙ্গলে আমার এক ডাক্তার বন্ধু থাকে। তার মুখে শুনেছি, একবার কোথা থেকে যেন রুগী দেখে সে মোটরে ক'রে ফিরছে, সন্ধ্যের মুখে একটা ব্রীজের সাম্‌নে হাতীতে পথ রুখে দাঁড়াল। বেগতিক দেখে বন্ধুটি তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে একটা বড় গাছের মাথায়। সেখানে বসে বসে সে দেখল গাড়ীখানার চারি পাশে বার কয়েক ঘোরাফেরা ক'রে হাতীটা শুঁড় দিয়ে গাড়ীখানার বস্তুতত্ত্ব পরখ করবার জন্য কাৎ ক'রে ফেল্‌লে। গাড়ীখানা উল্টে গেল। অবিশ্যি সে যাত্রা ফাঁড়াটা গাড়ির ওপর দিয়েই গেল, ভদ্রলোক বেঁচে রইল।

মোরেন বল্‌লে—আপনি ঠিকই বলেছেন, হাতী যদি পিছনে লাগে তবে সাংঘাতিক কথা। কিন্তু না ঘাঁটালে ওরা ত কিছু করে না।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্যেই বোধহয় নিতাই চৌধুরী বল্‌লে—ওই মেয়েটি কে হে মোরেন?

মোরেন জবাব দেয়—কার কথা বল্‌ছেন? মেরী! মেয়েটি খুব ভালো। তবে ওর একটু মাথার দোষ আছে।

নিতাই মোরেনের কথাটা যেন বিশ্বাস করে না, সে বলে—তুমি যাই বলো, ভারী সুন্দর ওর গানের গলা। আর খুব স্টেজ-ফ্রি।

—বাবু সাহেব, অনেক কষ্টে ওকে গান শিখিয়েছি।

—ফিল্‌মে নাম্‌লেই চট ক'রে নাম হয়ে যাবে ওর। এই সব হচ্ছে টাইপ!

মোরেন একথার কোনো সদুত্তর দেয় না।

নিতাই চৌধুরীর কথাটা রমিতাকে অন্যমনস্ক ক'রে দিল। ওর চোখের সামনে মেরীর লীলায়িত সঙ্গীতের মত ছন্দোময় রূপ ভেসে বেড়ায়। পাহাড়ী মেয়েটির অন্তরে কী বিপুল সম্পদ! ওর ইচ্ছে করে মেরীর সঙ্গে থাকতে, মেরীকে নিজের কাছে রাখতে। মেরী বেঁচে আছে, তার চোখে মুখে বনের সতেজ জীবনপ্রবাহের সজীব শ্যামলতা। মেরী নিজের সমগ্র অন্তর দিয়ে ভালোবাসে তার ইলিয়াসকে। নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রেই মেরী খুশি!

ব্যর্থতায় মেরীর মন ঊষর হয়ে ওঠে নি। রমিতার নিজের দিকে তাকাতে সাহস হয় না। রমিতা নিজের রিক্ত মনের ব্যর্থ জ্বালা দিয়ে, সারা পৃথিবীকে নস্যাৎ ক'রে দিতে চায় কেন, কেন তার এই দংশনে জর্জর করার অদম্য প্রবৃত্তি, রমিতা বুঝতে পারে না। মেরীর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে সাহসে কুলোয় না। তবু নিজের কাছে এটুকু ধরা পড়ে রমিতার—মেরী নিজেকে আবিষ্কার ক'রেছে, নিজেকে স্বীকার করে নিয়েছে, আর রমিতা নিজেকে খুঁজে পায় নি। ও যেন আপনার কাছেই একটা অনাবিষ্কৃত রহস্য। হয় ত সেটা মোহ ছাড়া কিছু নয়। হয়ত নিজেকে নিজের চেয়ে বড় ক'রে দেখার একটা অদ্ভুত অভিলাষই রমিতাকে অস্থির অতৃপ্ত ক'রে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একদিন রমিতার মনও সুকুমার ছিল, যখন সে চেয়েছিল

একটি নিবিড় নীড় বাঁধতে, যখন ও এরকম ছন্নছাড়া জীবন কল্পনাও করেনি,—কিন্তু সেসব আর একটি মেয়ের জীবনের কথা বলে মনে হয় আজ। আজকের এই ছায়াছবির জগতে উন্মাদনা এনে দিয়েছে যে রমিতা সে সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে রমিতা পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে গেল।

খুব জোরে একটা বাঁক ফেরবার সময় লরীটা ঝাঁকানী দিয়ে লাফিয়ে উঠল। ঠিক তারপর থেকেই রমিতার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। প্রথমে সেটা আমল দিয়ে চায় নি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই পেট্রলের গন্ধটাও নাকের কাছে বিশ্রী দুর্গন্ধ মনে হতে না-হতেই গা ঘুলিয়ে বমি উঠে এল।

ব্রজেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বল্‌লে। গাড়ী থামিয়ে মাথায় জল দিয়ে তখনকার মত একটু সুস্থ হ'ল রমিতা। গাড়ি চল্‌তে শুরু করল খুব আস্তে আস্তে।

ওরা ঘাটশীলায় ফিরল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রমিতা রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রাস্তায় আরও বার-কয়েক বমি হয়েছে, অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে মনে হচ্ছে ওর। অনুকূল মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এক সময়ে হাত নেড়ে রমিতা বারণ করলে অনুকূলকে।

ব্রজেন আর অনুকূল রমিতাকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে এলো ঘরে। অবিশ্যি রমিতা আপত্তি করেছিল—আপনারা ছেড়ে দিন, আমি একাই যেতে পারব ব্রজেন বাবু।

কেউই সেকথা শোনে না, বলে—না না, চলুন। আমাদের ত এতে কষ্ট কিছু নেই।

রমিতার হাত-পা, মন, সব কিছুই কেমন একটা শৈথিল্যে অবসন্ন। যদিও ওদের এই অযাচিত যত্নটা গ্রহণ করতে তার ভালো লাগছে না তবু বাধা দেবার মত যথেষ্ট সামর্থ্যও নেই। আর একটা নিস্পৃহতা ওকে নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখেছে।

যতীন বাবু নিজের খানসামাকে বল্‌লে—ওরে দ্যাখ ত বড় সুটকেসে ওডিকোলোনের শিশি আছে বার করে আন।

রমিতা হাত নেড়ে ইশারা ক'রে জানালে—ওসব দরকার নেই, একটু ঘুমিয়ে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ব্যস্ত হবেন না যতীনবাবু।

যতীন চৌধুরী হেসে বললে—এতে আবার ব্যস্ত হবার কি আছে। আসলে যা হজম করতে পারো তার চেয়ে অনেক বেশি সৌন্দর্য্য গিলে ফেলেছ। ওডিকলোনে মাথা ঠাণ্ডা হবে, দুমিনিটে ঘুমিয়ে পড়বে।

সহসা রমিতা বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসল, বললে—কিন্তু আমার এখন ঘুমোবার সময় নেই, রাত্রের ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারেই যেতে হবে। কাল শুটিং আছে অন্য কোম্পানীর।

ব্রজেন ব্যস্ত হয়ে বললে,—আপনার কি মাথার ঠিক নেই না-কি মিস্ মজুমদার! এই অবস্থায় রাত জেগে ট্রেনজার্নি করা হতেই পারে না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন দেখি।

—না, না, এ নিয়ে ছেলেমানুষী করা চলে না ব্রজবাবু। কাল, পরশু, তরশু 'অনুকল্পের' ফ্লোর নেওয়া আছে। এখন আমি যদি না যাই তাদের যে বিস্তর ক্ষতি হয়ে যাবে।

অনুকূল গম্ভীর ভাবে বললে—অন্ততঃ আজ রাত্রে যাবার কোনো উপায় নেই। এ আপনার খুব অন্যায় দিদি, এমনি ক'রে অত্যাচার করলে কতদিন আর সইবে? আপনাদের ত কথার খেলাপ হওয়া দস্তুর আছে।

—সে কথা আপনারা সিনেমাওয়ালারা বোঝেন কই? কোনো রকমে চুণ মাখিয়ে সং সাজিয়ে আমাদের ক্যামেরার সামনে হাজির করতে পারলেই আপনারা খুশি। জানেন যে টাকা দিয়ে সবই পাওয়া যায়।

—দিদি শুধু সিনেমাওয়ালাদের দোষ দিলে শুনব না, আপনি যদি সত্যিই না নামেন ত কারও বাবার সাধ্যি নেই আপনাকে জোর ক'রে নামায়। এখন তর্ক থাক, আপনি শুয়ে পড়ুন ত, ডাক্তার এলে তাঁর পরামর্শ-মত ব্যবস্থা করা যাবে। তিনি যদি বাধা না দেন তবে আর আপনাকে আটকানো হবে না। যাতে আপনি অসুবিধেয় পড়েন এমন কাজ আমরা কেউ করতে চাই না।

ব্রজেন সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বলে—তা ছাড়া যাদের চাহিদা আছে তাদের আটকানো মানেই ক্ষতি করা।

যতীন চৌধুরী এতক্ষণ বিশেষ কথা বলে নি, এবারে ব্রজেনের দিকে চেয়ে বল্‌লে—সে ক্ষতির পরিমাণ কত? জান্‌তে পারলে আমি হয়ত মিটিয়ে দিই!

ক্ষীণকণ্ঠে রমিতা বল্‌লে—সব ক্ষতির দাম পয়সা দিয়ে দেওয়া যায় না যতীনবাবু! আমার কথার দাম আমি ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। সে যাক, গাড়ীর এখনও অনেক দেরী। একটু ঘুমিয়ে নিলেই আমি অনেকটা চাঙ্গা হয়ে যাবো। ডাক্তারের কোনো দরকার নেই। দরকার একটু বিশ্রামের। তা আপনারা যদি ঠিক সময়ে ডেকে দেবেন ভরসা দেন ত শান্তিতে ঘুমোতে পারি।

সকলেই পরস্পরের দিকে একবার তাকাল। অনুকূল বল্লে—আচ্ছা তাই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন।

বাতিটা একটু কমিয়ে দিল সে। আর সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক কোণে ঝি বসে রইল শুধু। অল্পবয়সী সাঁওতাল মেয়ে, বাবুরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ও আস্তে আস্তে রমিতার বিছানার কাছাকাছি এসে বসল। এত কাছাকাছি বসবার তার আর কোনো কারণ ছিল না—নিছক কৌতূহল। রমিতা তার কাছে একটা বিস্ময়। সে রমিতার পাতাবোজা চোখের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওর কাছে রমিতার সব কিছুই অদ্ভুত মনে হয়। শহরেও অনেক মেয়ে দেখেছে সে। কিন্তু রমিতা যেন তাদের কারুর মত নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ওর কথা কওয়ার ভঙ্গি, চোখের চাহনী, ওর শয়নের সাবলীল তনুবিক্ষেপ—সব কিছুই সাঁওতাল মেয়েটির মনে চমক লাগায়। ও নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়িয়ে রমিতার কপালের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে কি যেন দেখছিল। শান্ত নিয়মিত নিঃশ্বাসের ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে রমিতার বুকের কাপড়ে তরঙ্গ উঠছে। সাঁওতাল মেয়েটি একবার নিজের দিকেও তাকাল। তারপর সরে দাঁড়াল। বুঝি বা নিজের বন্য লাবণ্যের সব কিছুই ও অগ্রাহ্য করতে চায়। নিজের দেহের অটুটযৌবনকে লজ্জায় সঙ্কুচিত

ক'রে রাখতে পারলে যেন ও সব চেয়ে স্বস্তি পেত। এ যেন রজনীগন্ধাকে দেখে কেতকীর লজ্জা।

বাইরে সাইকেলের শব্দ হতেই ঝি আরও খানিকটা সরে গিয়ে নিজের কোণে আশ্রয় নিল। ডাক্তারবাবু এসেছেন। এখুনি আবার ওই পুরুষগুলি ঘরে এসে ভিড় করবে। এরা সবাই মিলে একটি মেয়ের জন্তে কীই না করছে। ওর মনে ধারণা জন্মেছে এই রকম অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ের জন্তে পুরুষরা সবই করতে চায়। রমিতার যে অসুখটা কী ও বোঝে না—বেশ ত কথা কইছিল, কোনো রকম যন্ত্রণা নেই, চীৎকার করে না, জ্বরও হয় নি। তবে কেন ডাক্তারবাবুকে ডাকা হ'ল ?

যতীন চৌধুরী ডাক্তারকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল—আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু!

তারপর চা পান ক'রে 'ফি' পকেটস্থ ক'রে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন। যেহেতু রমিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে আর বিরক্ত করতে বারণ করলেন তিনি। এবং যাবার সময় বলে গেলেন—একেবারে complete rest দরকার। যাইহোক কাল সকালে আমি আবার আসব। আপনাদের কথায় মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার heart weak, এখন থেকে যদি গোড়া ধ'রে চিকিৎসা হয় তবেই ভালো—নইলে কি হ'বে বলা ত যায় না। আচ্ছা, নমস্কার।

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পার্বতী দাদার ঘরেই পাখা খুলে একটু বিশ্রাম করছিল। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্ত পার্বতী বাপের বাড়ী এসেছে। সঙ্গে এসেছে তার তিন ছেলেমেয়ে নীলাম্বর, শচীন এবং নীলিমা। বলা বাহুল্য যে, তিনটি ছেলেমেয়েতে বাড়িখানা তচ্‌নচ করে বেড়াচ্ছে। তাদের এই অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সাধ্য নেই কারও। তারা একমাত্র দিদিমার কথাই মন দিয়ে শোনে, তাছাড়া আর সকলের কাছে তাদের অখণ্ড প্রতাপ—কারণ এটা তাদের মামা-বাড়ী।

নীলিমা দৌড়তে দৌড়তে এসে মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পার্বতী এক হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে বল্লে—আঃ, এই সময়ে আর গায়ের ওপর ঠেসান দিও না মা, সরো। দুপুরবেলা একটু জিরোবারও উপায় নেই তোদের জ্বালায়।

ফুটফুটে বছর তিনেকের মেয়ে নীলিমা। এখনও তার কথায় আড় ছাড়েনি ভালো ক'রে। মায়ের তাচ্ছিল্যকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। আরও গা ঘেঁসে ব'সে মায়ের কানের কাছে মুখ রেখে বললে—জানো মা, বড়দাদা না মামাবাবুর পকেট থেকে পয়সা চুরি ক'রেছে একটু পরে।

একটু পরে অর্থাৎ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে। নীলিমার অভিধানে এই রকম কতকগুলি শব্দের নিজস্ব অর্থ আছে সেগুলি কেবলমাত্র তার মা-ই জানে। ইদানীং তার দিদিমাও নতুন ক'রে পাঠ নিচ্ছেন।

পার্বতী ধমক দিয়ে ওঠে—থাম দেখি, দিনরাত তোর গিন্নীপনার গুঁতোয় আর পারি না!

নীলিমার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে ওঠে, ও বলে—হ্যাঁ ত! ছচিন বললে ত, যে দাদা ম্যাণ্ডোলিয়া কিনবে বলে চুরি করল পয়সা।

ইতিমধ্যে আসামী নীলাম্বর এসে হাজির হয়েছে! সে বিনাবাক্যব্যয়ে নীলিমার চুলগুলো মুঠোর মধ্যে বাগিয়ে ধরবার চেষ্টা করতে করতে বলে—রাক্কুসী, অমনি টুকুস্ ক'রে মায়ের কাছে নালিশ করতে এসেছ! দাঁড়াও না, দেবো বলে সেই কথাটা?

শচীনও পিছু পিছু চীৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল—দাদা চোর—দাদা চোর।

নীলাম্বর এবারে প্রবল প্রতাপে শচীনের গলা জাপ্টে ধ'রে পা বাধিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে—ফের যদি চ্যাচাবি তবে গলা টিপে সাবড়ে দেবো, হুঃ! চোর! তুই ব্ল্যাকমার্কেট।

ব্ল্যাকমার্কেট কথাটার সম্যক অর্থ নীলাম্বর নিজেও জানে না। তবে অত বড় একটা শব্দ প্রয়োগ করার যথেষ্ট বাহাদুরী আছে এটা নীলাম্বর নিজের মনেই অনুভব করে।

পার্বতীর আর শুয়ে থাকা চলে না। উঠে এসে নীলাম্বরকে সরিয়ে দিয়ে বলে—ও কী শচীন! দাদাকে অমন চোর-চোর ব'লে চীৎকার করছ! দিন দিন বাঁদর হচ্ছ।

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলে—বেশ করব, একশ' বার বলব। মামার পকেট থেকে দাদা রোজ ত চুরি করে—হ্যাঁ। এঃ দাদা না ছাই—চোর!

নীলাম্বর আস্ফালনে কিছু কম যায় না, সে মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে আর বলে—দাঁড়া তোর চোর বলা বের করছি।

নীলিমা সুর ক'রে বলে—না বলিয়া—

শচীন আরও জোরে হাঁকে—পরের দ্রব্য লইলে কি হয়?

এবারে নীলাম্বর দাঁত ভেংচে বলে—আহা! মামার জিনিষ বুঝি পরের হ'ল?

পার্বতী মহামুস্কিলে পড়ল, তিনটি ছেলেমেয়েকে সাম্‌লানো তার একার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আগে হ'লে সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে একটুও ধকল সয় না। তবু যদি বা ছোট দুটোকে কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখা যায় কিন্তু বড়টি কিছুতেই কথা শোনে না। দেখ্‌তে মাথায় এতটুকু হ'লে কি হয় নীলাম্বরের গায়ে জোর আছে।

নীলাম্বর বল্লে—আর, মামা ত জানতেই পারে নি! নিয়েছি বেশ করেছি।

পার্বতী ধমক দিল—নীলু!

নীলাম্বর মায়ের দিকে একটি আধুলি ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লে—চাই না, চাই না পয়সা—ওই নাও।

নীলাম্বরের গালে একটি চড় বসিয়ে দিল পার্বতী।

আধুলিটি ফেরৎ দেওয়ার পর এরকম দুর্ঘটনার জন্য নীলাম্বর প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ চড় খেয়ে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সপ্তমে গলা চড়িয়ে কান্না জুড়ে দিল।

আরও কয়েক ঘা ছেলের পিঠে বসিয়ে দিয়ে গজ্‌-গজ করতে লাগল পার্বতী—আমার কপালেই কি যত বাঁদর এসে জুটবে।

চমৎকারিণীর দুপুরে খবরের কাগজ পড়া অনেক দিনের অভ্যাস। এই সময়টুকু তিনি নষ্ট করেন না। মেয়ের কাছে অবশ্য তার জন্য যথেষ্ট অনুযোগ অভিযোগ শুনতে হয়। পার্বতী প্রায়ই দুঃখ ক'রে বলে—মা যেন বদ্‌লে গেছ। দুদিনের জন্যে এলাম তা খবর কাগজ মুখে দিয়েই ত তুমি বসে থাকো। ছেলের ছেলেই নাতি হয়, মেয়েরা সব বানের জলে ভেসে এসেছে। তাদের ছেলের বুঝি আদর-আব্‌দার থাকতে নেই!

চমৎকারিণী এসব কথা গায়ে মাখেন না, বলেন—তোর যা ইচ্ছে ব'লে নে। মাকে হাতে পেয়েছিস ছাড়বি কেন! মাথায় তুলে নাচলেই বুঝি আদর হয়! ওরা বেঁচেবর্ত্তে থাকুক, মানুষ হোক—এই হ'লেই আমি খুশি! ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে যে ঘরকন্না করা আমার ভাগ্যে হবে না, সে কথা তুই শুনিয়ে কি করবি, আমিও জানি মা, আর ক'টা দিনই বা আছি।

চমৎকারিণীর মনে এই একটি বেদনাই নিরন্তর জাগ্রত। প্রভঞ্জন যে আর কোনদিন বিবাহ করবে এ বিশ্বাস তাঁর নেই এবং এর জন্য সব কিছু জেনে শুনে ছেলেকে অবুঝের মত পীড়াপীড়ি করতে তাঁর ভরসা হয় না। আজও তিনি দুপুর বেলায় খবরের কাগজের ওপর শূন্য দৃষ্টি মেলে দিয়ে প্রভঞ্জনের কথা ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ···এমন সময়ে নীলাম্বরের চীৎকার কানে যেতে চশমাটা চোখ থেকে ঠেলে কপালের ওপর তুলে দিয়ে চমৎকারিণী বিস্রস্ত অঞ্চল সংযত করতে করতে এ ঘরে এলেন।

—কী রে, দিনদুপুরে যে ভুতের কেত্তন জুড়ে দিয়েছিস, এঁ্যা!

'ভুতের কেত্তন' কথাটা পার্বতীর মনঃপুত হয় নি, সেটা মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তার-চেয়েও স্পষ্ট ক'রে বোঝাবার জন্যই বোধ হয় সে এগিয়ে এসে ছেলের পিঠে গোটা কয়েক কিল বসিয়ে দিলে—বাঁদর, ভুত তোদের আবার অত কিসের? বড়লোক মামার বাড়ী এসেছিস, মানুষের মত থাকবি।

চমৎকারিণী হাজার হ'লেও মেয়েমানুষ, পার্বতীর বাঁকা কথাটা খুব সহজেই বুঝতে পারেন। মেয়েকে নিরস্ত করবার জন্য বলেন,—আখ পারু, ভাইকে বল্‌লে মাকেও বাদ দেওয়া হয় না। তেমন অন্যায় বলিনি মা, আমার নাতিকে আমারও বলবার এক্তার আছে, তুই অমন ঝাঁঝিয়ে বেচারার

ওপর রাগের শোধ তুল্লি। ওকে মারতে গিয়ে তুই যেন আমাকেই মেরে বস্লি! যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক বাপু। শরীর খারাপ হ'য়ে কেমন খিটখিটে মেজাজ হয়েছে তোর।

তিনি নীলাম্বরের হাত ধরে টেনে তুলে নিলেন—আয় ভাই, আমরা আজ একটা মজার গল্প করব।

ও পাশ থেকে নীলিমা ব'লে উঠল—দিদি ভাই, সেই উড়ুক্কু বাঘের গল্প বল্বে, আমায়? এঁ্যা!

শচীন বাধা দিয়ে বলে—লিলির ওই এক উড়ুক্কু বাঘের গল্প ছাড়া আর কিছু নেই। দিদিভাই তুমি বেশ নতুন ভূতের গল্প বলো। আমি রাত্তিরে লিলিকে সেই উড়ুক্কু বাঘের গল্প শুনিয়ে দেবো।

পার্বতী মনে মনে মায়ের কথাগুলোর জবাব করতে করতে অধিকতর গম্ভীর মুখে অন্য ঘরে চলে গেল।

নীলিমা চমৎকারিণীর হাত ধ'রে বলে—দিদিভাই মা খুব রাগ করেছে। খুব রাগ হয়েছে মার, না দিদিভাই! দাদাটা ভারী দুষ্টু!

দিদিমার সঙ্গে যাবার সময় নীলাম্বর আধুলিটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল।

চমৎকারিণী প্রশ্ন করেন—হঁ্যা, দাদাভাই কি দুষ্টুমী ক'রেছিলে বল তো!

নীলাম্বর চুপ ক'রে থাকে। শচীন ব্যগ্রভাবে বলে—বল্ব দিদিভাই, আমি জানি—এই, দাদা না—

চমৎকারিণী বাধা দিয়ে বলেন—না, তুমি নয়—নীলু আমায় বল্বে। বল তো নীলু!

শচীন একটু অপ্রতিভ ভাবে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করে। শচীনকে এভাবে আমল না দেওয়াতে যে নীলাম্বর খুশি হয়েছে তা শচীনের বুঝতে বাকী নেই।

নীলু বল্লে—মামার কাছ থেকে আমি পয়সা নিয়েছি, সেই জন্যে।

নীলিমার বড় বড় চোখ বিস্ময়ে আরও বড় হয়ে ওঠে। ও বলে—না, ত! দাদা ত পকেট থেকে নিল, একটু পরে।

শচীন পুনরায় যোগ দেয়--জানো দিদিভাই, মামার পকেট থেকে দাদা পয়সা চুরি করেছে। এখন আবার তোমায় মিথ্যে বানিয়ে বলছে।

চমৎকারিণী অবাক হ'য়ে যান, বলেন—শচীন! তুমি এসব কথা কোথায় শিখলে! মামার পকেট থেকে নীলু পয়সা নিয়ে অবিশ্যি ভালো কাজ করেনি—কিন্তু একে চুরি বলে না।

শচীন সুর ক'রে বলে—তবে কেন বইতে লিখেছে, 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়!'

শচীনের কথা শুনে চমৎকারিণী স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারপর নীলাম্বরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—দাদাভাই, শোনো তুমি আর কখনও এমন ভাবে পয়সা নিও না। যখন ইচ্ছে আমায় বলবে, পয়সা দেবো, জিনিষ দেবো। মামার পকেট থেকে পয়সা নিতে যাবার দরকার কি!

নীলাম্বর এবারে কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বলে—জানো দিদিভাই বাবাকে পয়সা চাইলে ত পাওয়া যায় না, তাই বাবার পকেট থেকে পয়সা নেয় মা। আর পকেট থেকে নিলে বাবা টেরও পায় না।

—ছিঃ, ওরকম ভাবে পয়সা নিও না দাদাভাই!

—বা রে, আমরা নিলেই যত দোষ? মা ত' সব সময়ই বাব'র পকেট থেকে নেয়। আর বাবা ধরতে পারলেই বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া লাগে তখন মা বলেন, 'বেশ করেছি, তুমিও ত ঘুষ নাও, তুমিই কি খুব সাধু নাকি।' জানো দিদিভাই, এক-একদিন এমন ঝগড়া লাগে, আমাদের খুব ভয় করে। বাবার গায়ে যা জোর—! হাঁ দিদিভাই, ঘুষ কি করে নেয়? একদিন বাবাকে জিগ্যেস করেছিলাম। বাবা, ভীষণ ধমক দিয়ে ছিলেন।

চমৎকারিণীর মুখ আঁধার হয়ে আসে। তিনি ভেবে পান না, এই ন' বছর বয়সে নীলাম্বর এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল কি ক'রে। তাঁর মুখ চোখের চেহারা দেখে নীলাম্বর উৎসাহিত ভাবে ব'লে যায়—সে-বার হ'ল কি, একদিন রাত্তির বেলায় আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন বাবা। দেখলাম, মা কাঁদছে,

আর বাবা খুব চুপি চুপি মাকে কি সব বলছেন। জানো দিদিভাই, সেদিন না আমাদের বাড়ী পুলিশ এসেছিল।

দাদার-কথার জের টেনে শচীন বল্লে—দাদাটা কিচ্ছু জানে না। বুঝলে দিদিভাই, দারোগাবাবুর সঙ্গে বাবার সে সব অনেক কথা হ'ল। বাবা নাকি অনেক টাকা কোথা থেকে নিয়েছেন। তাই দারোগাবাবুকে পাঠিয়েছিল তারা। দারোগাবাবু চ'লে গেলে বাবা বল্লেন, 'অনেক খরচ হয়ে গেল। তবু ত দুধে হাত পড়ে নি!' মা বললে—'তুমি আর কখনো জোচ্চুরী কাজে যাবে ত আমার মাথা খাও।' জানো দিদিভাই, বাবার ভারী বুদ্ধি। সেই জন্য অনেক বার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে বাবা।

একটা দীর্ঘশ্বাস চমৎকারিণীর বুক পিষে বেরিয়ে আসে। এইটুকু সব দুধের ছেলের মুখে এসব কী কথা!

নীলিমা তাঁর গলা জড়িয়ে বলে—দিদিভাই তুমি কেন রাগ করেছ? আমাকে সেই উড়ুক্কু বাঘের গল্প বলো না! দাদার কথা, ছচিনের কথা শুনো না তুমি। জানো দিদিভাই, পুলিশ ত ধরে নিয়ে যায়!

এভাবে নীলিমা বাধা দেওয়াতে শচীন বিরক্ত হয়। কিন্তু সে জানে দিদিভাই-এর কাছে নীলিমার আদর সব চেয়ে বেশি, তাই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও নীলিমার চুল টানার লোভ সম্বরণ করতে হয় তাকে। শুধু নিঃশব্দে চোখ পাকিয়ে নীলিমাকে শাসন করে শচীন।

চমৎকারিণী ছেলের কাছে রাত্রে সব কথাই বললেন। প্রভঞ্জন মায়ের কথা শুনে বললে—তা এর জন্যে কি করতে হবে বলো।

চমৎকারিণী বললেন—সেই কথাই জিগ্যেস করছি। জামাই-এর ভাব-গতিক ত খুব ভালো ঠেকছে না। উল্টে দুধের বাচ্চাগুলোর মনে বিষ ঢুকছে যে!

প্রভঞ্জন পায়চারী করতে করতে বলে—হুঁ, পারুকে বলেছ এসব কথা!

অসহিষ্ণু ভাবে চমৎকারিণী বল্লেন—আহা তোর কি এখনও এসব বুদ্ধি হ'ল না। জামাইয়ের সম্পর্কে নিন্দের কথা শুনলে মেয়ে কি কবুল খাবে, না খুশি হবে? এমনিতেই বেচারী নিজের দুঃখে পাথর—আবার সেই কথা

আমার মুখ থেকে শুনলে গলায় দড়িটড়ি দিয়ে বসবে শেষে। এবার এসে অবধি পারুর মুখে হাসি দেখি নি। জয়ন্তটা যে এমন অমানুষ হবে তা কে জানত!

—দ্যাখো মা, জয়ন্ত যে মানুষ হবে একথা কেউ কোনো দিন বিশ্বাস করেনি। একুশ বছরে যে ছেলে পাড়ায় বেপাড়ায় প্রেম ক'রে বেড়ায় তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হ'তে পারে না একথা আগেই জানা উচিত ছিল। আমি তখন বাধা দিয়েছিলাম, তা তোমার মন মিষ্টি কথায় ভিজে কাঁথা হয়ে গেল। যাক সে সব পুরনো কথা। এখন কি করতে হবে বলো। যদি মাসিক টাকাকড়ি দিতে হয় তা-ই বলো, আর যদি চাও পারু এখানে থাকে—তাও হতে পারে।

—না, তাতে সংসারে অশান্তি বাড়বে। জয়ন্তর আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর ত এমনিতে বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি রয়েছে। ওর হাতে পড়ে থাকলে কিন্তু পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

—আহা আত্মসম্মান, চুরি-জোচ্চুরী করবার সময় কোথায় থাকে? সে রাস্কেলের কীর্তিকলাপ কি আমার চেয়ে বেশি জানো! একটা শয়তান!'

প্রভঞ্জন মুখের কথা শেষ ক'রেই দেখলে দরজার সম্মুখে পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে। পার্বতীকে দেখে প্রভঞ্জন বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হল না, সে মিষ্ট স্বরে ডাকলে—আয় পারু এখানে ব'স। তোর সঙ্গে অনেকগুলো দরকারী কথা আছে।

চমৎকারিণীর হঠাৎ ঘুম পেয়ে গেল, তিনি ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—হ্যাঁরে, রাত অনেক হ'ল যে। আমার বড্ড চোখ টেনে আসছে। আর তোরই বা কম কি বাপু, আবার ত সেই কাক না ডাকতে উঠে আলো জেলে মাথামুণ্ডু ক'রতে বসবি—এখন একটু দেহটাকে বিশ্রাম দে! দিন রাত হটর্ হটর্ করে ঘুরবি, রাতে একটু না ঘুমোলে যে ভারী অসুখ হয়ে যাবে। নে শুয়ে পড়।

প্রভঞ্জন বলে—না, না, পর্বতীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা হয়ে গেলে ওর মনটাও অনেক হাল্কা হয়ে যাবে। তুমি বোঝ না কেন যে, পারু তোমার ভাঁড়ার থেকে আচার চুরি ক'রলে দাদাকে ভাগ না দিয়ে মুখে তুলত না—

আজকে দুঃখের দিনেও ত আমার কিছু ভাগ পাওনা আছে। কি রে তুই কি বলিস, পারু!

পার্বতী জবাব দিতে পারে না। স্বভাবগম্ভীর দাদার এই অদ্ভুত আচরণে পার্বতী অভিভূত হয়ে পড়ল।

প্রভঞ্জন বলে—আমার কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভালো হবে না। বল ত, জয়ন্তর চাকরীর অবস্থা কেমন?

কথা বলতে পার্বতীর কষ্ট হচ্ছে, সংক্ষেপে ও বল্লে—এই একরকম।

—সে আজকাল অল্প খেটে বেশী আয়ের চেষ্টা করে, তাই না!

—না, তবে—আগে যুদ্ধের শুরুতে অনেক টাকা আনত, আজকাল আর আগের মত হয় না—আমি অতশত কিছু বুঝিও না।

—আজকাল ওর নাকি নানারকম খেয়াল হয়েছে।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পার্বতী বল্লে—আর কিছু আমায় জিগ্যেস ক'র না। সংসারে আমার কোনো দুঃখুকষ্ট নেই। আর তিনি এমন কিছু খারাপ ব্যবহারও ত করেন না।

—অমন করে লুকোনো যায় না পারু। তোর শ্বশুরবাড়ির সবাই যে-কথাটা জানে সেটা আমি তোর দাদা হয়ে জানতে পারলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! তুই যতই ঢাকবার চেষ্টা কর না কেন আমি সব জানি। ওর ওই সব ইয়ে আর চলবে না, বুঝলি। জাল জুচ্চুরী ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে একটা কিছু করুক। কি বলিস তুই!

—সে পুরুষ মানুষ কি করবে না করবে আমি তার কি পরামর্শ দেবো! তুমি নিজেই ত তাঁকে বলতে পারো।

—হুঁ! যাক, সেসব পরে হবে। তার মত হাঘরের কাছে কোনো ভালো কাজ আশা করা চলে না। আমি অবশ্য তাকে এর আগেও লিখে-ছিলাম আমার ল্যাবরেটরীতে আসবার জন্যে—তা তখন পছন্দ হ'ল না এসব নাকি বাজে কাজ। সে নিজে যা খুশি করুক গে, আমি ঠিক করেছি শচীন আর নীলাম্বরকে আমার কাছে রাখব। তুমি এটা জয়ন্তকে জানিয়ে দিও।

—কিন্তু দাদা!

—দাদা এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বল্‌তে প্রস্তুত নয়। ছেলে ছুটোকে মানুষ করতে হবে তা বোঝো ত! That's all. আমার এখন ঘুম পেয়েছে। মা, আমায় সাড়ে চারটের সময় ডেকে দিও ত! অনেক কাজ আছে কাল।

চমৎকারিণী ক্লান্ত স্বরে বলেন—অত ভোরে আমি বুড়ো মানুষ উঠ্‌তে পারব না বাপু। আমার ঘুম ভাঙ্‌লেই ডেকে দেবো।

প্রভঞ্জন হেসে জবাব দিলে—না, না দেরী হ'লে চল্‌বে না। তুমি ত সেই সাড়ে তিনটের সময় উঠে তোমার ঠাকুর-দেবতার কানে মন্তর দেবে; তোমার যতো বুড়ো হওয়া কেবল আমায় ভোরবেলা ডেকে দেবার বেলায়। ওসব চল্‌বে না। ডেকো কিন্তু।

০

ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার কালো শেলের চশমাটা চোখ থেকে খুলে রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে নিয়ে বললে—Next. এরপর কে আছেন আসুন।

পাশের ঘরে প্রায় ৩০।৩৫ জন স্ত্রীলোক এবং পুরুষে মিলিয়ে অপেক্ষা করছে। ডাক্তার বাবুর গলার আওয়াজ পেয়েই দু'তিনজন লোক একসঙ্গে স্প্রিং-এর দুটো পাল্লা ঠেলে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। কম্পাউণ্ডার বললে,—জগপতি চৌবে!

জগপতি ঘরে ঢুকে গেল। ডাক্তার চশমাটা চোখে লাগিয়ে নবাগত রোগীর দিকে ভ্রুকুটী ক'রে বল্‌লে—কেমন আছ? কিছু কম মনে হচ্ছে?

—আজ্ঞে অনেকটা কম। বিনীত এবং কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে নিবেদন করল চৌবে। জগপতি চৌবের এই অপূর্ব বিনয়াবতার রূপটি খুব দুর্লভ। একমাত্র বৃহত্তর মহাজনের দ্বারস্থ হ'লে সে এই পোশাকী চেহারায় করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করে। বড়বাজারের গদিতে সমাসীন শেঠ জগপতিরাম চৌবে পৃথিবীকে নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই দেখতে অভ্যস্ত। মক্কেলদের ধমক দিয়ে ছাড়া কথা বলে না সে। আজ ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে হ'তে পারে

ডাক্তার সরকারের চোরাগুদামে লুকোনো ওষুধপত্রগুলি সে দাঁও মেরে সস্তায় কেনবার জন্যই এরকম গরুড়ভাব অবলম্বন করেছে।

—হুঁ, হাসি ফুটেছে দেখছি।

পাশের ছোট টেব্‌লে টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোনটা এমন শব্দ করে যেন মনে হয় পৃথিবীতে সেটার দাবিই সর্বাগ্রে। কম্পাউণ্ডার দৌড়ে এসে রিসিভার তুলে ধ'রে বললে—হ্যালো, এঁ্যা! হ্যাঁ আছেন! তিনি রোগী দেখ্‌তে ব্যস্ত।

ওদিকে প্রভঞ্জন সরকার জগপতিকে খুব কড়া ধমক দিচ্ছে—তোমাদের যত ছোটলোকী কাণ্ড!

—আর এ ভুল হবে না ডাক্তার সাব্‌।

—কিন্তু এখন কি করছ তাই বলো। নিজের আর কি, অসুখ ত সেরে গেল, ব্যস্‌! ঘরে যে বৌটা মরবে। এর ওপর আবার বল্‌ছ, তার ছেলে হবে।

—আজ্ঞে তার ত কিছু হয়নি অসুখ-বিসুখ।

—হয়েছে কি-না তুমি কি ক'রে জানলে? ডাক্তার হয়েছ! জানো এসব রোগ তোমার হওয়া মানেই তারও হওয়া। এখানে আন্‌লে পয়সা লাগবে ব'লে অসুখ পুষে রাখলে পরে ছেলেপুলে নিয়ে নাকাল হবে! তাকে এগজামিন করাও।

—আর আমার কি হবে বাবু? আমায় কিছুটা ফি মাপ করে দিন দয়া করে হুজুর।

প্রভঞ্জন কঠিন কণ্ঠে বলে—না, ওসব হবে না। বাতাসী বিবির ফি এক আধলা কমাতে পেরেছিলে? রোগ ধরাবে পয়সা খরচ ক'রে আর সারাবার বেলা মুফৎ? ও সব হবে না।

কম্পাউণ্ডার রিসিভারের মুখটা একহাতে চেপে ধ'রে ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে—স্যার, এগারোটার সময় পার্কিনসন প্লেসে যাবার কথা বল্‌ছে। কিন্তু তার মধ্যে এদিকের চুক্‌বে বলে মনে হয় না ত!

—বলে দাও একটার সময়। ওধারে ত কেস আছেই, যখন যাবো একেবারে সেরে আসবো।

—আচ্ছা।

কম্পাউণ্ডার রিসিভারটা প্রভঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লে—পরমেশ নন্দী কথা বল্‌তে চান আপনার সঙ্গে।

প্রভঞ্জন বলে—ধরতে বলুন। কেসটা সেরে নিই।

জগপতির দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রভঞ্জন বলে—তোমার এখন কিছুদিন একদিন অন্তর ইন্‌জেকসন চলুক তারপর আবার পরীক্ষা করতে হবে। খরচ আছে বই কি! শেঠজী, দুনিয়াটা ফাটকার বাজার নয়। সুখের মাশুল দিতে হবে—সস্তার অসুখ। আর তোমার স্ত্রী **pregnant**, এ অবস্থায় তাকেও ইন্‌জেকসন দিতে হবে।

—আমরা গরীব মানুষ ডাক্তারবাবু।

—হুঁ। গরীবের ঘোড়া রোগ হ'লে তা'র চিকিৎসা ত অল্পে হবে না!

প্রভঞ্জনের অচল গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে শেঠজী বুঝল আশা ভরসার কোনো কিছু নেই। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেশি দরদস্তুর করতে গেলে বিপদ আছে, কি জানি হয়ত সস্তাদরের চিকিৎসায় অসুখটা যদি আরও খারাপে দাঁড়ায়! ভেজাল দেওয়া দুনিয়ায় খাঁটি জিনিসের দর বেশি একথা জগপতির চেয়ে বেশি কে বোঝে! তাই সে ইনজেকশনের পর ষোলোটি টাকা দর্শনী দিয়ে নমস্কার ক'রে বিদায় হ'ল।

একটি জীর্ণবাস পরিহিতা বয়স্কা স্ত্রীলোক দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে, কেউ কিছু বলবার আগেই সোজা এসে টেবিলের নীচে মাথা গলিয়ে দিয়ে একেবারে প্রভঞ্জনের পা জড়িয়ে ধরল।

ব্যস্ত হয়ে প্রভঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—ও কী করছ ললিতার মা! কাজ করতে দাও, যাও বাইরে বসো।

ললিতার মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—না, ডাক্তার দাদা আমার আর বলবার মুখ নেই। তুমি দেবতা, তোমার কাছে নিত্য হয়ে আমরা বেঁচে আছি। তুমি না দেখলে কবে সব উজোড় হয়ে যেতো। তাই বলি, যাই একবার ডাক্তার দাদার কাছে ঘুরে আসি।

—যাও এখন কাজ করতে দাও। বাইরে বসো।

টেলিফোন ধরে প্রভঞ্জন অতি সংক্ষেপে বল্‌লে—হ্যালো, কে? পরমেশ, খবর কি? ও, বেশ, বেশ—ধন্যবাদ। কিন্তু ভাই আমি ত একটার আগে পারছি না যেতে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তার জন্তে ভাব্‌না কি—আরে সেকথা বল্‌বার দরকার ছিল না। তোমার পরিচিত Patient বলে আরও ভালো ক'রে দেখব? নইলে কি ভালো ভাবে দেখতাম না? নিশ্চয়,. পয়সা নেবো আর দায়িত্ব নেবো না, তা কি হয়? আচ্ছা নমস্কার।

একটি অল্পবয়স্ক যুবক শুক্‌নো মুখে প্রভঞ্জনের সামনের চেয়ারে এসে বসল।

তার মুখের দিকে ডাক্তারের দৃষ্টি পড়তে সে যেন আরও বিপন্ন বোধ করে। ডাক্তার প্রশ্ন করে—আপনার কি—?

বারকয়েক ঢোক গিলে, গলাটা খাটো ক'রে সে বললে—আজ্ঞে, একটু প্রাইভেট!

—বলুন, এ ঘর আমার একলার। কি ব্যাপার!

—আজ্ঞে, একটা Suspected Pregnancy.

শীতের শেষের শুক্‌নো গাছে নিষ্পত্র এবং ধূলিমলিন গাছের মত যুবকটির চোখেমুখে একটা রিক্ত রুক্ষতার ছাপ।

প্রভঞ্জন হেসে বলে—আপনি ত বেশ বিজ্ঞ দেখ্‌ছি। Suspected T. B.-র মত Pregnancy-ও একটা ব্যাধি নাকি?

ছেলেটি গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়—অন্যক্ষেত্রে এটা ব্যাধি না হ'তে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে রোগ বলাই ভালো।

—বেশ তাহলে mature করুক, দেখবেন দুশ্চিন্তা কাটবে। এই বুঝি প্রথম?

—So far as I know এটাই প্রথম।

—তার মানে?

—বল্‌ব সব, একটু সম্‌ঝে নিতে সময় দিন ডাক্তার বাবু!

তার উদ্‌ভ্রান্ত মলিন কান্তি দিয়ে সে বোঝাতে চায় পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত তার এই একান্ত নিজস্ব সমস্যায়। দুনিয়াটা তার চোখে ছোট হয়ে গেছে।

ছেলেটি মাথা নীচু ক'রে মিনিট দুই চুপ ক'রে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে—আপনার সাহায্য চাই। এ অবাঞ্ছিত সন্তানকে আমরা কেউই মেনে নিতে পারব না।

—কিছুকাল আগে সেটা চিন্তা করা উচিত ছিল। সে মেয়েটি যদি অবিবাহিত হয় তবে আপনি বিয়ে করুন। এবং সন্তানকে নিজের বলে স্বীকার করুন।

—আর যদি বিবাহিত হয়?

—তবে ত সামাজিক স্বীকৃতি ঠেকাতেই পারে না কেউ।

—আজ্ঞে মুস্কিল হয়েছে সেইখানেই। মন আমার কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না এই অস্বস্তিকর ব্যাপারটা।

—অর্থাৎ? বিয়ে করেছেন, আর সন্তানকে অস্বীকার করতে চান? *তা-ই যদি মতলব ছিল তবে বিজ্ঞানের সহায়তা আগে নিলে ভালো করতেন। এখন যা হবার তা ত হয়েছেই, উপরন্তু একটি মেয়ের স্বাস্থ্যের উপর অত্যাচার করা কি ঠিক হবে?* It will tell upon her mind and body.

ছেলেটি হঠাৎ জ্বলে উঠে ফেটে পড়ল যেন—তার দিকটাই দেখ্‌ছেন কেবল? আর আমি, আমার বাবা-মা, ভাইবোন এদের দিকটা একবার ভাবছেন না। আমাদের বাঁচতে হলে, সমাজে মুখ দেখাতে হ'লে এ সন্তান স্বীকার করা অসম্ভব। ডাক্তারবাবু আপনি বুঝবেন না অহরহ কি যন্ত্রণার মধ্যে থাক্‌তে হয় আমাকে। আর পারছি না।

—আপনি কি বল্‌তে চান? স্পষ্ট করে বলুন।

—আমার বিয়ে হয়েছে আজ সাঁইত্রিশ দিন। বৌ এর শরীর খারাপ ব'লে দিন তিনেক আগে ডাক্তার ডাকা হয়। তিনিই বলেছেন,—advanced stage.

—I see! এটা কি আপনার প্রেম-পীড়িত বিবাহ? মানে Love marriage?

—আজ্ঞে না, বাবা-কাকা সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে দিয়েছেন। মার্চেন্ট অপিসের

কেরাণী, দু'বেলা ত দুটো টুইশান করি। কাজেই ওসব প্রেম-টেম করবার সময় নেই।

ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে করতে আরও অনেক কথা ঝড়ের বেগে ব'লে যায়। প্রভঞ্জন স্তব্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ একসময়ে ছেলেটি প্রভঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বল্লে—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এমন হয় না, যাতে রোগ আর রোগী দুই-ই শেষ! যত টাকা চান দেবো! এই জ্বালাযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন আমায়!

প্রভঞ্জন গম্ভীরভাবে বলে—উত্তেজিত হবেন না। শান্ত হোন। পাশের ঘরে লোক রয়েছে।

—আমায় আপনি পাগল ভাবছেন, না? কিন্তু মোটেই তা নই, আমার মত ধীর-স্থির ছেলে ছিল না, কিন্তু সে যাক্! How much do you want?

—আঃ, আপনি কি ডাক্তারদের মানুষ মনে করেন না? এ প্রস্তাব অপমানকর। এসব কাজের জন্য অন্য লোক আছে। যাদের চিকিৎসা ক'রে পসার হবার আশা নেই, তারা গোপনে এইসব নোংরা কাজ ক'রে থাকে।

—But you are a man! আপনি আমার সব কথা শোনবার পরেও কি মনে করেন যে আমি অন্যায় করতে যাচ্ছি! পৃথিবীতে এমন সভ্য দেশ আছে যেখানে অবাঞ্ছিত সন্তানকে জন্মের আগে সম্ভাবনাতেই নির্মূল করা হয়ে থাকে—আইনসঙ্গত ভাবে সেটা সমাজ অনুমোদনও ক'রে থাকে। আমার ইচ্ছে নয় আজেবাজে লোকের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিই, তাতে প্রসূতির স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা খুব বেশি। হয়ত উত্তেজনার বশে আমি তার প্রতি কটু মন্তব্য করেছি, তাই বলে সত্যিই ত আর তাকে মেরে ফেল্‌তে চাই না।

—আচ্ছা ভেবে দেখি কোনো যোগ্য লোক ব্যবস্থা করতে পারি কিনা! তবে এখনই কথা দিতে পারছি না। পরে জানাবো।

—না, না, অনিশ্চিতের মধ্যে আমি থাকতে রাজি নই। হ্যাঁ, আপনি না হয় সোজাসুজি আজ বিকেলেই জবাব দেবেন, দুপুরটুকু ভাবুন। আমি আসব সাড়ে পাঁচটার সময়।

—আচ্ছা, আপনি কি কোনোদিনই সন্তান না-হওয়া চান ?

বর্ত্তমানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্ম আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। এরপর আপনি যা ভালো বুঝবেন— !

—আচ্ছা, এখন অন্য অনেক কাজ বাকী—আপনি কাল সকালে একবার ফোন করবেন। বিকেলে আমি কখন থাকব তার ঠিক নেই।

ছেলেটি গমনোদ্যত গতি সংযত ক'রে বল্লে—আপনার নাম শুনেছি খুব। দেখবেন, আমার কথাটা একটু সহানুভূতির সাথে ভাববার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা নমস্কার ! হ্যাঁ, আপনার দক্ষিণা কি—

আমি ত case হাতে নিইনি। থাক ওটা আর দেবেন না।

—কিন্তু আপনার এতক্ষণ সময় নষ্ট করলাম।

—এখন থাক। পরে অনেক বেশি খরচ হতে পারে। আচ্ছা নমস্কার। আর একটা কথা বলে রাখি, যদিও শুনতে ভালো লাগবে না তবু কথাটা মিথ্যে নয়—এই সব দুর্ঘটনাকে এত মর্মান্তিকভাবে এখন যাঁরা নেবেন তাঁদের পক্ষে পৃথিবী অচল, অথবা পৃথিবীর পক্ষে তাঁরা অপাংক্তেয়। এত বড় একটা যুদ্ধ যেখানে ঘটে গেল, সেখানে এর চেয়ে কত মারাত্মক অনাসৃষ্টি চলেছে এবং চল্‌বে তার খোঁজ রাখেন কি ? আপনি আপনার নিজস্ব গণ্ডী নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চল্‌ব কেন ? চারদিকে চোখ মেলে দেখুন !

—ডাক্তারবাবু, আমি যদি আমারটুকু না দেখি তবে কে দেখবে ? আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই নে।—তবে একটা প্রশ্ন করি, আপনার জীবনে যদি এরকম ঘটনা ঘটত তাহলে আপনি কি করতেন ? Honestly বলুন। অসহ্য ! জানেন, দিনরাত্র কী যে আকাশপাতাল চিন্তা করি তার কোন অর্থ হয় না। এক এক সময় ভয় হয় পাগল হয়ে যাবো। এখন মনে হচ্ছে ওই cursed issuse-টাকে যদি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে পারি তাহলেই আমার মনের শান্তি ফিরে আসবে। অথচ নিজেকে খুব উদারচেতা বলে প্রচার করেছি। বাড়ীতে সবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছি, একটি আধ্‌লা পণ নিতে দিই নি আমার বিয়েতে। কিন্তু অবাক হয়ে যাই—ডাক্তারবাবু, **Now I am ready to murder !**

প্রভঞ্জন ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে—আপনি উত্তেজিত হবেন না। পৃথিবীতে আপনার চেয়ে দুঃখীর অভাব নেই।

ওপাশ থেকে টেলিফোনটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। ডাক্তার নিজেই রিসিভারটা তুলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে সাড়া দিল—হ্যাঁ, হ্যালো!

ছেলেটি স্প্রিং দরজার পাল্লা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

একে একে রোগী দেখা হয়ে গেল। ললিতার মা আস্তে আস্তে ঘরে এসে বসল।

প্রভঞ্জন ডায়েরীর পাতা উল্টে আজ কোথায় কোথায়যেতে হবে দেখছিল। ডায়েরীতে চোখ রেখেই বললে—আবার কী হ'ল তোমার?

—আর দাদা, আমার দুঃখের কথা ব'লো নি। মেয়েটার অরুচি হয়েচে। এদিকে পেটে ভাত জোটে না। কিন্তুক ভগবানের কি এমনি আইন—আরে বাপরে বড়লোকের ঘরদোর খাঁ-খাঁ করবে, খাবার লোক নি! আর আমাদের বস্তীর একখানা ঘরে মা বষ্ঠির দয়ায় এমন্নটি-এমনটি ক'রে গণ্ডায় গণ্ডায় বেড়াল ছানার মত সী-সী ক'রে শুকিয়ে মরতি আসবে।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পদোচিত গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে ডাক্তার বলে—জামাই কি করে?

—আর জামাই! জামাই ত লয়, চামার। এই ত দিনকাল, চটকলের চাকরী। তা বাবুর লবাবী কত! এক বিয়ে করা পরিবার নলিতে, তার ওপর আবার সাধের মেয়ে মানুষ আছে একটি। তিনি ত সেখানেই ছেলেন এ্যাদ্দিন। মেয়েটা চোখের সাম্‌নে হেদিয়ে মরে। তা বুঝলে দাদা, অনেক লোভ দেখিয়ে, ফন্দিফিকির এঁটে জামাইকে নে এলুম। বল্লুম, তোমার চাকরী করতে হবে না, আমি ঘরে বসিয়ে খাওয়াবো। তা বুঝলে, বাবু ত এলেন। মেয়েটার মুখে হাসি। দিনরাত হাসি! কিন্তু গরীবের কপালে সুখ সইবে কেন? মাস যেতে না যেতেই মেয়ের অরুচি, কিছু মুখে তোলে না। বলে শরীল খারাপ করতেছে। সেই শুনে জামাই ত মহামারী ব্যাপার করলে, বললে,—নলিতে সতী লয়।' আরও কত কেলেঙ্কার, ডাক্তার দাদা। এইসব সতেরোগণ্ডা বলে, সে নেমকহারাম ত সরে পড়েছে।

—বেশ করেছে। তা আমি কি করব? তোমাদের মনের সাধ মিটেছে ত!

—বল্‌ত নজ্জাও নাগে, কিন্তুক সরমের মাথা খেয়ে মেয়ের হয়ে ভিক্ষ চাচ্ছি, হেই দাদা! গরীব মানুষ এমনিতে না খেয়ে মরছি, এর ওপর বংশ বিদ্ধি হলে আর ওক্কে নেই। যদিও ভগবানের দান, তা বলে কি করি! গাছগাছ্‌ড়া অনেক করিছি, কিছুতে কিছু লয়। ও একেবারে বেদবাক্যির মত হয়ে রয়েছেন। তুমি একটা ওষুধবিষুধ দিয়ে মেয়েটারে আমার বাঁচাও।

—ওসব করবার আমার সময় নেই। এতদিন যা করেছ এবারও তাই কর'। রেললাইনের ধারে ফেলে দিয়ে এসো। পেটে ভাত নেই, এদিকে হুঁস থাকে না!

—হেই দাদা অমন বলো নি! এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমরা কস্মিন কালেও জ্যান্ত পিঁপড়েটা পর্য্যন্ত মেরে ফেলি নি। মায়ের প্রাণ কি তা পারে? সে যারা করে তারা ডাইনী, সে ওই তোমাদের ভদ্দর ঘরের কেলেঙ্কার, যা বল্‌ব সত্যি কথা হ্যাঁ! তবে হ্যাঁ, দৈবি-টোটকা এসব করি বটে—আমরা ছোটনোক। কিন্তুক একবার জন্মালে যে সন্তান হয়, তাকে মারে কার সাধ্যি! ভগবানের ভয় কে না করে দাদা, বলো!

ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার প্রথম যখন আধা ইংরেজ পাড়ায় পসারের জন্য বসেছিল তখন থেকেই তার সংকল্প ছিল মানুষের উপকারই করবে যথাসাধ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষকে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আজ নীতি-দুর্নীতির সূক্ষ্ম বিচারটা তার কাছে রীতিমত সমস্যারূপে দাঁড়িয়েছে। এক দিক দিয়ে যে কাজকে সে অন্যায় প্রতিপন্ন করে অন্য দিক দিয়ে ঠিক মানবচরিত্রের স্বভাবের মানদণ্ডে ওজন করলে দেখা যায় সেই অন্যায়টাকে দোষ দেওয়া কঠিন। বর্ত্তমানে তার ব্যক্তিত্বের বাইরের পৃথিবীকে ন্যায় অন্যায়ের বদলে সে স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক এই দুই পর্য্যায়ে ফেলে দেখ্‌তে শুরু ক'রেছে।

ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার অধিকতর গাম্ভীর্য সহকারে বলে—আজ বড় বড় ব্যস্ত আছি ললিতার মা। আমার এসব করার সময় নেই।

—আচ্ছা দাদা তবে কাল এসব। কিন্তু তুমি দয়া ক'রে এযাত্রা ওকে করো দাদা।

—না, না ওসব আমার ঘাড়ে চাপিও না।

—দাদা তোমার কাছে ছাড়া আর কোথায় যাই বলো। রাগ করো না দাদা, তোমার ত হাতযশ এদিকে আছেই। গরীবকে একটু ক্ষমা ঘেন্না ক'রো। দুধের বাছা আমার মরতে বসেছে!

পার্কিন্‌সন প্লেস। দুপুরবেলা পথে লোকজন নেই। দু' একটি মোটর নিঃশব্দ পরিবেশকে মুহূর্তের জন্য উচ্চকিত ক'রে চলে যায়। পথের দুধারে বড় বড় গাছ, তার ডালের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে নীচের ছায়াচ্ছন্ন মাটিতে—রোদের টুক্‌রোগুলো যেন কোন্‌ শ্যামলী মেয়ের কানে মিনে করা ঝুম্‌কো!

একটি তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলার জানালায় উদ্‌গ্রীব একটি মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি এক একবার জানালায় এসে দাঁড়াচ্ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। ড্রেসিং টেব্‌লের ওপর রাখা ছোট্ট একটি হাতঘড়িতে একবার সময় দেখ্‌ছে এবং নিজের অজ্ঞাতেই নিজের বেশবিন্যাস আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখে নিয়ে আবার জানালায় ফিরে আস্‌ছে।

ঘরের ভিতর একটি শেটিতে বছর ত্রিশের একটি সুদর্শন ব্যক্তি বসে বসে মার্কিণী কোনো সচিত্র মাসিক পত্রিকার ছবি দেখ্‌তে ব্যস্ত। মেয়েটির চলাফেরা তার তন্ময়তাকে কিছুমাত্র ব্যাহত করছে না।

এক সময়ে মেয়েটি হতাশভাবে ফুলদানী রাখার মাঝারী টেব্‌লের ওপর বসে পড়ে বল্‌ল—ত্থাখো পরমেশ তোমার ডাক্তারটির কাণ্ড। দেড়টা বাজতে চললো এখনও পাত্তা নেই।

—দেড়টা বেজে গেল? আমি তাহলে চলি, আজ আর কামাই করা চলবে না।

—না, না, তুমি গেলে আমার বড্ড অসুবিধে হবে। সব কথা সবাইকে বলতে কেমন সংকোচ হয়। তুমি থাকো।

—তুমি-ই আমার সর্ব্বনাশ করবে। একেবারে প্রফেসরের সাম্না সাম্নি ধরিয়ে না দিলে আর উপকার কি করা হ'ল?

—তোমার সর্ব্বনাশ কেউ করতে পারবে না। সূর্য্যকে কেউ পুড়িয়ে মারিতে পারে? উঃ কী আমার ছাত্র রে। ক'বছর ডাক্তারী পড়ছ?

—তা হিসেব ক'রে দেখলে হয়ত দেখা যাবে যে প্রভঞ্জন সরকারের সঙ্গেও পড়েছিলাম। যাই বলো প্রভঞ্জন খুব ভাল ছাত্র ছিলেন।

—ছাত্র যেমনই থাকুন না কেন, ব্যবসায়ী ভালো নন্। সময়ের সম্বন্ধে একেবারে বেহুঁস। নইলে দেড়টা বেজে গেল! এখনও পাত্তা নেই!

—তা যা বলেছ। একবার একটি রোগীকে ধ'রলে তাকে জেরায় জব্দ ক'রে ছাড়ে। স্রেফ সব কিছু ভুলে যায়, সেই হচ্ছে ওকে নিয়ে মুস্কিল। ফলে অনেক কেস ছেড়ে দেয়, বলে, 'সময়ে কুলোতে পারি না।' তবে ওর হাতে পেসেণ্ট ছেড়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারো তুমি।

পরমেশ এবং রমিতা যখন প্রভঞ্জনের সম্বন্ধে এইসব আলোচনা করছিল সেই সময়ে নীচে একখানা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ শোনা গেল। বলাবাহুল্য যে, সিঁড়ি দিয়ে নাম্বার সময় সে বাঁ হাত দিয়ে বিক্ষিপ্ত চূর্ণ কুন্তলকে আরও একটু ছড়িয়ে দিল।

একটি সবচেয়ে হালে আমদানী সিৎরোঁয়া গাড়ি থেকে ডাক্তার সরকার বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে রমিতা নেমে এসেছে, ডাক্তারকে নমস্কার ক'রে রমিতা বল্লে—আপনিই ডাক্তার সরকার? আসুন।

—হ্যাঁ। ব'লে প্রভঞ্জন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—আমি রমিতা রায়। আসুন, ওপরে আসুন।

উপরে উঠ্তে উঠতে ডাক্তার সরকার প্রশ্ন করে—নন্দী এসেছিল নাকি?

ঘরের ভিতর থেকে পরমেশ সাড়া দেয়—এই যে, এই ঘরে আসুন স্যার।

ঘরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে, নিজের অজ্ঞাতে ডাক্তার একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—তারপর কি ব্যাপার?

পরমেশ বার কয়েক কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তেমন বল্‌লে—তেমন কিছু নয়। আপনার পেসেণ্টকে ত দেখ্‌লেন। ইনি নামকরা ফিল্ম্‌ স্টার। বর্ত্তমানে খুব পসার।

—That is immaterial. অসুখটা সম্বন্ধে কিছু জানো?

পরমেশ হেসে জবাব দেয়—এ সব লাইনে যা যা হ’তে পারে, মোটামুটি এঁর সে সবই আছে।

—I see. কই তিনি কোথায় গেলেন? সময় অল্প, তাঁকে ডাকো।

পাশের ঘর থেকে রমিতা সাড়া দিল—আপনি দয়া ক’রে এই ঘরে আসুন ডাক্তার বাবু।

পর্দ্দা সরিয়ে দিলে পরমেশ। ডাক্তার সরকার ঘরে ঢুকে দেখলে রমিতা কাউচে বসে আছে।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ডাক্তার বসে বল্‌ল—আজ ত আপনার রক্ত পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। আগে দেখা দরকার—

তাঁর কথা শেষ না হ’তেই পিছন থেকে পরমেশ বল্লে—আপনার সুবিধের জন্য ব্লাড্‌ এ্যানালিসিস্‌ থেকে শুরু ক’রে যা যা দরকার সবই করিয়ে রেখেছি—এই দেখুন।

পরমেশের দিকে তাকিয়ে প্রভঞ্জন অকুণ্ঠভাবে হাসতে লাগ্‌ল—আরে আমি ভুলেই গেছিলাম তুমিই ত ডাক্তার! Thanks.

এক মিনিটের মধ্যে এক গোছা রিপোর্ট সে এনে ধরলে ডাক্তারের সম্মুখে। ডাক্তার উল্টে পাল্টে দেখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একবার রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—হুঁ। তা ত বুঝলাম। কিন্তু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

রমিতা ম্লান হাসি হেসে বলে—সে কথা আমার চেয়ে ত আর কেউ বেশি জানে না। তবু আন্দাজ একটা বলুন দেখি কতদিনে সারবে?

—সারা না-সারা আমার চেয়ে আপনার হাতেই বেশি নির্ভর করে।

—তাহলে বোধহয় কোনোদিনই আরোগ্য লাভ আমার ভাগ্যে নেই।

—তার মানে, আপনি রোগ পুষে রাখতে চান। তবে আর পয়সা খরচ

ক'রে ডাক্তার ডাকা কেন? যদি আপনি কথামত না চলেন ত আমিই বা রোগের চিকিৎসা করব কি ক'রে।

রমিতা চোখমুখ ঘুরিয়ে এক অপূর্ব্ব মোহিনী ভঙ্গি ক'রে বলে—আমার চিকিৎসা দরকার কেবল শরীরটাকে কাজ চলার উপযুক্ত রাখার জন্য। আপনি শুধু সামলে দেবেন, অর্থাৎ আমার বর্ত্তমান জীবন ধারার পরিবর্ত্তন না ক'রেও যাতে খাড়া থাকতে পারি এইটুকু চাই। আমার ধর্ম্ম যৌবনধর্ম্ম! আমার কর্ম্ম জৈবপথে। অবিমিশ্র জীববৃত্তির পথ থেকে এ পথ স্বতন্ত্র। আমার এসব কথা হয়ত আপনার পছন্দ হবে না, কিন্তু কি করব, আত্মপরিচয় না দিলে আপনার কাজের অসুবিধে হবে তাই বলছি।

—আপনি একটি peculiar case. আমার চেয়ে ভালো ডাক্তারের হাতে আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার। আপনার ব্যাধির চেয়ে আধিই বড়—দেহের চেয়ে মনটা বেশি অসুস্থ।

—না ডাক্তার বাবু, আমার মনের কোন রোগ নেই, এটুকু নিশ্চিত। মনকে মানিনা আমি। মন বলে কিছু নেই। আপনি ওসব মানসিক চিকিৎসার চেষ্টা করবেন না।

কয়েক মুহূর্ত্তের মত কেউ আর কোন কথা বলে না। ঘরখানা নির্জ্জন পথের মতই স্তব্ধ হয়ে থাকে। দেওয়ালের বড় ঘড়িটা টিক্ টিক্ ক'রে চল্‌ছে শুধু জানালার পর্দ্দাটা তারের বাঁধনের বাধা পেয়ে বাতাসের বেগে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। মাথার ওপর পাখা ঘোরার একটা নিরবচ্ছিন্ন সোঁ সোঁ শব্দ।

ডাক্তার সরকার প্রশ্ন করে—আপনি কি এতে খুব আনন্দ পান? এই ধরণের জীবনযাত্রায় কিছু মধুর্য্য আছে কি?

রমিতা তির্য্যক দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে জবাব দেয়—এ প্রশ্নটা কি চিকিৎসার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, না এ কেবল আপনার কৌতূহল?

—আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল নয় বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা!

—তাহলে শুনুন, আমি আনন্দও পাই আবার কষ্টও পাই।

বাইরে কলিং বেলটা বেজে উঠ্‌ল। রমিতা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ [illegible] ভাবে পরমেশের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—তুমি গাড়ীটা বার করো।

তো। I am sorry ডাক্তার বাবু, আমার খুব জরুরী কাজে বেরুতে হচ্ছে। আমি আর এক মিনিটও আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে পারব না। মার্প করবেন। If you don't mind—কাল ঠিক একটার সময় আসবেন। অথবা যে সময়ে আসবেন সেটা আগে খবর দেবেন, নইলে মুস্কিল হবে আমার।

পরক্ষণে রমিতা উঠে চলে গেল। প্রভঞ্জন ঠিক বুঝতে পারে না তার কি করা উচিত। আধ মিনিটের মধ্যেই একজন বৃদ্ধ এসে ডাক্তারকে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল—এই যে আপনিই ডাক্তার সরকার, কিছু মনে করবেন না, আমার মেয়েটা ওই রকম খামখেয়ালী। হ্যাঁ, দেখ্‌লেন ত সব? আর সবই ভালো, কেবল দোষের মধ্যে ওর মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, বুঝলেন!

ডাক্তার সরকার উঠে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে পড়ল—ওকী, এরই মধ্যে চল্‌লেন নাকি? বসুন না একটু গল্প করা যাক। না, থাক আপনি খুব ব্যস্ত আছেন বুঝি। আচ্ছা একদিন সময় ক'রে আসবেন, চা-টা খাওয়া যাবে। বুঝলেন, এখানে এত Lonely মনে হয়। আজ আপনি বড্ড ব্যস্ত না? এই যে আপনার ফি-টা ধরুন।

কখনও প্রভঞ্জন কোনো রোগীর এরকম অভদ্র আচরণ পায় নি। নূতন অভিজ্ঞতার ধাক্কাটা এখনও সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে নি ব'লেই বৃদ্ধের কথাটা শুনতে পায় না সে। দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় প্রভঞ্জন। বৃদ্ধ আর খানিকটা এগিয়ে তার হাতে পাঁচখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল। এবারে সে যেন চিন্তারাজ্য থেকে ফিরে তাকাল—একী! এত কেন? আমার ফি কুড়ি টাকা।

বৃদ্ধ জিভ্ কেটে বল্‌লেন—সে কী হয়! আপনার ফি যাই হোক রমি যে পঞ্চাশ টাকা দিতে বলে গেছে।

—না, সে হয় না। তিনি যাই বলুন এ তিরিশ টাকা আপনি রাখুন।

বৃদ্ধ বলে—না মশাই, সে আমি পারব না। ওটা আপনাকে নিতেই হবে।

—Impossible. I am not a beggar. আমি আমার স্থায্য পাওনার বেশি কেন নেব? তাঁকে বলে দেবেন দুনিয়ায় টাকা দিয়ে সব কেনা যায় মনুষ্যত্বটুকু ছাড়া। আচ্ছা নমস্কার।

বৃদ্ধ একবার চারদিকে বেশ ভালো ক'রে চেয়ে দেখে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্‌ল—আপনি নিলেই পারতেন, She has enough to spare. ওর ত দেখি খরচা হয় না আর কিছু। একমাত্র খরচ যা ডাক্তারের পিছনে।

প্রভঞ্জন সরকার গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দেবার আগে একবার ডায়েরী খুলে দেখে নিল এরপর কোথায় যেতে হবে। মনে মনে সে হিসেব ক'রে দেখ্‌লে এখনও চারটে বাড়ি যেতে হবে—তার মধ্যে একটি সিরিয়াস টিটেনাস কেস, দুটি পুরোনো জ্বর। বাড়ি ফিরতে খুব কম হ'লেও বেলা চারটে বেজে যাবে।

ষ্টিয়ারিং ধ'রে তার মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। সামনের ফাঁকা রাস্তা যেন মোহ বিস্তার করে তার মনোরাজ্যে! অনেকক্ষণ পরে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সেই কোন সকাল থেকে শুরু হয়েছে একটানা দুঃখের ইতিহাস শোনার পালা—বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র সমস্যা। সকলেই ডাক্তারের কাছে আসে দুঃসহ বেদনার ভার নামিয়ে দিতে, আশ্বাস খুঁজতে।

গাড়ির গতি কিছু মন্থর ক'রে দিয়ে প্রভঞ্জন সাম্‌নের দিকে পা ছড়িয়ে মুখের মোটা সিগারেটটা দু-এক টান দিতে দিতে চোখের সামনে দেখলে—একটি সুন্দর মুখ। সে মুখের কমনীয়তা, কোমল আবেদন, ওষ্ঠের রক্তিম আভা, চোখের ঘন টানা চাহনী—সবই সুন্দর। এই ত রমিতার চেহারা। কিন্তু মেয়েটির মন যেন মাটি স্পর্শ করে না। তার মধ্যে একটা কঠিন অবজ্ঞার ঔদ্ধত্য স্বতঃস্ফূর্ত। পরক্ষণেই ডাক্তারের মনে পড়ে যায় রমিতার রক্তের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের হিসাব—রোগ জর্জর প্রতিটি রক্তকণিকা। রমিতা তার কাছে একটি জটিল সমস্যা। জগপতি চৌবের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই কি? আছে, জগপতি রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় আর রমিতা মোটেই তা চায় না। প্রভঞ্জনের মনে হয় এই সব মেয়েই এক একটি সমাজে রোগ-বিস্তারের কেন্দ্র হয়ে ছড়িয়ে

বেড়ায় বিষ।…তার মনে পড়ে যায় Salversion, Neosalversion, Bismath, Penicillin. ক্রমে ক্রমে কত জীবনকে বিপন্ন ক'রে কত সময় অতিবাহিত হয়ে তবে এই চিকিৎসার ক্রম উন্নততর পথে এগিয়ে এসেছে। একদিকে যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করেছে তেমনি আর এক দিকে মানুষের অত্যাচারের প্রবৃত্তিও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। পথ যতই মনোরম হোক না কেন, পথিকের অসংবৃত পদলাঞ্ছনায় তার সে সৌন্দর্য্য মূল্য পায় না।

গাড়ি চলতে চলতে আর একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রভঞ্জন নিজেই নিজের গাড়ী চালায়। এটা তার আনন্দের খোরাক।

রাত সাড়ে এগারটার সময় রমিতার বাড়ির সামনে একটি গাড়ি এসে থামল। দুপুরে যে গাড়ীতে রমিতা বেরিয়েছিল এখানা সে গাড়ি নয়—তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। দুটি তরুণ যুবক তাকে গাড়ি থেকে ধরে নামায়। তার আলগা আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শিথিল হাতে আঁচল তুলে নিয়ে রমিতা বললে—আচ্ছা আপনাদের অশেষ ধন্তবাদ প্রিন্স। আজকের মত বিদায় নিই। আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট করলেন আপনারা।

একজন বললে—না, না কষ্ট আর কি? চলুন আপনাকে ওপরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—তার দরকার নেই। আমি অবলা নারী নই—If I can stand so many pegs and you all, then I can walk this way at ease. কিচ্ছু ভাববেন না আপনারা।

তরুণ দু'টি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে—আমাদের এভাবে তাড়িয়ে দেবেন না, এই ত কয়েকটা সিঁড়ি, সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি, অনুমতি দিন।

রমিতা আধবোজা চোখের পাতা মেলে দিয়ে বলে—তারপর? যবনিকা! কালো যবনিকার গভীর অন্ধকারে পথ হারিয়ে যেতে পারে, হয়ত ফিরে আসবার পথও খুঁজে পাবেন না। আমারও একদিন হয়েছিল এমনি—তারপর থেকে চলেছি ত চলেছিই।

অপেক্ষাকৃত সুন্দর যে ছেলেটি সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে—আপনার কথাই যেন সত্যি হয়—পথ যেন হারাতে পারি—

তারপর ছেলেটি রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইতে শুরু করল।

রমিতা সহসা ভ্রূকুটি ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কে যেন ওর সমগ্র সত্তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। স্পষ্ট জড়তাবিহীন কণ্ঠে রমিতা বল্‌লে—রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঠিক এইসব ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কলম ধরেন নি। আমার অনুরোধ আপনারা তাঁকে উত্যক্ত করবেন না দীপ্তেন বাবু!

—মাপ করবেন। আমি সত্যিই—সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি।

—সে যদি বলেন ত আমিও আপনাকে ভালোবাসি। কত ছেলেকে ভালোবেসেছি তা যদি জানতেন—?

—আমার তা জানবার দরকার নেই, শুধু চাই ভালোবাসতে। সেইটুকু অধিকার পেলেই খুসিতে পাগল হয়ে যাবো।

—দোহাই আপনার, আমাকে যেন পাগল করে মারবেন না। রাস্তায় দাঁড়িয়েই আপনার যে উচ্ছ্বাস, তাতে এত রাত্রে বাড়িতে প্রবেশাধিকার দিতে ভরসা হয় না। আচ্ছা আজকের মত নমস্কার।

—আর এক মুহূর্ত্ত সময় চাই। এই আংটিটা তোমায় পরতেই হবে, অনুরোধ নয়, প্রার্থনা।

রমিতা সাগ্রহে হাত পেতে নিয়ে আংটির দিকে না তাকিয়েই বল্‌লে—আসল হীরে যে।

—তোমাকে কি নকল দিতে পারি?

—অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু এত ভালো হীরে দেখিনি। আসল হীরের জ্যোতিই আলাদা, কি বলেন?

—কাল আবার দেখা হ'বে। রাজকুমার দীপ্তেন উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল।

—কাল আমার অন্য কাজ রয়েছে যে! অন্য ষ্টুডিয়োতে—।

—আচ্ছা বেশ ত, কখন বেরুবে বল, সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না। একচেটে করতে গেলে ঠকবেন দীপ্তেন বাবু। আমার বাহন হয়ে নিজেকে খাটো করবেন না।

—না, না তা নয়, সেটা গৌরবের কথা—আমার সৌভাগ্যের কথা। I am always yours. কাল আসব।

রমিতা আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ায় না। শরীরটা খুব ক্লান্ত, কি রকম যন্ত্রণা হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। এখন কোনো রকমে শয্যার আশ্রয় নিতে হবে ওকে।

ছেলে দুটি ওর চলে যাওয়ার গতিভঙ্গির পানে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সিঁড়ির বাঁক ফিরে রমিতা অদৃশ্য হয়ে না যায়। তারপর দুটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গাড়িতে গিয়ে বসল তারা। এতক্ষণ যে ছেলেটি নির্বাক ছিল, সে এবারে বল্লে—Charming, সত্যি the precious Jewel. তোর নজরের তারিফ করি দীপেন। একেবারে স্বপ্নলোক হতে উর্ব্বশীর দীপ্তি নিয়ে নেমে এসেছে। হীরের আংটি কেন, দিতে পারলে নিজেকে লুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

—হ্যাঁ! তুই তো এদ্দিকে খুব ফর্ ফর্ করিস্ আমার কাছে। আর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ? একটা টুঁ শব্দ করলি না?

—না ভাই, আমার কেমন যেন ইয়ে হয়ে গেল। অবাক হয়ে শুধু ওকে দেখলাম—আর দেখলাম—আর দেখলাম। কথা ফুরিয়ে গেল, হাওয়া উবে গেল, পৃথিবী মুছে গেল—শুধু রইল ওই ছবি। সে ছবি উর্বশীর বল্‌তে পারো, মোনা লিসার বল্‌তে পারো, বিয়াত্রিশের বল্‌তে পারো, বিম্ববতীর বল্‌তে পারো Keats-এর La belle dame sans merci-র ছবি বলতে পারো।

And her eyes were wild···

···And there she lulled me asleep,

And there I dream'd—Ah!—woe betide!

আমার কোন হুঁস ছিল না ভাই। যখন চলে গেল তখন যেন মনে হ'ল···And no birds sing.'

—থাম, থাম। এখন অত বাজে না বকে কাল দুটো কবিতা লিখে নিয়ে আসবি। আমি ঠিক ওকে শোনাবো। এই আমার অভিযানের শুরু—সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। I must have her—Possess her.

এক জায়গায় গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দীপ্তেন বল্‌লে—এইখানে নামবি ত রতীন? কাল সকালে কিন্তু কবিতা আমার চাই। দেখব তোমার কাব্যরস কেমন মিষ্টি।

—নিশ্চয়। এমন Inspiration পেলে দেখিস বাংলাদেশকে স্বাকামীর বন্যায় ভাসিয়ে দেবো—গদ্য কবিতা নয়, দস্তুর মত ছন্দের জোয়ার দিয়ে। তাজা রক্তের মত জীবনময় কবিতা!

—সে কি রে old school! মিল দেওয়া কবিতা?

—বন্ধু, তবে সত্য কথাটা বলি শোনো। যখন ভাব আসে আর ভাষা জোটে তখনই হয় কবিতা—গদ্য কবিতা হচ্ছে ভাষার দৈন্যে গোঁজামিল।

—I don't admit.

—*অবিশ্যি আমিও তা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে মিল দেওয়া কবিতাই কবিতার পূর্ণাঙ্গ। দেখই না কাল লিখে এনে তোমায়* পড়ে শোনাই। আজ রাতে আর কোনো কাজ নয়।…তোমার জাগ্রত রাত্রি স্বপ্নে স্বপ্নে প্রভাত হোক, মধুর বেদনায় পাগল করুক তোমায়! আচ্ছা, বিদায় বন্ধু।

গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ হল, পরক্ষণে গাড়ীখানা রতীনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাত্রির নির্মল আকাশে উজ্জ্বল অসংখ্য নক্ষত্র উন্মনা রতীনকে তন্ময় করে।

সারাদিনের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। সাম্‌নে শুভ্র শয্যার নিবিড় আমন্ত্রণে রমিতা শিথিল বিবশ দেহ এলিয়ে দিল।

দিনমান কাটে প্রচণ্ড বন্যার বেগে। প্রতি পদে ও ভুলে থাকে আপনাকে। নিজেকে ভুলে থাকাটা ওর সাধনার্জিত। কিন্তু রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে একাকীত্ব আচ্ছন্ন করে ওকে। অনেক রকম চেষ্টা করেও রমিতা এই ভয়াবহ একাকীত্বকে এড়াতে পারে না। ক্লান্তিতে দেহের প্রতিটি অনুভূতি যখন শিথিল, নির্জীব হয়, যখন ওর নিজের ওপর নিজের দখল থাকে না, তখন

নির্ভীক সেই একাকীত্ব ওকে পেয়ে বসে। এর হাত থেকে নিস্তার নেই। চোখের ঘুম কোথায় যায়, নেশার ঘোর কাটে। ওকে দাঁড়াতে হয় নিজের মুখোমুখি। একটিই প্রশ্ন ওঠে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর আজও দিতে পারে নি সে। প্রশ্ন—এর শেষ কোথায়? কোথায় চলেছ?

প্রত্যহের ঘটনা-প্রবাহ ওর মনে চলচ্চিত্রের মত ঘুরে ঘুরে দেখা দেয়। মনের আপাত প্রসন্নতাকে তিক্ত করে, দগ্ধ করে। আজও বিছানায় শুয়ে পড়ে রমিতা দেখতে লাগল সারাদিনের ছবি।

ষ্টুডিওর ছবি।...অনুকূলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপনকারী যে ক্ষুধিত আদিম মানুষ উঁকি দিচ্ছে, তাকেই রমিতার সবচেয়ে বেশি ভয়। বাসাডেরার পাহাড়ে অনুকূল প্রথম যে ছবি তুলেছিল আজ থেকে কয়েক মাস আগে, সে ছবি আজও অনুকূল দিল না রমিতাকে, একবার দেখিয়েছিল মাত্র। তারপর সেটাকে বড় করে আঁকিয়েছে। আজ সেকথা স্বীকার করেছে সে, নিজের সঙ্গে সঙ্গেই ছবিখানা রাখে। যথেচ্ছভাবে ছবিটিকে চুম্বন করে সে। ছবিটি সে একান্ত গোপনে রেখেছে। সে বলেছে—একমাত্র তোমাকেই সে ছবি দেখাতে পারে রমিতাদি, আর কাউকে নয়। ওটা আমার জীবনের সম্বল। তুমি চলো আজই দেখাবো। রঙ চড়িয়ে যা দাঁড়িয়েছে, সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে চুপ করে থাকা যায় না। So lovely!

অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ অনুকূল, তাকে জোর করে দূরে সরিয়ে দেওয়া যেন খুবই শক্ত, অথচ অনুকূলকে মেনে নেওয়া আরও অসম্ভব। তবু কোথায় যেন আবেদন আছে অনুকূলের স্বভাবে, যাকে ঠেলে ফেলা যায় না।

রমিতার অবসর নেই। পরিচালক, লেখক, চিত্রকর, পরিবেশক এদের ভিড় কাটিয়ে কোথাও একান্তে যাওয়ার সময় কই—বিশেষ করে নিজের একটি ছবি দেখবার জন্য যাওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক। তার চেয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফাঁকা পথে বেড়াতে গেলে হাওয়া লেগে মাথাটা হাল্কা হয়। সেইজন্য আজ রমিতা দীপ্তেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল। ছবির বাজারের লোক নয় দীপ্তেন। নিছক রমিতার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই সে ষ্টুডিওতে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করছে।

আজ ওদের পরিচয়ের প্রথম দিন।

দীপ্তেনকে নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে হয় রমিতার। দীপ্তেন নিছক ভাবালুতার ফানুস। এই ধরণের ছেলেদের নিয়ে চলাফেরায় বিপদ আছে। এরা এতো অল্পেই বেশি আঘাত পায় যে, ভরসা করে দুটো কথা বলতেও সঙ্কোচ হয়। শিকারের অযোগ্য। এদের আঘাত দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না—অনুকম্পায় মনটা অস্বস্তিকর স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে। তবে, তরুণ কমনীয় কান্তির মাদকতা কে অস্বীকার করতে পারে! নিজের সংকল্প ত ভুলতে পারে না রমিতা! মিহিরলালের অত্যাচারের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। সমগ্র পুরুষ সমাজকে ও চিনেছে মিহিরের মধ্য দিয়ে।

দীপ্তেনকে নষ্ট করতে মায়া হয়—কিন্তু লোভটা তার চেয়ে ছোট নয়। মায়া দয়ার মূল্য বিচার করবার দায় এখানে নেই। হোক না নষ্ট। ওরা ত তাই চায়। রমিতা বিশ্বময় যে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়, তাতে কোনো মায়াদয়া থাকলে চলবে না।

রমিতার মন অন্য দিকে ফিরে তাকায়। ভবিষ্যত। একটা অন্ধকার ঘর, কোনো দরজা নেই, জানলা নেই—অন্ধকার। ও একলা।···একটা রহস্যময় বিভীষিকার আতঙ্কে ও যেন শিউরে উঠ্‌ল। নিজের অজ্ঞাতে চীৎকার করে উঠ্‌ল রমিতা। তারপর সংজ্ঞা হারিয়ে যায় তার। অন্ধকারের কোন্ নীচে পৃথিবীটা ডুবে গেল। ঝিম্‌ঝিম অনুভূতি—তারপর শূন্য। কিছু নেই।

পাশের ঘরে বৃদ্ধ পরিবর্ত্তন বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসল। তারপর আস্তে আস্তে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে নিল একবার। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসে মেয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। অস্ফুটস্বরে বল্‌লে বৃদ্ধ—Smelling salt!

পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ আপন মনেই বলে—না থাক। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যেটুকু থাকে মেয়েটা সেটাই ওর পরম লাভ। থাক! মরবে না, মরবেনা।

আস্তে আস্তে সে নিজের ঘরে ফিরে আসে। মেয়েকে এই অবস্থায় ফেলে

রেখে চুপ করে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। ঘুম নেই চোখে। নানান টুকরো চিন্তা, অতীতের অসংখ্য স্মৃতি থেকে এক একটি কথা সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

বৃদ্ধ পরিবর্ত্তন মজুমদার মেয়েকে চেনে ভালো করেই। অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছে, নিজের অঙ্ক ভুল হয়নি কখনও। না, ঠিক তা নয়—ভুল হয়েছে বই কি—একবার হয়েছে ভুল। সে ভুলই ত আজকে সারাটা জীবনের পটভূমিকে আচ্ছন্ন করেছে আগাছা আর কণ্টকলতায়। যত নির্ভুলের সমষ্টিকে খর্ব করে দিয়ে উদ্ধত সত্যের মত সেই একটি ভুলই মোচড় দিয়ে জীবনকে কঠিন বেষ্টনে জড়িয়ে ধরেছে।

রমিতাকে পরিবর্ত্তন মজুমদার গড়ে তুলতে চেয়েছিল অসামান্যা বিদুষী করে। মাতৃহারা মেয়েকে কোনোদিন সে বুঝতে দেয় নি কোনো অভাব। আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন, রমিতা কখনও টের পায়নি যে তারা বড়লোক নয়। পরিবর্ত্তন মজুমদার নিজেকে বঞ্চিত করে পয়সা বাঁচিয়ে মেয়ের বহুবিধ প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়েছে।

···তার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ে। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে রমিতা তীক্ষ্মস্বরে চীৎকার করে ওঠে—বার করে দাও, শীগ্‌গির তাড়িয়ে দাও ওকে। আমায় অপমান করেছে! অপমান? কই, গেলে না তুমি!

রমিতার কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে যায় আপনিই।

মেয়ের ঘরে ফিরে গিয়ে পরিবর্ত্তন বলে—সান্ত একটু ঘুমোও মা। ঘুমোও! কেউ ত নেই।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। মেয়েটির সারা দেহ নিংড়ে যেন ওই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। তারপর সে আস্তে আস্তে বলে—"মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে-জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে।" কিন্তু মানুষের সংস্কার কাকে বলে? বাবা তুমি একটু বসো, আমি বড় ক্লান্ত —কিছু বুঝতে পারছি না। জ্ঞান বড়, না, জীবন বল তো বাবা!'

পরিবর্ত্তন স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে—জীবন না থাকলে জ্ঞানের দেখা কোথায়

পেতে মা ? জীবনকে বাদ দিয়ে ত জ্ঞান নেই। তবে জ্ঞানহীন জীবনেরও কোনো মূল্য নেই।

—কোনো মূল্য নেই ? কে বিচার করবে ? তুমি কিছু জানো না বাবা, এ সব কথাই পণ্ডিতদের অহংকার। জ্ঞানের দরকার খুব সামান্য, দরকার শুধু রূপের, শুধু দেহের দাম দেয় মানুষ।

—সান্ত্বনা তুমি ঘুমোও এখন মা। একটু ঘুমো তুই। মানুষ যে দাম দিল তার চেয়ে বড় মূল্য আত্মমর্য্যাদা—সেটা নিজের কাছে পেতে হয় মা।

—আমার ঘুম আপনিই আসে। যেমন একদিন এসেছিল মিহির। শোনো বাবা, মিহির কিন্তু গোড়াতে খুব ভালোবেসে ছিল। সে তো তুমিও জানো। বাসে নি!

মেয়েকে নিরস্ত করবার কোনো উপায় খুজে পায় না পরিবর্ত্তন। এক একদিন এমন হয় যে, বকতে বকতে রমিতা পৃথিবীর ওপর ঘৃণায় বিরক্তিতে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে সংজ্ঞাহীন না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্গল বকে যায়।

রমিতা বলে—ওদের কি বলব বাবা। ওরা লোভী, ওরা ভিখারীর মত দোরে দোরে প্রেম ভিক্ষা করে বেড়ায়। এটা ওদের স্বভাব। এ স্বভাবকে প্রশ্রয় দেয় যেসব মেয়ে—তাদেরও কিছু বলব না। কিন্তু ওই সব ভিখারীদের আশ্রয় বলে ভুল করলে তার মরণ ঠেকাতে পারে না কেউ। শুধু আমি বলে নয়। তুমি দুঃখু কর না বাবা, মনে কর না যে তোমার ভুলেই সান্ত্বনার আজ এই অবস্থা হয়েছে। মোটেই তা নয় বাবা, পৃথিবীতে সবাই মিহিরলাল। হ্যাঁ বাবা—এই অভিজ্ঞতাকে জ্ঞান বলা যায় না ? এই জীবনের যথাসর্বস্ব বাজী ধরে যে অভিজ্ঞতা পেলাম তাকে জ্ঞান বলতে বাধা কি ?

পরিবর্ত্তন এবারে ধমকের সুরে বলে ওঠে—পাগলামী করতে হবে না, তুই ঘুমো এবারে।

—আচ্ছা, আচ্ছা ঘুমোবো। জামাইএর নিন্দে বুঝি সইতে পারছ না ?

—মেয়ের অপমৃত্যু দেখতে পারি—আর ? আচ্ছা বুড়ো ছেলেকে কাঁদিয়ে তুই কি সুখ পাস মা ? তুই যেন সত্যিই পাষাণী হয়ে গেছিস—নিজের রক্ত

পান করিস আর ছেলেকে আঘাত করিস। তার চেয়ে আমায় খুলিবে না, পাপ চুকে যাক।

—সে-বেশ হয়। কিন্তু তার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। হাতের মুঠোর মধ্যে মরণের বীজমন্ত্র রয়েছে আমার। কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হয়নি এখনও।

—কে কার কাজের বিচার করবে মা।

—বিচার করব কেন? সেটা ত কাপুরুষের কাজ। আজকের পৃথিবীতে বিশ্বাস, বিচার, ন্যায়—কিছু নেই। আছে স্বাধীনতা—যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা। পশুর মত প্রতিশোধ নিতে হবে পৃথিবীর কাছে। সমাজকে হত্যা করতে হবে। যে সমাজের আশ্রয়ে এইসব বাঁদর মাতব্বরী করে বেড়ায় তাদের নাচিয়ে, নাচ দেখে খুশি হয়ে তবে বাড়ি ফিরব।

—পরে যা হয় করিস মা। আমি বুড়ো মানুষ, তুই শুয়ে পড়লে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোতে পারি।

—তোমায় ছাড়ব না বাবা। স্নেহে, যত্নে লালন করার অপরাধ ত তোমারই। তুমি আমাকে বোকা বানিয়ে রেখেছিলে—তার ফল তোমায় পেতেই হবে। ঘুম আমার নেই? সেই সকালে উঠে শুরু হয়েছে বাঁদর নাচ দেখা, আর চলেছে এক নাগাড়ে রাত দুপুর পর্য্যন্ত। আমার ক্লান্তি আসে না বুঝি।

তারপর পরিবর্ত্তনের মুখের পানে তাকিয়ে অবজ্ঞাভরে বলে—যাও, আজ যাও। আমায় একটু ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও।

পরক্ষণে রমিতা আবার বলতে থাকে—'প্রকৃতিস্থ সমাজ অনেক পাপ সইতে পারে, কিন্তু যখন তার বিকৃতিটাই হয়ে ওঠে প্রধান, তখন চিন্তায়, ব্যবহারে, সাহিত্যে, শিল্পকলায় পশুরক্তস্রোত আত্মস্থ করে সমাজ বেশিদিন বাঁচতেই পারে না।' রবীন্দ্রনাথ ত ভুল বলেননি, বাবা! এ সমাজের মৃত্যু আসন্ন। এবার একে শেষ করে দাও। মিথ্যে এই জঞ্জাল বওয়ার দরকার কি? সমাজ যদি একটা প্রাণী হতো তবে বিষ খাইয়ে শেষ করা কতো সহজ হতো বলতো?

পরিবর্ত্তন কিছু বলে না। সে জানে এইসব কথার প্রতিবাদ করলে সারা রাত বসে বসে রমিতা বকবে। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে এল সে। মনে মনে ভাবনা, রমিতা যেন দিন দিন কোথায় চলে যাচ্ছে। রমিতার কি এক ধারণা হয়েছে—সমাজটা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। একে ভেঙে ফেলে দিতে হবে, তাহলে এর পর নূতন বাঁধুনীতে সমাজ গড়বে মানুষ। পরিবর্ত্তন অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে মেয়েকে কিন্তু তাতে ফল হয়নি কিছুই, উল্টে ধমক দিয়েছে রমিতা—তুমি কি বোঝ এসবের? একচক্ষু, তুমি কেবল মেয়েকে স্নেহের পাঁকে ডুবিয়ে দিতে জানো। যদি চোখ থাকত তবে দেখতে, কোথাও আশ্রয় নেই। তুমি সে সব বুঝবে না। যারা দেখতে পায় তারা নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। তারা জানে এরপর আর সময় পাওয়া যাবে না—এই বেলা চুরি করো, চুরি করো। পরের কাছ থেকে কেড়ে নাও। নিজের কাছ থেকেও চুরি করো, নিজেকে ঠকাও। মুখোশটায় রং চড়িয়ে দাও। চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করো।

পরিবর্ত্তন আর ভাবতে পারে না। তার মাথা ঝিম ঝিম করে। রমিতাকে অসামান্য করতে গিয়ে এ কী অঘটন ঘটালো সে! নিজের জীবনের নির্য্যাস দিয়ে এ কী বিষময় আতর প্রস্তুত হল! পরিবর্ত্তনের ইচ্ছে হয় এই মুহূর্ত্তে কোথাও পালাতে। এর আগেও পথে বেরিয়ে পড়েছে একাধিকবার। কিন্তু ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো রাস্তা সে খুঁজে পায় নি। রমিতাকে একলা ফেলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। মেয়েটা বড়ই একাকিনী।

পাশের ঘরে রমিতার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। পরিবর্ত্তন সেদিকে কান দিল না। আপনার চিন্তাস্রোত তার মনকে টেনে নিয়ে যায় কালপ্রবাহের বিপরীতে—উজানে। তার মনে পড়ে যায় একটি দিনের ছবি—একটি ফুটফুটে মেয়ে, চোখে মুখে তার ধারালো বুদ্ধির দীপ্তি, কয়েকশ' মেয়ের মধ্যে সহজেই সে আপনার স্বকীয়তায় ভাস্বর। সবাই তাকে চেনে, বিদ্যায়তনের সকলেই তাকে উৎসবের উদ্যোগে প্রাধান্য দিয়েছে। এক কথায় সে-ই উৎসবের প্রাণ। সেদিন এই মেয়েটির পিতা বলে পরিচিত

হয়ে পরিবর্ত্তন নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিল। মেয়েকে মানুষ করায় অপূর্ব্ব কুশলতার জন্য প্রশংসাও পেয়েছিল।···সেই কিশোরী কুমারী সান্ত্বনা আজ অভিনেত্রী রমিতা। সেদিনের গৌরব আজকের এই সুতীব্র বেদনায় কিছু প্রলেপের কাজ করছে বই কি! মাঝখানে সান্ত্বনার নীড়-রচনার কালটুকু যেন অবাস্তব হয়ে গেছে।

ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত পরিবর্ত্তন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পাশের ঘরে রমিতা তখনও বকছে আপন মনে—যারা জানে সমাজই মানুষের শ্রেয় তারা বোকা, তারা মানুষের বুদ্ধিকে স্বীকার করে না। আমাদের এই সমাজ থাকবে না—মরে যাবে, আজই এখনই মরুক। 'নিন্দা-প্রশংসার ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে, শাসনের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, আত্মরক্ষার উদ্দেশে সমাজ যে-ব্যবস্থা করে থাকে তাতে শ্রেয়োধর্ম্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজ রক্ষাই মুখ্য।'···

ভেগানিনের প্রক্রিয়ায় রমিতার শ্রান্ত দেহ নিস্তেজ হয়ে পড়তে বিশেষ দেরী হল না। তার ঘুমে অচেতন দেহের আলুলায়িত ভঙ্গি আলোর নীচে একাকী পড়ে রইল। এমনিই হয়—প্রত্যহ এমনি ভাবেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যখন রমিতা ঘুমিয়ে পড়ে তখন ওর চোখেমুখে, যে শান্ত কমনীয় মাধুর্য্য মূর্ত্ত হয়ে ওঠে তার সঙ্গে পৃথিবীর কারও পরিচয় নেই। এমন কি রমিতা নিজেও বহুদিন ধ'রে নিজের এই রূপটা দেখে নি। ও যে এত ভঙ্গুর, এত নমনীয় ওর স্নিগ্ধসৌন্দর্য্য, সেটা রমিতা হয়ত ভুলেই গেছে। ও শুধু দিবারাত্র জ্বলছে, জ্বালাচ্ছে ওর আশপাশে বাসনার বহ্নি—সেই আলোতে আপন দিশহারা স্বরূপটা বিভ্রান্ত করে তুলছে নিজেকেই।

হাসপাতালের লেবার ওয়ার্ডে নার্সেরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর একদিকে রোগিনীদের বিভিন্ন রকমের কাতরোক্তিতে বাতাস থমথমে। আবার এর মধ্যে কেউ কেউ অপরের সম্ভাবনা নিয়ে রসিকতা করতেও ছাড়ছে

না। পাশের ঘরটা নার্শারী। সেখান থেকে সদ্যোজাত শিশুদের মিলিত কান্নার কোলাহল ভেসে আসছে।

একটি প্রসূতি নার্সের আঁচল চেপে ধরেছে—কখন থেকে বলছি ছেলেটা কাঁদছে, ওকে আমার কাছে এনে দিন। আমার ছেলে কেন আমার কাছে থাকবে না? ওকে আমার পাশে এনে দিন।

নার্স হেসে বলে—আপনার ছেলে আপনারই আছে ভাই। আমরা কেড়ে নেবো না, সময় হলেই এনে দেবো। এখন আপনার শরীর খারাপ, নড়াচড়া করা একদম বারণ—আপনি শান্ত হয়ে ঘুমোন। কেউ নিয়ে পালাবে না আপনার খোকাকে।

মেয়েটি অসহিষ্ণুভাবে উঠে বস্‌তে চেষ্টা করে। নার্স তাকে জোর করে ধরে শুইয়ে দিয়ে বল্লে—এবারে কিন্তু ষ্টুডেন্টকে ডেকে বলে দেবো। ডাক্তারবাবু এসে খুব বকবেন। চুপ করে লক্ষ্মীটি হয়ে শুয়ে থাকুন আপনি।

এমন সময় একজন এসে খবর দিল—পরমেশ নন্দীকে ফোনে ডাকছে।

পরমেশ তাড়াতাড়ি বল্‌লে—কে? কোনো মেয়ে নয় ত সিষ্টার?

একজন নার্স অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অপরের পানে চেয়ে বল্‌লে—তা ছাড়া আর কে-ই বা আপনাকে ডাকতে যাবে, বলুন?

বেলা সাড়ে এগারটার সময় রমিতা কয়েকজন অতিথিকে বিদায় করে পরমেশকে তার কলেজে টেলিফোন করছে।

পরমেশ ফোন ধরেই বল্‌লে—আর ব'ল না মেয়েদের জুলুম সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে হাল্লাক হয়ে গেছি। কাল সন্ধ্যে থেকে 'লেবার ডিউটি'। সারারাত ঘুম নেই, আর তেমনি দুর্ভাবনা। একটি মেয়ে খুব সিরিয়াস অবস্থায় কাৎরাচ্ছিল। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত—ভোরের দিকে সেই মেয়েটির একটি কন্যা হয়েছে—আমরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

রমিতা বল্‌লে—আর এদিকে আমি ভেবেই সারা হলাম। বাড়িতে খবর করে শুন্‌লাম, কাল থেকে তুমি নিখোঁজ। তা হলে এক দিক দিয়ে পুষিয়ে নিচ্ছ, কি বলো। মিথ্যেই তোমার জন্যে ভাবা।

—থাক, অমন সৌভাগ্যে আমার দরকার নেই। আজ আরও সাত

আটটা কেন রয়েছে। এরপর আর নতুন কেউ না এলে বাঁচি। এক কালে যাবো পালিয়ে, তুমি থেকো। প্রতি নিয়ত চোখের সামনে মানবজীবনের সূত্রপাত নিরীক্ষণ করাটা খুব উপভোগ্য নয়।

—কিন্তু সারাদিন ত আমার বসে থাকবার উপায় নেই। তুমি একবার পারো তো সকাল সকাল ডাক্তার সরকারকে নিয়ে এসো। কাল তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথাই কইতে পারি নি। বাবার কাছে জন্নায় খুব চটেছেন তিনি!

—অত চটবারই বা কি আছে! অন্য কাউকে ডাকা যাবে না হয়।

—না, না, কাল আমারও একটু দোষ ছিল। তুমি ওঁকে একটু ব'লে ক'য়ে নিয়ে এসো।

—আচ্ছা তোমার মর্জি যা তাই হবে।

—তোমরা কখন আসছ?

—ঠিক বলতে পারছি না। আমার সঙ্গে যার ডিউটি আছে সে ছাত্রটি বারোটার সময় খেতে যাবে বলেছে। কোনো রকমে তাকে আটকাতে পারি ত' এখনই, যাচ্ছি নইলে সরকারকে ফোন করে দিচ্ছি। তুমি ওঁর সঙ্গে বেশ খোলাখুলি আলোচনা করতে পারো। উনি একটি নীরেট গন্ত।

—তার মানে?

—গন্ত মানে যা কাব্য নয়, যা সস্তা নয়,—যার কোনো অর্থ হয় না—যাকে খাঁটি বাংলায় বুর্জোয়া আদর্শবাদ বলে। আরে গন্ত নাহ'লে অমন খাশ বিলেতী মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিতে পারে কেউ? জান, ওর সঙ্গে ডরোথী বলে এক আর্লের মেয়ে পড়ত। ডরোথির বাবা আসাম কিংবা 'সি. পি.'র গভর্ণর-টভর্ণর ছিলেন। সরকারের ছায়ার মত ডরোথী ঘুরত। আজ হঠাৎ কলেজের একটা বার্ষিক উৎসবের ছবিতে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল—ডরোথী ঠিক সরকারের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে ছবিতে। এ নিয়ে তখন কলেজে সবাই আড়ালে খুব হাসাহাসি করত। কিন্তু সরকার খুব ভালো ছেলে, তেমনি গম্ভীর। এদিকে ডরোথীও খুব সভ্যভব্য মেয়ে কিনা—কাজেই সরাসরি কেউ কোনো কথা বলতে সাহস করত না। আশ্চর্য্য,

সরকারটা এমনিই ফসিল্ যে ডরোথীরা বিলেত ফিরে যাবার সময় ওকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে, তারপর দুদিন সরকারকে রেখে দিলে ওদের বাড়িতে—তবু, নাঃ। জানি না, ডরোথী ওকে কি ব'লে প্রণয় নিবেদন করেছিল। তবে—তবে যা-ই বলুক, সরকার বোধহয় মানুষ বলতে তার এ্যানাটমিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখেই ক্ষান্ত হয়। কী বলব তোমায় খাশ ইংরেজ মেয়ে ডরোথীর যেমন রঙ তেমনি স্বাস্থ্য—আর চোখ! তুমি যদি দেখ্তে তাকে তবে তুমিও ভুলতে পারতে না রমিতা।

—তাই নাকি? তোমার কথায় বুঝতে পারছি যে সেই মাধুরীর অভাবেই তুমি বাংলা দেশের পান্‌সে মেয়েদের প্রতি কৃপা করছ না। যাক, সেজন্য মোটেই দুঃখিত নই। ডরোথীর ছবি তোমার ডাক্তারী বই-এর আড়ালে লুকোনো নেই ত?

—আরে রামঃ ডাক্তারী বই হচ্ছে কঠোপনিষদের মত, সেখানে কোনো রোমান্স থাকলে হাড়গোর হয়ে যেতে বাধ্য—বরং মনে মনে কোনো বাঙালিনীকে ছবির মত ক'রে সাজিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। কেন, ডরোথির ছবির এত খোঁজ কেন? দেখতে চাও তো হাসপাতালে এসো, দেখিয়ে দেবো। ছাত্রী হিসেবে ডরোথী খুব নাম করা মেয়ে ছিল। এখন সে তাদের কাউণ্টীতে প্রাক্‌টিস্ করে। আর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা, আজও সে কুমারী।

—কেন, কৃষ্ণপ্রেম নাকি? শুনে শ্রদ্ধা হওয়া উচিত। কিন্তু হাসি পাচ্ছে যে!

—তোমার এই সিনিক মন্তব্যটুকু খুব উচ্চাঙ্গের হ'লেও সমর্থন করতে পারছি না।

—তা পারবে না, তুমি যে পুরুষ মানুষ। তোমাদের ফাঁকির গ্যাস দিয়ে বোঝাই করা মর্য্যাদার ফানুষে টোকা মারলেই ভয় পাও, ভাবো বুঝি চুপ্‌সে যাবে। ডরোথী কেমন মেয়ে জানি না—তবে সে যেমনই হোক, পুরুষকে শ্রদ্ধা করে, তার কাছে প্রেমের মর্য্যাদার আশা করে—এটাই যে তার মস্ত বড় ভুল। বড্ড বোকা—মেয়েরা যেমন হয় আর কি! আচ্ছা সে দেখা যাবে। তোমার ওই পরম ঋষি ডাক্তার সরকারকে আমি নিজেই বাজিয়ে দেখব'খন।

ডরোথীর ভুল ভাঙাবার সুযোগ খুঁজে বার করব-ই। কারণ এমন একটা সাচ্চা মেয়ে তা সে হোক না ইংরেজ কষ্ট পাবে কেন? ওর মিথ্যে স্বপ্ন ঘুচিয়ে দেবো। তুমি তাহলে আসছ কখন?

—ঠিক নেই। 'লেবার ওয়ার্ডে'র কাজে ফাঁকি দেওয়াটা ঠিক নয়। মেয়েদের কষ্ট দেওয়া কি উচিত? তুমিই বলো।

—আচ্ছা থাক। আমিই ডাক্তারকে ডেকে নেব। কিন্তু ডরোথীর ছবি দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে। নিছক কৌতূহলেই আমার কৌতূহলের অবসান, তার পিছনে কোন অভিসন্ধি খুঁজো না।

—না থাকলেই ভালো। আর নয় এবারে যাই, ওদিকে নার্সদের মহলে চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। কোন ডাক্তার এসে পড়বে হয়ত। আচ্ছা, দেখা করব এক সময়ে।

পরমেশ ব্যস্ত ভাবে রিসিভার নামিয়ে চলে গেল।

রমিতা রিসিভারটা নামিয়ে মিনিট দুই অপেক্ষা করে আবার টেলিফোন করল ডাঃ সরকারকে।

—ডাক্তার সরকার বড় ব্যস্ত আছেন। আপনার কি দরকার বলুন। বললে কম্পাউণ্ডার।

অধীর কণ্ঠে রমিতা বলল—তাঁকেই দরকার, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাই।

—তাহলে একটু ধরে থাকুন। হাতের পেসেন্টটা শেষ হলেই তাঁকে দিচ্ছি।

মিনিট তিনেক পরে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠের প্রশ্ন এসে পৌঁছলো রমিতার কানে—হ্যালো, ডাক্তার সরকার কথা বলছি। আপনি?

রমিতা নমস্কার সম্ভাষণ জানিয়ে বল্লে—আজ আপনি একটু আসুন না? কাল হঠাৎ চলে যেতে হয়েছিল বলে খুব লজ্জিত আছি।

—আই সী, আপনি পার্কিন্‌সন প্লেসের হয়ে···। হ্যাঁ, দেখুন, একটা কথা, অত টাকা কি দেওয়াতে আমার আপত্তি আছে। আরও ভেবে দেখছি, আপনার অসুখ তেমন কিছু নয়। ডাক্তারের চেয়ে প্রয়োজন একটা সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার—অর্থাৎ—

রমিতা বল্লে—দয়া করে একবারটি আজ আসুন। অত দূর থেকে রায় দেবেন না।

—কিন্তু আজ ত আমি খুব ব্যস্ত—মানে যাওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সময় নেই।

আহত কণ্ঠে রমিতা বললে—কই, কাল ত একবারও তা বলেন নি সে কথা! কাল আমার 'কেস' ভালো করে শোনবার আগেই ত চলে যেতে হল। অসুখ আমার আছে কি নেই, সেটা আপনি স্থির করবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আমার আনুপূর্বিক তথ্যটা জানুন।

—অল রাইট। যাবো আমি এক সময়।

—কখন আসবেন?

—সঠিক সময় দিতে পারছি না।

—কিন্তু আমার যে আরও অন্য কাজ রয়েছে! যদি আন্দাজ দেন একটা।

—তা হ'লে আজ নাহয় বাদ দিন। আপনার যেদিন কাজ নেই এমন একটা দিন বলুন।

গম্ভীর কণ্ঠের স্বরগ্রামে টেলিফোনের বৈদ্যুতিক তারগুলো গমগম করছে।

রমিতার সুগোল মধুর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হ'ল অপর প্রান্তে—আচ্ছা তবে কালই আসুন। কাল আপনার জন্য সব সময় বাড়ি থাকব।

—আচ্ছা তাই হবে। নমস্কার।

এম, ই, ভারবাণী লিমিটেডের অন্যতম কর্তা ছবিতে রমিতাকে নিয়োগ করবার জন্য চুক্তিপত্রাদি নিয়ে এসে হাজির হলেন বেলা সাড়ে বারোটার সময়। চাকর এসে পাখা খুলে দিয়ে গেল এবং ভিতর থেকে ঘুরে এসে জানাল যে, দেড়টার আগে দিদিমণির দেখা করবার ফুরসৎ হবে না। বেগতিক দেখে ভারবাণীর সঙ্গীটি এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে!

—দিদি! একবার অন্ততঃ মিনিট পাঁচেকের জন্য আসুন। নইলে আমার মানইজ্জত সব যাবে।—অনুকূল।

চাকর ফিরে এসে অনুকূলকে বললে—আপনি একবার ভিতরে আসুন।

পাশের ঘরেই রমিতা বসে অপেক্ষা করছিল। অনুকূল ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ভ্রূকুটি করে-তির্য্যকদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রমিতা বললে—এসব কী ছেলে-মানুষী শুরু করেছো তুমি। কতদিন বলেছি যে দুপুর বেলাতে কোন লোককে আনবে না। দেড়টার আগে আমি কাজে হাত দিই না—সেকথা জেনে শুনেও কেন নিয়ে আস? দেখা আমি করব না, তাকে বলে দাও, অসুখ করেছে।

অনুকূল বেশ বুঝতে পারে যে, রমিতা রীতিমত বিরক্ত হয়েছে। অথচ এতবড় একটা শাঁসালো লোককে হাতছাড়া করলে অনুকূলের বড় রকমের ক্ষতি হবে। সে ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে—যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি রাগ কর না দিদি। আমরা বাইরে অপেক্ষাই করছি। আর যদি অসুখের কথা বলি তাহলে ও যেরকম লোক এখনই বিধান রায়কে ডাকবে কিম্বা ডেনহাম হোয়াইটকে। অন্যায় যখন ক'রে ফেলেছি তখন দেড়টা পর্য্যন্ত একরকম করে কাটিয়ে দিচ্ছি।

এ কথায় রমিতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। বলে ওঠে সে—থাক, ঢের হয়েছে। পাশের ঘরে লোক বসে থাকবে হাঁ করে, আর আমি দেখা করব না—তার চেয়ে অস্বস্তিকর আর কি হতে পারে? তোমার মত পাকা শয়তানের আর জুড়ি মেলে না। এবারের মত দেখা করছি কিন্তু এরপর আর কখনও যদি এমন অসময়ে এস তবে চাকরকে বলে দেব সে দরজা খুল্‌বে না।

পাশের ঘরে ফিরে গিয়ে সগৌরবে অনুকূল ভারবাণীকে বল্‌লে—আরে মশাই, আমার কথা কি ঠেল্‌তে পারেন উনি!

ভারবাণী বাঁ চোখের কোণ কুঁচকে অর্থপূর্ণ ভঙ্গি করে বলে—সে আমি জানি মশাই। পেয়ারের কদর যে কত সে আর জানি না!

ভারবাণীর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা স্বরে বল্‌লে অনুকূল—আস্তে বলুন, শুন্‌তে পেলে সব মাটি। আরে ইনি খুব খানদানী বংশের, ভারী লেখাপড়া জানা জেনানা, ইজ্জতের ওপর খুব নজর বুঝলেন! একটু সমঝে কথা বল্‌বেন।

ভারবাণী তাচ্ছিল্যভরে বলে—আরে রাখ খো ইয়ার, কত্ত ভারী ভারী ফিরিঙ্গি বিবির সঙ্গে লেনদেন পার করে দিলায়, আমাকে আদব কায়দা দেখাইও না। কেৎনা রূপেয়া কিম্মৎ,—হাজার, দু'হাজার, দশ হাজার? আট্টামে পথর দিয়ে নাফা যা হইলো, তাতে লাখ কি ছাড়তে পারি একো আওরাত কে গদ্দিমে—হাঃ!

অনুকূল প্রমাদ গণল। ঠিক এই সময়ে যদি রমিতা ঘরে ঢুকে পড়ে ত সমূহ বিপদ। রমিতা যদি এই কথার একটুও শোনে অনুকূলের দুরবস্থার চূড়ান্ত হবে। এখন ভালোয় ভালোয় চুক্তিপত্রটা সম্পাদন করিয়ে দিতে পারলেই হাজারটি টাকা নগদ প্রাপ্তিযোগ। তাছাড়া আর একটি কারণে আরও হাজার তিনেক টাকা আসবার সম্ভাবনা আছে। এই দুঃসময়ে টাকা পাওয়ার যে কী দাম তা অনুকূল ছাড়া আর কে বুঝবে!

রমিতা এসে নমস্কার করতেই ভারবাণী উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে—নোমোস্কার।

রমিতা বল্লে—বসুন। আমি একটা কাজে বড় ব্যস্ত আছি। বেশি সময় দেওয়া ত সম্ভব হবে না আজ।

—না, না, সে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমাদের দরকার ত আছেই জরুর। ধরুন, ফিলিম লাইনে এলে আর আপনার সাথে দরকার কার না থাকবে। ও ত হচ্ছে দস্তর।

বলতে বলতে ভারবাণী বারকয়েক রমিতার আপাদমস্তক নিরী· । করলে, তারপর চুপ করে গেল।

অনুকূল এবারে জের টানে—একখানা নতুন বই তুলছেন উনি।

—আমার ত ঠিক এখনই হাতে অবসর নেই। আপনাদের কি নাগাদ কাজ শুরু হবে জানাবেন, তারপর ভেবে দেখব। অবিশ্যি আমার যখন এই পেশা তখন বুঝতেই পারছেন Contract করতে আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে সব দিক দেখেশুনে কথা দেবো। আজই ত আর শেষ কথা দেওয়া যাচ্ছে না।

—আচ্ছা বেশ ত আপনি বলুন কবে কাজ করলে আপনি পারবেন?

—সে এখুনি বলা মুস্কিল। পরে জানাবো। আপনারা কার বই তুলছেন? কি ধরনের Story?

ভারবাণী বিজ্ঞের হাসি হেসে বলে—সে একটা গল্প দেখে নিলেই হবে। ওর জন্যে কি আছে!

রমিতা গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়—না, না, তা হয় না। ছবির সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে গল্পের বাঁধুনীর ওপর।

—হাঁ, থোড়া তবে কি জানেন, বাজী হচ্ছেন আপনারা—হিরো আর হিরোইন। গানা আর প্লে ভাল হলে গল্পের ত থোড়াই দরকার হয়। আরে হামি ভি গল্প লিখে দিতে পারি।

রমিতা তীক্ষ্ণ হাসি হেসে জবাব দেয়—তাহলে বলতে হবে আপনি বড় আর্টিস্ট। লেখাটা তবে আপনারই হোক আর তার হিরো হয়ে আপনিই পর্দায় নামুন, খুব জমবে।

ভারবাণী খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে যায় যেন, তবু বলে—হাঁ, হাঁ, আপনি বিশ্বাস করেন—আমার এক দোস্ত ত এই কাজই করে। সে বাংলা লিপি শিখেছে, আর গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে থাকে বোম্বাই থেকে। এখানকার নতুন বাংলা বই কিনে পড়ে আর পরে পাঁচটা বই থেকে মিলিয়ে একটা গল্প দাঁড় করিয়ে করিয়ে ছবি তোলে। তাতে তার নামও হয়েছে, লেখককেও টাকা দিতে হয় নি।

রমিতা বললে—গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকতে তার খরচ খুব কম হয় না। এত কাণ্ড করে চুরি করার চেয়ে লেখকের পাওনা টাকা দিলে কিছু ক্ষতি হত না? যাক, সে সব কথা, গল্পটা একটু দেখে নিয়ে বলব আপনার ছবিতে নামতে পারব কি না।

এমন সময়ে সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল। রমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—মাপ করবেন, আমি ছুটি নিচ্ছি। আর ত আজ সময় হচ্ছে না। অন্য একদিন আসবেন, আগে থেকে খবর দিয়ে এলে ভালো হয়।

ভারবাণী অপ্রসন্ন মুখে কষ্টার্জিত হাসি টেনে বললে—আজ তবে নোমোস্কার, পরে খবর দিয়ে আসুব।

—সেই ভালো। নমস্কার।

রাস্তায় নেমে ভারবাণী অনুকূলকে বিরস ভাবেই বললে—তোমার কেমন পেয়ার বুঝি না। মোটেই ত কথা বলতে চায় না, ভারী গরম।

—তা হবে না? বি-এ পাশ করা মেয়ে। গান জানে। আর নাম-ডাক কেমন তা বলো!

—হ্যাঁ, ওর তো নাম ডাক খুব আছে। লেকিন, তোমার তস্‌বিরমে যেমন দেখেছি তার মতন ত সুরৎ লাগে না। আঃ হাঃ! মাইরী তস্‌বিরটা আজই বেচে দু'হাজার নিয়ে নাও নগদা।

—পাগল! তার চেয়ে আমায় কিনে নাও। জান থাকতে ও ছবি ছাড়তে পারি?

—আচ্ছা সাচমুচ্ কত টাকা নেবে? ঢাই হাজার, তিন হাজার—।

অনুকূল চুপ করে থাকে। তিন হাজার টাকার বিনিময়ে চিরদিনের মত রমিতার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে? অবশ্য টাকার জন্য এই মুহূর্তে তার যে কোনও কাজই করা অসম্ভব নয়। কিন্তু রমিতার সঙ্গে আলাপ থাকার যে বিপুল সুবিধা ও সুযোগ এরপর তা থেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হতে হবে। রমিতার বিরূপতা তার জীবনে যে কত বড় ক্ষতি তা অনুকূল জানে।

ভারবাণী বললে—বড় বেকায়দায় পেয়েছ অনুকূল বাবু। আচ্ছা লাও চার হাজার রূপেয়া। ছোড়ো ইয়ার—।

ভারবাণীর চোখে মুখে লালসার লোলুপতা ফুটে ওঠে সেটা অনুকূলের কাছে খুব বিশ্রী বোধ হয়। একদিন কোন নির্জন পাহাড়ের ছায়াচ্ছন্ন নিবিড় প্রাকৃতিক আবেষ্টনীকে চিরন্তন মানবমাধুর্য্যের সঙ্গে বেঁধে রাখবার জন্য যে শিল্পীর মন বেদানার্ত্ত হয়ে ছিল সে শিল্পী আজ আর অনুকূলের মধ্যে নেই। কিন্তু তবু যে মানুষ আজও অবশিষ্ট রয়েছে সেও চায় না ছবিটাকে ছেড়ে দিতে এমন একটি অমানুষের হাতে।

আজ কয়েক দিন যাবৎ মন্দাকিনীর বাড়াবাড়ি অসুখ চলেছে। ওষুধপত্র পথ্য ইত্যাদির জন্য টাকা চাই। আর কোন পথ নেই। বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে চলে না। মন্দাকিনীকে দেখবার ত কেউ নেই।

অনুকূলের ভরসা ছিল ওই মন্দাকিনীই। সে যখন বিছানায় পড়ল তখন নিরুপায় হয়েই অনুকূল বাড়িতে বাঁধা পড়ে গেল। সিনেমার রাজ্যে কেউ কারও আপন নয়। বউ-এর অসুখও পৃথিবীতে এমন কিছু অভাবনীয় ঘটনা নয়। এরকম গতানুগতিক দরকারের সময়ে কেউ অর্থ সাহায্য করবে না অনুকূল জানত। এমনিতেই তার আয়ের চেয়ে খরচ বেশি হয়, সেজন্য বাজারে কিছু কিছু ঋণ ও রয়েছে। তার উপর নূতন করে ধার দেবে কে! তাছাড়া কার কাছেই বা চাওয়া যায়—সবারই ত অন্নভক্ষ্য ধনুর্গুণ অবস্থা। যার কাছে হাত বাড়ালে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাকে বলতে অনুকূলের সঙ্কোচ হয়। সে জানে রমিতার কাছে চাইলেই টাকা পেতে পারে সে। কিন্তু কোথায় যেন মর্য্যাদায় বাধে তার। রমিতা হাজার হলেও মেয়ে। তার কাছে টাকা চাইতে মন সায় দেয় না।

সকালে বিছানায় বসে বসে অনেক চিন্তা করেও কোন হদিস মেলে নি। বিছানা ছেড়ে ওঠবার সময় প্রাত্যহিক নিয়মে ছবিখানার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে ছিল সে। সেই সময়ে একবার মনে হল, এখানা বেচে দিলে ত বেশ কিছু টাকা পাওয়া যায়! তারপর থেকে অনুকূলের মনে স্বস্তি নেই। ডাক্তারের বাড়ি যাবার নাম করে অনুকূল পথে বেরিয়ে পড়ে। তারপর ভারবাণীকে ফোন করে দিয়ে চায়ের দোকানে পরম নিশ্চিন্ত মনে চা-সিগারেট সহযোগে আড্ডা দিল বেলা দশটা পর্য্যন্ত।

ছবি দেখে ভারবাণী বলে বসলে—লাগাও ফিল্মি কোম্পানীর নয়া কেতাব। আভি চলো এ বিবিকে পাস। লে লেও দো চার হাজার, বাকী, কাম হাসিল করনা—কামাল করো ভাই।

অনুকূল ভেতে উঠল। মন্দাকিনীকে আজ ইন্‌জেক্‌সন দেবার তারিখ। সে কথা ভোলে নি অনুকূল। তবু ভাবলে, একটা দিন এদিক সেদিক করলে কী আর ক্ষতি হবে? হাতে তেমন পয়সা হলে তখন চাই কি বড় বড় ডাক্তারের হাট বসিয়ে দেবে সে বাড়িতে। আগে টাকাটা হাতে পাওয়া দরকার।

এই সব স্বপ্নের পর যখন এমন ভাবে রমিতার বাড়ি থেকে বিফল মনোরথ হয়ে পথে এসে দাঁড়াতে হল তখন অনুকূল মরীয়া হয়ে উঠল। টাকা তার

চাই-ই। তবে মাত্র চার হাজার টাকাতে 'আখের' খোয়ানো কোন কাজের কথা নয়। সে হেঁকে বসল্—আট হাজার দাও, ছবি নিয়ে যাও। ও ছবি আমার কলিজা। তোমার জন্তে রমিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছুটে যাবে। এ ছবি বেচেছি শুন্‌লে সে আমায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। নইলে তুমি আমার দোস্ত তোমায় মুফত্ দেওয়ার কথা।

—আরে কী আছে ছবিতে। এ ত হুরী পরী নয়, শ্রেফ্ শুকনো কাগজ আর রঙের তস্‌বির। তস্‌বির ত আওরাত নয় বাবা, যে গায়ে ছুঁয়ে আনন্দ হবে. না কথা কইবে, না ঘুরেফিরে বেড়াবে, না ওর চোখে ঝিলিক্ মারবে! তার জন্তে আট হাজার বিল্‌কুল লোকসান। তবে নজর ধরল তাই চার হাজার খুব. বেশি বলেছি, দিয়ে দাও। লেখাপড়া ক'রে দাও, এসব copyright-এর মামলায় কে যাবে বাবা!

—না, না জী ভারবাণী সে আমি পারব না। আট হাজারের এক পয়সা কমে হয় না। আমি ত ছবিটা মন থেকে বেচতে চাই না। টাকার খ্যাচ্—!

—এ ভারী জুলুম কা বাত্। চার হাজার কি কম হ'ল?

—*জুলুম টুলুম কিছু নয়, তুমি ত আর কাঁচা ছেলে নও বাবা! এমন 'মাইরী মার্কা' ছবি কোথায় পাবে?*

—মাইরী আর ঝামেলা কর না, যাও আর কিছু ধরে নাও। ছবির ত অভাব নেই—আরে ম্যান চার হাজারে মার্বেল ষ্টাচু মিলে যায়।

অনেক দর কষাকষির পরে সাড়ে ছ'হাজারে ছবিখানা বিক্রী করে দিল অম্লকূল। সে কোনদিন আশা করে নি এতটাকা এক সঙ্গে পেতে পারা যায় —আর কল্পনাও করে নি এই ছবি কোনোদিন নিজে হাতে বিক্রী করবার কথা।

রমিতার বাড়ি থেকে ভারবানীর গাড়িতেই সে বাড়ি এলো।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে মন্দাকিনী ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লে—ডাক্তার কি বল্‌লেন? ইন্‌জেক্‌সন!

সে কথার জবাব না দিয়ে সরাসরি নিজের ঘরে গিয়ে ছবিখানা হাতে তুলে নিয়ে শেষবারের মত নিরীক্ষণ করলে অম্লকূল। তার তন্ময় চুম্বনে ছবিটা

সিক্ত হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে ছবিখানা মুছে, কাগজে মুড়ে নিয়ে আবার সে বেরিয়ে গেল। এবারও মন্দাকিনী কি যেন বল্লে, কথাটা অনুকূল স্পষ্ট শুনতে পেল না।

রমিতা ডাক্তারের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করতে বলেছিল পরিবর্ত্তনকে।

জল খাবারের আয়োজন দেখে ডাক্তার সরকার বল্লে—রোগী দেখতে এসে আমাদের ত খাওয়ার নিয়ম নেই। তবে আপনি যদি একান্তই insist করেন তাহলে অল্প কিছু দিন। এত নয়।

—এত আর কি আছে বলুন।

—একটা মানুষের সারা দিনেরাতে ২৪০০ ক্যালোরি সারবান খাদ্য খাওয়া দরকার। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তার অর্দ্ধেকও পায় না, সেক্ষেত্রে আমি একাই যদি একবারে এত খাই তবে অপচয় হবে।

—*প্রতি পদে এত হিসেব করে চলার মধ্যে কি বাঁচা যায় ডাক্তার বাবু?* *রমিতা বল্লে।*

—জীবনের প্রতিটি স্পন্দন যেখানে অঙ্কের সূক্ষ্মতম হিসাবকে পালন করছে সেখানে আপনি বেহিসেবী চল্লেই ত ক্ষতি।

—আমার কাছে এই লোকসানটাই লাভ। বাঁচার মধ্যে যদি স্বাধীনতা না থাকে তবে বেঁচে আছি বুঝব কি করে?

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনার প্রতিদিনের ছোটবড় কাজের মধ্যে মনের যে প্রতিফলন সেটাই আত্মপরিচয়। বেঁচে আছি এটা অনুভব করার জন্য অনিয়মের প্রয়োজন হয় না।

—না ডাক্তারবাবু আপনার একথা আমার মানতে ইচ্ছে করে না।

—তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি যে অনিয়মকেই নিজের স্বভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। তার ফলে আপনার রচিত মনের গণ্ডিতে নিয়মিত ভাবে আপনি চলছেন। আপনি যদি উল্টো করে বই পড়া অভ্যাস করেন

তাহলে সেই অভ্যাসের দরুন আপনার কাছে সেটাই সোজা হয়ে দাঁড়াবে—আর অন্তে বলবে উল্টো।

—খুব জটিল ঠেকছে কথাটা।

—ঠিক এই রকম জটিল করেছেন আপনি নিজেকে, তার জন্ম আপনিই দায়ী।

—এ কথার অর্থ কী?

—আপনি রাগ করবেন না। আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের একটা বড় তত্ত্ব হচ্ছে মনঃসমীক্ষণ।

—এ কথা ত ফ্রয়েড, এলিসের কথা। সর্ববাদীসম্মত ভাবে তাদের এই এই তত্ত্ব ত স্বীকৃত হয় নি।

—না হবার ত কোনো কারণ দেখি না। এঁরা ত কেউ নতুন কথা বলেন নি, প্রাচীন হিক্রতে বা প্লেটোর লেখাতেও এসব কথা পাওয়া গেছে। তবে এঁরা সেই সব কথাই নতুন ভাবে বলেছেন, আমাদের চোখ ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। এঁরা নতুন করে না দেখালে আমরা সেই অন্ধকারেই থাকতাম। সে সব বাদ দিয়ে, আপনার ব্যক্তিগত কথাতে ফিরে আসা যাক। আপনার শারীরিক অসুস্থতা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু দীর্ঘকাল এরকম ভাবে শরীরের ওপর অত্যাচার করে গেলে মারাত্মক ব্যাধি হতে বিশেষ দেরিও হবে না। এমনিতেই রাত্রে ঘুম হয় না, ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে ওঠেন, বা দিনের বেলা খুব অস্বস্তি বোধ হওয়া, গা-হাত-পা জ্বালা করা—এসবেরই চিকিৎসা করা চলে। কিন্তু আপনি যদি বিবাহিত জীবনকে স্বীকার করেন তাহলে খুব সহজেই এর স্থায়ী মীমাংসা হয়।

রমিতা উচ্চস্বরে হেসে উঠল, তারপর হাসি একটু সাম্‌লে নিয়ে বললে—আবার বিয়ে?

—হ্যাঁ বিয়ে হওয়া আপনার দরকার। আপনি বলতে পারেন যে, বিবাহ না হলেও আপনার জীবনে অভিজ্ঞতার অভাব নেই। Excuse me, এসব কথা শুনে আমায় অভদ্র মনে করবেন না। তবু বিয়ের আলাদা প্রয়োজন এবং সার্থকতা আছে বইকি।

সুমিতা হেসে জবাব দেয়—না, অতটা ছেলেমানুষ নই। আপনি ঠিকই বল্‌ছেন, আমার জীবনে বহু পুরুষের স্পর্শচিহ্ন আছে। আমি তাতে কুণ্ঠিত নই বা—

—কিন্তু এটা সুস্থ মনের স্বাভাবিক পরিচয় নয়। পরিণত এবং পরিপূর্ণ যে মানুষ তার মনে স্থিতি এবং ধৃতিই সহজবাঞ্ছিত। আপনি এভাবে আর বেশিদিন চল্‌লে আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। একটা কথা কি জানেন, একজন অতি আধুনিক অষ্ট্রিয়ান ডাক্তার নাম তাঁর Schwarz, মনোবিজ্ঞানের গবেষনায় খুব নাম তাঁর, তিনি বল্‌ছেন 'To have indiscriminate sexual intercourse is to make the gesture of expressing emotional relationship when there is none to be expressed: a kind of sexual loquacity'. অর্থাৎ যাদের বাজে কথা বলাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় তারা কিছু বক্তব্য না থাকলেও বকে যায়—শুধু কথা বলাটাই তাদের কাছে আনন্দ। নিজের কণ্ঠস্বর শুন্‌তেই তারা ভালবাসে। সেটাই অভ্যাস—অভিলাষও বটে। আপনার কথা থেকে আমি অনুমান করি যৌনক্ষেত্রে আপনার আতিশয্য অসুস্থতা দিন দিন বাড়িয়ে দেবে। আপনাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি না,—সৎ অথবা অসৎ পথের কোনো ইসারা ইঙ্গিতও নয়। নিজের মানসিক বিকৃতি দিয়ে সমাজ জীবনের মধ্যে যে আধির সঞ্চার করছেন এটা ক্ষতিকর—আপনার পক্ষে ত বটেই অপরেরও বটে।

—আমি ত নূতন কিছু করছি না। যে সমাজ পঙ্গু, যে সমাজের অস্থিতে-মজ্জায় রোগ জড়িয়ে ধরেছে, সেই সমাজ যাতে তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে তারই চেষ্টা করছি। আমাকে যে সমাজ-ব্যবস্থা আজকের এই মানসিক অবস্থায় আসতে বাধ্য করেছে তাকে নষ্ট করব বই কি। এটা আমার ব্রত।

—আপনি কিছুতেই বল্‌তে পারেন না যে এ সমাজ মুমূর্ষু। আর আপনার একার চেষ্টায় কিছু এতবড় সমাজদেহই ভেঙে পড়বে না। তা ছাড়া, এই বিরাট সমাজদেহের মধ্যে আধিব্যাধি কিছু ত থাকতেই পারে। রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন—"যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেননা তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতেই আঘাত লাগে। জানার ভুলের চেয়ে হওয়ার ভুল কত সর্বনেশে তা বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই, বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করেছি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের বাহন হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।" এত বড় একটা কথা হয়ত আপনার ক্ষেত্রে খাটে না—তবে কি জানেন, আমার বিশ্বাস এই হওয়ার ভুলই আপনারও ভুল। আপনি যদি এই বক্র ব্রতচারিণী না হয়ে—

—অর্থাৎ সুবোধ বালিকার মত পুরুষের অবজ্ঞা অপমান লাঞ্ছনা হজম করে একটা পঙ্গু পোকার মত বেঁচে থাকতাম—কেমন! তা সম্ভব হয়নি। কারণ আমার বিবেক সেই অক্ষমতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়।

—কিন্তু এই ভাবে বিষ ছড়িয়ে আপনার কি লাভ?

—প্রতিশোধ নেওয়া। মরণাপন্নকে মরতে সাহায্য করা! আত্মপ্রতিষ্ঠাকে সপ্রমাণ করা।

—কিসের প্রতিশোধ।

—অন্যায়, অত্যাচার, অপমানের প্রতিশোধ।

—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আপনার কাছে এ কথা বলতে বাধা নেই, কারণ আপনি আমার চিকিৎসক। তবে একটা অনুরোধ, এসব শুনে আমার ওপর কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাবেন না, ওটা সস্তার খেলো প্রবঞ্চনা। শুনুন মন দিয়ে, আমার গোটা জীবন ধরে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে। আমার স্বামী যখন বিয়ে করেছিলেন তখন আমি এমন ছিলাম না। তিনি আমার প্রেমে পাগল হয়েই প্রণয়লীলার চরম আবেদন স্বাক্ষর করে ছিলেন। নইলে আমার অভাব ছিল না কিছুই, রূপের সাক্ষ্য ত এখনও রয়েছেই, গুণ ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। বাবা আমায় সঙ্গীতে নৃত্যে উর্বশী করতে চেয়েছিলেন। আর আমি নিজেকে সাহিত্যে—।

ডাক্তার সরকার ভ্রূকুঞ্চিত করে পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরাল তারপর বললে—আপনি তাহলে বিবাহিতা? আপনার স্বামীর নাম কি?

—তারপরই প্রশ্ন করবেন, তাঁর পেশা কি, নিবাস কোথায়, এই ত? এসব মামুলী সওয়াল-জবাব কেন? আপনারা পুরুষমানুষেরা ব্যবহারে শোভনতার সাধারণ রীতিটুকুও মেনে চলেন না কেন বলুন ত! এই যে আপনি এমন একটা কড়া তামাকের ধোঁয়া ছাড়ছেন নাকের কাছে যে এখানে বসে থাকতেও অত্যন্ত অসুবিধে হচ্ছে আমার।

—না, অবিশ্যি আপনার আপত্তি থাকলে বলতে অনুরোধ করব না।

ডাক্তার চুরুটটা নিভোবার চেষ্টায় রত হয়।

রমিতা বাঁকা হাসি হেসে বলে—আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, তাকে আমি অস্বীকার করেছি। তার নাম মিহিরলাল চক্রবর্ত্তী।

রমিতার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডাক্তার বলে—মিহিরলাল চক্রবর্ত্তী, তাই নাকি!

—কেন? আপনি চেনেন তাকে? সেই কুখ্যাত ব্যক্তিটাকে!

—হ্যাঁ, জানি। কিন্তু মিহির ত ভালো ছেলেই ছিল!

—আপনার সঙ্গে সেই ভালো ছেলেটির পরিচয় কত দিনের!

ডাক্তার সরকার বিস্ময়াবিষ্টের মত বলে—তাকে চিনি ছেলেবেলা থেকে। ইদানীং তার খুব পয়সা কড়ি হয়েছে সে খবরও লোক মারফৎ জানি। তার বিয়ের সময় ত আমি উপস্থিত ছিলাম।

রমিতা আবেগবিচলিত কণ্ঠে বললে—কিন্তু আপনি আমার কথায় চুরুটটা নিভিয়ে ফেললেন কেন? আমার মাথা ধরা রোগ এমনিই আছে, মাঝখান থেকে—। না, না, ওটা একটু কষ্ট ক'রে ধরিয়ে নিন। আমার গল্প ফুরোতে সময় লাগবে। আর আপনার চিন্তার অবলম্বন হিসেবে ওই কড়া ধোঁয়াটা বোধ হয় খুব দরকার।

সরকার হেসে বললে—না, থাক। সহবৎ শিক্ষারও প্রয়োজন আছে বই কি! তাহলে আপনি মিহিরের স্ত্রী। কিন্তু কি হলো ব্যাপারটা?

দীর্ঘদিনের পরিচয়ে মিহিরের আন্তরিকতাই দেখেছি, কখনও ত' দুর্ব্যবহারের কথা শুনিনি। বেশ মনে পড়ছে বন্ধুমহলে খুব চাঞ্চল্য হয়েছিল মিহিরের অপূর্ব রূপসী স্ত্রীকে কেন্দ্র ক'রে। আমার অবশ্য একদিনই আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল—তারপর অনেক বার মিহিরকে বলেছি বটে, বাড়ি গিয়ে তার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করে আসব কিন্তু হয়ে ওঠে নি। তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে সেও ত হ'ল প্রায় বছর চারেকের ব্যাপার! আর যুদ্ধের সময়ে মিহির ত মস্ত একটা কী জানি হয়ে গেল—মিলিটারী কন্‌ট্রাক্টর ইত্যাদি! সেসব খেয়াল করি নি—মানে আমার আবার সামাজিকতার বোধটাই কম—সে ত দেখতেই পাচ্ছেন।

রমিতার বুকের মধ্যে কী একটা বেদনা যেন গুমরে ওঠে। তবুও জোর করে হেসে বলে—মিহিরের স্ত্রী ছিলাম যে আমি সেই 'আমি'-র নাম ছিল সান্ত্বনা। জানেন ত, আমাদের বিয়েটা হয়েছিল রেজেষ্ট্রী করে। কারণ ওরা চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ আর আমরা বৈশ্য। আমার বাবার এ বিয়েতে মোটেই সায় ছিল না। কিন্তু আমি যখন জোর করে বললাম তখন তিনি বলেছিলেন—তুই যদি সুখী হ'স তাতে বাধা দেবো কি করে!

—তারপর?

—তারপর আর কি! তার আগেই ত অনেক কিছু হয়ে গেছে। তখনও পর্য্যন্ত আমি বোকা ছিলাম। শুকনো আদরে গলে গিয়ে নিজের যা কিছু ছিল উজাড় করে দিলাম। ফুলশয্যা আমাদের হয় নি; দু'জনেই আমরা চিরাচরিত নিয়মের বাইরে নিজেদের জগৎ সৃষ্টি করব ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম। মনের রঙমহলে তখন স্বপ্নের ফুল মৌ মৌ করত। সেই রঙীন স্বপ্নের নেশায় গেয়েছিলাম, 'আমরা দু'জনা স্বর্গখেলনা রচিব না ধরণীতে'। কিন্তু সেই কথা যে আজ বাস্তবে এমন দুঃসহ পরিহাসের রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে সেকথা কে কল্পনা করেছিল! কাজেই সেদিন না ছিল কোনো ফুলের প্রয়োজন, শয্যারও কোনো আয়োজন ছিল না। আমরা সারারাত জেগে বসেছিলাম ছাদের ওপর। আরও অনেক অনেক উষায় আমাদের কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়নি। সেদিন সে আমায় ভালোবেসেছিল। কিন্তু আমার সব কিছু

দিয়েও যে তার মন ভরল না। তারপর সে আরও চাইল—শুধু আমার কাছে নয় অন্য অনেক মেয়ের কাছে।

রমিতার চোখেমুখে কি এক আচ্ছন্নতা ঘিরেছে যেন। ও আপন মনেই বলে—আমায় সে চাইলে সরকারী রাজপথের মত যেমন-তেমন ভাবে ব্যবহার করতে। আপনি তার বন্ধু, আপনার দেখা পেয়েছি বলে যে মস্ত কিছু লাভ হয়েছে আমার তা নয়। আমার অভিযোগ, অনুযোগ, অনুনয় সব শেষ হয়ে গিয়েছে তার কাছেই। ক্রমশঃ বুঝলাম, সে আমায় বিয়ে করে মহাবিপদে পড়ল। অর্থাৎ সংসারে তার আর কোন আশ্রয় রইল না। ওদের বাড়ির কেউ আমাদের বিয়েকে সমর্থন করল না। অতএব কলকাতার কাছেই একখানা ঘরে আমাদের বাসা হল। সেই আমাদের পৃথিবীর সর্বস্ব। সাধ ছিল ছোট্ট সংসারটা গুছিয়ে গড়ে তুলি। নিজের খুশিমত ঘরকন্না সাজাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম সংসারটা শুধুই প্রণয়ের হাওয়ায় চলে না। উনি দিনরাত বই মুখে করে বসে থাকেন আর মাঝে মাঝে হাহুতাশ করে বলেন, 'তাই ত কি উপায় সান্থু!' প্রথম প্রথম আমি মিষ্টি করেই বলতাম, 'উপায় একটা কিছু হবেই। অত ভেবো না?'…তার ফলে মিহির ভাবনা-চিন্তাও ছেড়ে দিয়ে স্রেফ বিদ্যার্জন করতে ব্যস্ত রইল।… এরকম নিশ্চিন্ত মানুষকে খোঁচানো ছাড়া উপায়ই বা কি। অবশেষে আমিই আবার বলি—'হাতপা একেবারে গুটিয়ে বসে থাকলে যে উপোস করে শুকিয়ে মরতে হবে!' নড়েচড়ে বসে বল্লে—'হ্যাঁ, ভেবে দেখি কি করা যায়।'…কিন্তু ভাবনার সময়টা বেশ বেড়ে চলে, অগত্যা একদিন গায়ের গহনাগুলো খুলে দিয়ে বল্লাম—'ঢের হয়েছে। ভাবনার দৌড় দেখে মনে হচ্ছে এর আর শেষ নেই। তার চেয়ে এইগুলো দিয়ে যদি কিছু করতে পারো ছাখো।' পুরুষ মানুষ, পৌরুষ থাকা উচিত, তাই একবার কুণ্ঠিত ভাবে বল্ল—'তোমার গায়ের সোনা নিয়ে উপজীবিকার ব্যবস্থা? না, না, থাক।' ধমক দিয়ে বলি 'থাক, খুব খাতির পেয়েছি। কিন্তু আর তাতে পেট ভরছে না। এগুলো বেচে একটা কিছু পত্তন করো, সুদিন এলে

আবার না হয় আসলের ওপর চড়া হারে সুদ ধরে দিও।' মিহিরলাল ত কারবারী হল। বল্লে—'কিন্তু এসব আমার লাইন নয়, শুধু তোমার মুখ-চেয়ে এইসব ছোট কাজে নামতে হচ্ছে।' সেই সময়ে বোধহয় আমার ওপর তার একটু তাচ্ছিল্যও এসেছিল। আত্মীয় স্বজন এবং বাড়ি ঘর থেকে এভাবে ছেঁটে দেওয়ার জন্মেও বটে, আবার আরামের আশ্রয়ের বদলে খেটেখুটে পয়সার ধান্দায় ফিরতে হচ্ছে বলেও বটে—তার মেজাজটা কেমন রুক্ষ হয়ে উঠল। যেন সবটাই আমার অপরাধ! আমারও মনে একটা নিজের সম্বন্ধে সংশয় হত। মনে হত আমায় বিয়ে করেই মিহিরের দুরবস্থার শেষ নেই। আমি সব দিয়ে তাকে খুশি করবার জন্মে ব্যস্ত হয়ে থাকতাম। ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আমি আর কিছুই গ্রাহ্য করি নি সে সময়ে। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হল না। অবিশ্যি এও হ'তে পারে যে খুব বেশি আদর যত্নের ফলেই বেশি ক'রে অবজ্ঞা করতে শুরু করল। ওর মন তখন কোথায় থাকত বুঝি নি। নিত্যদিন যা নয় তাই বলে মেজাজ দেখাত আর যাখুশি তাই করত। তবু সয়ে গেছি সব। অনেক দুঃখ কষ্ট হজম করেছি মুখ বুজে। ইভ্যাকুয়েশনের সময় সবাই যখন কলকাতা ছেড়ে পালালো, তখন আমি শুধু ওরই জন্মে রইলাম কলকাতায়। চারিদিকের খালি বাড়িগুলো যেন গিল্‌তে আসত। গ্রাহ্য করতাম না কিছুই। উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত মন, কি জানি কখন কি হবে—ও কেন বাড়ি ফিরতে দেরি করছে, কেবল সেটাই আমার ভাবনা। এমনিভাবে রাত্রি এগারোটা, বারোটা বাজত —বাইরে ব্ল্যাক আউট, আমি বাড়িতে একা। সেই সময়ে কিনা একদিন ও এনে হাজির করল ওর সব মিলিটারী মক্কেলদের। তারা কেউ পাঞ্জাবী, কেউ বা ট্যাশ, কেউ গুজরাটী। আমায় হুকুম করলে 'এঁদের সব রীতি-মত খাতির করতে হবে।' কারণ এঁরা সবাই মিলিটারী কনট্রাক্টের মাতব্বর, এঁদের তোয়াজ করতে পারলে কলকাতায় বাড়ি-গাড়ীর ভাবনা থাকবে না।

রমিতার কথায় ছেদ পড়ল। টেলিফোনের রিসিভারটা বেজে উঠল। রমিতা উঠে গিয়ে সেটা নামিয়ে রেখে এলো টেবিলের ওপর। আপন মনেই

বললে—সব সময়েই লোকের দরকার! পারব না সাড়া দিতে। থাক পড়ে ওটা।

ডাক্তার সরকার বলল—ও-ভাবে ফোনটাকে জব্দ করলেন কেন?

প্রভঞ্জনের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিতা জবাব দিল—দিনরাত কেবলই কথার জাল বুনতে পারি না আর। আপনার সঙ্গে কথা কইছি, এটা আমার প্রয়োজন। আচ্ছা, আপনাকে আট্‌কে রাখছি না ত কাজের ক্ষতি করিয়ে।

হঠাৎ রমিতা যেন সচেতন হয়ে উঠল।

প্রভঞ্জন ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—কাজ অনেক আছে। কিন্তু আপনার কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শোনাও ত দরকার। আচ্ছা তার আগে যদি আমি গোটা দু'য়েক ফোন সেরে নিই।

রমিতা ব্যস্ত হয়ে বলে—না, না, এখন আর আট্‌কে রাখব না, আপনি বরং কাজ সেরে আসুন। আবার কখন আসবেন বলে যান, আমি থাকব সেই সময়ে। আমার জন্যে কাজের ক্ষতি করবেন আপনি ডাক্তার হয়ে এটা ঠিক নয়।

প্রভঞ্জন টেলিফোনের কাছাকাছি গিয়ে অবিচল কণ্ঠে জবাব দিলে—আপনি ব্যস্ত হবেন না। একটা কেস্ শেষ না করে চলে যাওয়া উচিত নয়। আপনার এ কথাগুলো মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তা ছাড়া তেমন মরণাপন্ন কেউ আপাততঃ হাতে নেই।

প্রভঞ্জন টেলিফোন করছে রমিতার দিকে পেছন ফিরে।

রমিতা নীরবে বসে আছে। ওর চোখের সাম্‌নে দূরগত অতীতের এক-একটি দিনের ছবি ভেসে ওঠে।...সেই দিনটিই সান্ত্বনার জীবনের চরম পরীক্ষার দিন। মিহির উন্মত্ত অবস্থায় গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরল। সঙ্গে তার খাকী পোষাক পরা দুটি লোক আর একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাজ পরা মেয়ে। জড়িত কণ্ঠ, ট্যাক্সি থামার শব্দ সব জড়িয়ে রমিতা বুঝতে পেরেছিল মিহির ফিরেছে। দরজা খুলে দিয়ে সান্ত্বনা বিস্ময়ে নিশ্চল গতিতে দাঁড়িয়ে থাকে। মিহির তার রক্তবর্ণ চোখদুটির ঘোরালো চাহনী ওর মুখের ওপর

ক্ষণকালের জন্য নিবদ্ধ করে বলে—'হাঁ করে কি দেখছ!'…সান্ত্বনা পথ আগলে রেখেই জবাব দিয়েছিল—'এরা সব কারা?'…মিহির হেসে উত্তর দেয়—'Let me introduce all of you to my darling Mrs. Chakravroty. And Santana, here is our queen of hearts Catherine', …এই পর্যন্ত শুনেই সান্ত্বনা ওদের পথ ছেড়ে দিয়ে ভেতরে চলে এসেছিল। তারপর ঘরে ঢুকে মিহির ওর হাত চেপে ধরল—'তুমি ওভাবে চলে এলে, আমায় অপমান করে?'…শুরু হল তাণ্ডব প্রলয়। সান্ত্বনা পাথরের মত নীরব, নিরুত্তর। মিহির আরও গলা চড়িয়ে বলে—'আমায় অপমান করলে তুমি! Unpardonable impertinence!'… সেকথারও জবাব না পেয়ে মিহির টলতে টলতে এগিয়ে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে চীৎকার করে বললে—'Let me be frank. I am not going to tolerate your sort of bitch.'…সান্ত্বনা দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল—'Brute!'…তারপর, মিহির ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানী দিয়ে বলে—'You must behave! you—you! r…r'…সান্ত্বনা আর সহ্য করতে পারে নি, ডুকরে কেঁদে মিহিরের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলেছিল —'ওগো আমায় মেরে ফ্যালো। তুমি এসব কি যা-তা কাণ্ড সুরু করেছো। আগে আমায় মরতে দাও, তারপর রাস্তার নর্দমায় গড়াগড়ি দিও। ভদ্রলোকের বাড়িতে এসব কী কাণ্ড!'…মিহির সরে দাঁড়িয়ে হেসে উঠল—'ভদ্রলোক! Yes! What of that? I must have my own way. কোনো ভদ্রলোক উপোস করে মরলে আর একটি ভদ্রলোক কি তার হাঁড়িতে চাল জোগাতে আসবে? একদিন যখন একটি ভদ্রলোক আর একটি ভদ্র মেয়েকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বিবাহে স্বীকার করল তখন তোমার পৃথিবীর তাবৎ ভদ্রসমাজ কেন তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বলতে পারো! তারপর তারা দু'জনে যখন শুকিয়ে মরছিল ভদ্রজীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তখন কোনো ভদ্রলোক খবর নিতে এসেছিল কি! Enough of this ভদ্র nonsense! বুঝে নিয়েছি lifeকে। ওসব সমাজব্যবস্থা বিলকুল বরবাদ। Here is my own self. Damn it.

হয় আমার সঙ্গে তালে তালে চলো or you leave me free. Just *now, you must come out to take my friends in friendly way.* *চলো এখন ওদের সঙ্গে গল্প করবে। আমার কথা শুনতেই হবে তোমাকে। সামান্য ভদ্রতার বিনিময়ে বিপুল অর্থসম্পদ অপেক্ষা করছে!* জানো, a margin of twenty thousand chips. বর্ত্তমান পৃথিবীর চেহারাটা দেখ্‌তে পাচ্ছ? This voluptuous world, and you with your inviting youth—বিশ হাজার টাকা—হাতের কাছে লাফাচ্ছে।'…তারপর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে এসেছিল মিহিরের সে বলেছিল,—'সান্থু, পাঁকেই পদ্মফুল ফোটে—পদ্মের জীবনে পাঁকটা অপরিহার্য্য। একদিন আমরা নিজেদের মনের পরিচ্ছন্নতা দিয়ে এসব পাঁক মুছে ফেলে সুন্দর জীবনটাই হাতে পাবো। আজকের এ মনের কষ্ট তখনকার সুখের দিনে মনে করতে কত ভালো লাগবে! এটা বোঝো না কেন?'

সান্ত্বনা বলেছিল—'কিন্তু পাঁকটাকেই যে পদ্ম বলে ভুল করছ তুমি।'

মিহির অধীরভাবে তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—'সান্ত্বনা! একদিন যে তোমাকে জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করে সমাজ-সংসার, অতীত-ভবিষ্যৎ, আশা-স্বপ্ন সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে সহজে চলে এলো তাকেই তুমি সন্দেহ করছ, তাকে তুমি অবিশ্বাস করছ? আমি কি তোমায় ভালোবাসি না? শোনো, আজ ছেলেমানুষীর সময় নয়। আমি ত এদের সঙ্গে ফূর্ত্তি করবার জন্যে বাড়িতে ডাকিনি। কাজের খাতিরে অনেক সইতে হয়। এই যে নোংরা কাজ, সে-ও তোমারই জন্যে। তোমার জন্যে টাকা আনব! এতে তুমিও যদি অসহযোগ করো তবে আমার আশা কোথায়, কি আশ্বাস?

তারপর সান্ত্বনা সেই অপরিচিত অতিথিদের মহলে গিয়েছিল। মিহিরকে ষোলো আনা বিশ্বাস করেই সে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরের দৃশ্য ভয়াবহ! মিহির খুশি হয়ে সেই সর্বজাতীয় অপরিচিতদের সামনে সান্ত্বনাকে জড়িয়ে ধরল—সান্ত্বনার রুচিতে আঘাত লেগেছিল কিন্তু তখনও সান্ত্বনা কিছু বলেনি। তারপর গ্লাস আর বোতলের শব্দ, ছিপি খোলার আওয়াজ…। কেমন একটা আচ্ছন্নতার ঘোর লেগেছিল সেই গভীর রাত্রে। সান্ত্বনা দেখল মিহির সেই

কিন্নরী মেয়েটার কোমর ধরে নাচছে। তখন মৌতমা কেমন পাগল হয়ে গেল। পরক্ষণে আরও প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কা—পাঞ্জাবীটি একগাল দাড়ি নিয়ে সান্ত্বনার দিকে ভিজে ভিজে চোখে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে…। সেই লোমশ কঠিন হাত দুটো সাঁড়াশীর মত বজ্রবন্ধনে রমিতাকে যেন আবদ্ধ করেছে।…

রমিতার চোখের সামনে সব কিছুই ঝাপসা হয়ে আসে। ডাক্তার সরকারের স্যুটপরা লম্বা চেহারাটা ক্রমশঃ আরও লম্বা দেখায় যেন। কতকগুলি ছায়ামূর্ত্তির মত ধোঁয়াটে কুয়াশায় সামনের দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

টেলিফোন করতে করতে ডাক্তার সরকার একটা আর্ত্ত চীৎকারের শব্দে চমকে ফিরে চেয়ে দেখল রমিতা কৌচের ওপর কাৎ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। ক্ষিপ্রপদে ডাক্তার এগিয়ে এল, তারপর আস্তে আস্তে রমিতার দেহটা কৌচের ওপর লম্বাভাবে শুইয়ে দিল। আপনার অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে—হুঁ! Brain Congestion.

পরিবর্ত্তন মজুমদার এসে দাঁড়াল ডাক্তারের পাশে। ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল—চলুন, বাইরে যাই।

পরিবর্ত্তন অবাক হয়ে বল্‌লে—সান্ত্বকে এই অবস্থায় রেখে?

—হ্যাঁ। এখন ওষুধ দিয়ে জাগালে ফল খুব ভালো হবে না।

বাইরে এসে পরিবর্ত্তন অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল—ডাক্তারবাবু, ওকে কি বাঁচানো সম্ভব? এ রকম উন্মাদ পাগল আর দেখেছেন কখনও ভালো হতে?

ডাক্তার সরকার বল্‌ল—পাগল আপনি কাকে বল্‌ছেন, পাগল মোটেই নয়। একটা বড় রকমের shock থেকে এসব হওয়া খুব স্বাভাবিক।

—পাগল নয় ত কি? আমার অমন মেয়ের যে এই অবস্থা হবে তা কে জান্‌ত। সান্ত্বনাকে যদি আগে দেখতেন তাহলে আপনি বুঝতেন। —কি বলব সবই আমার কৃতকর্ম্মের পরিণাম। যদি আমি শক্ত হয়ে বাধা দিতাম মেয়ের খামখেয়ালকে তবে এ শাস্তি পেতে হত না আজ।

প্রঞ্জন বল্‌ল—দিনরাত nerve-এর ওপর অত্যাচার হয়ে হয়ে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এখন ওঁর দরকার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আর চাই হাল্কা আনন্দের খোরাক। যাতে করে উনি—নিজেকে ভুলে থাকতে পারেন এমন একটা healthy আনন্দ। আচ্ছা আপনি মিহিরের খবর কিছু জানেন?

হঠাৎ যেন পরিবর্ত্তনের সামনে বজ্রপাত হল—আতঙ্কে তার চেহারা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল।

প্রঞ্জন আবার বল্‌ল—আমি জানি না, How far it is possible, তবে যদি এঁকে নিশ্চিন্ত সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সব complex কেটে যাবে।

পরিবর্ত্তন প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়—না, না, সে অসম্ভব। That brute! জানেন সে আমার মেয়েকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সে সান্ত্বনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেছে শেষ কালে। নিজের বাড়িকে যে উর্বশীর উল্লাসক্ষেত্র বানাতে চায় তাকে নিয়ে ঘর করা? আপনি জানেন না, আর আপনাকে বলা উচিতও নয়—তবে আপনি ডাক্তার কাজেই বল্‌ছি—সান্ত্বনাকে মিহির টাকা রোজগারের নজর হিসেবে ব্যবহার করতেও ছাড়েনি।···অবিশ্যি এসব কথা সান্ত্বনা আমায় স্বেচ্ছায় বলে নি। রাত্রে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে, বলে—দূর করে দাও। এই সব খাকী পোষাকপরা বাঁদরদের চলে যেতে বলো।···কিন্তু কি জানেন ডাক্তারবাবু মানুষের মন তো!

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে পরিবর্ত্তন উৎকর্ণ হয়ে কি শুন্‌তে শুন্‌তে বল্‌ল—আসুন এবারে ঘরে, সান্ত্বনা কথা বলছে, শুন্‌তে পাচ্ছেন!

রমিতা চোখ বুজে রয়েছে। ওর কপালে ছোট ছোট মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। শুভ্র ললাটপ্রান্তে সবুজ শিরার রেখা সুপরিস্ফুট। রমিতা স্তিমিত কণ্ঠে বল্‌ছে—তুমি, তুমিই শেষে আমায় এত নীচে নামিয়ে দিলে! এ নোংরামীর দাম টাকা দিয়ে শোধ করে নেবো আমি! টাকার এত মর্য্যাদা! এ বিশ্বাস কোথা থেকে হ'ল মিহির। যৌবনের বিনিময়ে যদি টাকাই আদায় করতে হয় তবে সান্ত্বনার মৃত্যু হোক। আজ থেকে

সেই চরম দাম আদায় করব। তবে সে বাজারে তোমার দালালীর অপেক্ষা রাখব না। পৃথিবীর মানুষ আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করো। আজ থেকে মানুষ আর নই আমরা—না তুমি মিহিরলাল, না আমি। সান্ত্বনার *মৃত্যু হলো—কিন্তু তার বিদেশীলাঞ্ছিত দেহ দিয়ে সে পৃথিবীর পুরুষজাতির যতটা পারবে ক্ষতি করবে তবেই শান্তি হবে এই প্রেতাত্মার। যাও, যাও মিহির তোমাকে আর কিছু বলব না, তুমি তার যোগ্য নও। খেলনা—ছোট খেলনা, ঠুনকো মাটির সেপাই মিহিরলাল এই সর্বনাশী* আগুনের কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। বিদায় আমার স্বপ্নের রঙীন নেশা!

ক্রমশঃ ওর কণ্ঠস্বর ঝিমিয়ে শান্ত হয়ে পড়ল। পরিবর্ত্তন ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌তে লাগল মেয়ের মুখখানা।

ডাক্তার সরকার গম্ভীরভাবে বল্‌ল—একটু কাগজ দিন—এই ওষুধটা কাছাকাছি ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে নিন। একটু পরে যখন জ্ঞান হবে তখন খাইয়ে দেবেন। আর এখন থেকে ওর বাইরের কাজকর্ম্ম সব বন্ধ করে দিন।

*

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে ললিতার মায়ের মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি, কাজেই ভোরের দিকে তন্দ্রা এসেছিল। ঘুম ভেঙেই দেখল মেঝেতে বালিশ বিছানা যেমন তেমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে—ঘরময় মাংসের এঁটো শানকি আর নোংরা থৈ থৈ করছে। গলা সপ্তমে চড়িয়ে বকতে শুরু করল—বলি, আজকন্তের আবার সাত সকালে কোন নাগর এয়েছে! দিন নি, রাত নি যৈবন এলিয়ে হেলে-দুলে বেড়াও যে, পেট ভরবে কিসে শুনি? রূপের ধুচুনী—বলি, বেলা হয়েছে, মায়ের শরীলগতিক খারাপ, বাবুদের বাড়ি কাজ করতে যাবি নি, নিজের বাসের ঘরের ছিরি করে রেখেছে দ্যাখো না। এমন ঘরে মালক্ষ্মী ভুলেও পা দেবে নি! বলি, ও লক্ষ্মীছাড়ী!

এতগুলি কথা একেবারে নিষ্ফল হওয়ায় তার রাগ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। বাইরে দাওয়াতে ললিতার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে অথচ সে মায়ের কথা কানেই তুল্‌ছে না। অতএব তার মা ক্ষেপে গেল—বলি ও পোড়ারমুখী, চুলোখাগী কার সঙ্গে কি এত অসের কথা হচ্ছে! শোন্‌ সে।

এবারে ললিতা সাড়া দিল—যাচ্ছি, অত চেঁচাচ্ছ কেন? তার কণ্ঠস্বরে ভীতির কোনো চিহ্ন নেই, বরং অবজ্ঞার আভাষ রয়েছে।

—তুমিই বা কি এত বড় পাটরাণী হয়েছ যে ছোটনোকের ছোট কথা কানে তুল্‌ছ নি।

বল্‌তে বল্‌তে বাইরে বেরিয়ে এসে সটান মেয়ের ঘাড় ধরে হাঁকল—হারামজাদী ফের তুই ওর সঙ্গে কথা বলিস? সব্বনেশে ছোঁড়াকে নইলে তোমার আশ মেটে না—!

মেয়ে জবাব দিল—বিয়ে দিয়েছিলি কেন তখন? আমি ত আর পীরিত করে ওকে স্থাঙা করতে যাইনি! আমার সোয়ামী বুঝি আমার নয়।

ললিতার মা কারও কথা শুন্‌তে প্রস্তুত নয়। মেয়েকে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এসে জামাই-এর সামনে দাঁড়াল।

নফরচন্দ্র শাশুড়ীর কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

ললিতার মা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠ্‌ল—বলি তোমাকেও ত বলে দিয়েছি বাপু এ বাড়ির তিসীম্‌নায় এসো নি। তবু যে বড্ড সাহস দেখ্‌ছি। ভালো চাও তো মানে মানে বিদেয় হও—এই বলে দিলাম।

নফরচন্দ্র এমনিতেই শাশুড়ীকে যমের মত ভয় করে। তার উপর এভাবে ললিতার সঙ্গে গল্পরত অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে সে আরও বিপন্ন বোধ করছিল। এ ক্ষেত্রে পালানোর সাহসটুকুও হারিয়েছে সে। কাজেই চোরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মাটিতে পা ঠুকে ললিতার মা বলল—ফের যদি দেখেছি এ বস্তীর ধারে-কাছে তবে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবো। ভাত দেবার ইয়ে নয় কিল মারবার গোঁসাই। জোচ্চোর, বদমায়েস কোথাকার।

ললিতার মায়ের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে বস্তীর অধিবাসীরা এসে জমতে শুরু করল। সকালবেলায় মুখরোচক বাগ্‌বিতণ্ডার গন্ধ সকলকেই প্রলুব্ধ করে।

ফ্যালার পিসি বল্‌লে—হাঁ তাও বলি বাছা, মাগকে খেতে দেবার মুরোদ নি ত বিয়ে করা কেন!

ললিতার মা গলা নামিয়ে অনুযোগের সুরে বলে—গরীবের ঘরে দেহ খাটিয়ে খাওয়া, কি বলো দিদি। একটা পয়সা, না, একটী মোহর। মেয়ে দেখে ত বল্‌লি দেড়'শ টাকা পণ দিবি। ভালো মানুষ, বিশ্বেস করেই বিয়ে দিয়ে মরেছি—আশীটি টাকা ঠেকিয়েছ আজ এই একটি বছর পেরিয়ে গেল আর কানাকড়িটি দিলি না। উল্টে মেয়েটাকে নিয়ে যাবার তাল।

ফ্যালার পিসী বল্‌লে—না, না ছেড়ো নি তুমি। আর মেয়ের অবস্থা—রোজ ত দেখি যা খায় উগ্‌ড়ে দিয়ে আসে। ক'দিনে আধখানা হয়ে গেল। সেখানে গেলে ত আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে না! এ অবস্থায় তোয়াজ তরিবত্‌ চাই ত!

ললিতার মা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল—ওমা সে কী কথা! তুমি কি সব যা তা বলছ দিদি! বমি করে কি আর সাধে? রোগের তরাসে মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে। যা ভাবছ, মাইরি সে সব কিছু নয়—ডাক্তারে দেখে বলেছে, চোখ খারাপ হয়েছে। সেইজন্যে রোজই ত মাথা ধরে। আর এ বংশের ধারাই ওই, মাথাটি ধরেছে, কি খুব রাগারাগি হয়েছে,—একটু কিছু অনিয়ম হলেই সাতদিন ধ'রে যা খেয়েছে হড় হড় করে সব ঢেলে দিল, এই ছিপতির বাপেরও চেড়ডা কাল দেখেছি সেই এতটুকু মেয়ে-শ্বশুরবাড়ি এসে অবধি! ওই ভয়ে ভাই শত অন্যায় দেখলেও কিছু বলতে ভরসা হ'ত না, কি জানি যদি গায়ের ওপরই উগ্‌রে দেয়।

ফ্যালার পিসী বিশেষ অঙ্গভঙ্গী করে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌ল—আমার কাছে আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে আসিস্‌ নি। আজও বড় বড় পাশ করা ধাত্রিরীরা এই শম্মার কাছে বিদ্যেবুদ্ধি শিখ্‌তে আসে। এইবেলা যা ওষুধবিষুধ করতে চাস কর। দেরি করলেই অঘটন!

ললিতার মা ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টা করে। অবশেষে ওর রোজগারা

রাগ গিয়ে পড়ে নফরচন্দ্রের ওপর—যদি মরদের ব্যাটা মরদ হস তবে সুদে আসলে দেনা শোধ করে, এই একবছর তোর ইস্ত্রীকে যে বসিয়ে খাওয়ালাম তার খরচ সাকুল্যে দিয়ে এখুনি নিয়ে যা তোর পরিবারকে। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। পরের ঝঞ্চাট ঘাড়ে নিয়ে বুড়ো বয়েসে আমার এ এক খোয়ার হয়েছে।

এবারে নফরচন্দ্র যেন কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায়। সে অতি কুণ্ঠিত ভাবে বলে—খোরাকী কোথা থেকে দেবো? তবে, যদি মেয়ে পাঠাও ত বিয়ের খরচের বাকী টাকাটা দিতে পারি। পাঠাও তো বলো।

বলে সে পকেট থেকে একশ' টাকার একখানি নোট বার করে দেখিয়ে পুনরায় সেটা পকেটেই রেখে দিল।

ললিতার মায়ের চোখ জলে ওঠে, হাত নেড়ে বল্‌ল—সে বয়েসে ওরকম গোছা গোছা একশ' টাকার নোট পায়ের তলায় গড়াগড়ি গিয়েছে বুঝলি। ঘেন্নায় ছুঁইনি।

তারপর একটু চুপ্ করে থেকে বললে—,ও বেলায় এসো। বামুন ঠাকুরকে দিয়ে দিন-খ্যান দেখিয়ে রাখি। আর টাকাটা এখন না দিতে চাও না হয় তখনই দিয়ো।

নফর বিনীত ভাবে জবাব দেয়—শাস্তরে বলেছে, সোয়ামীর সঙ্গে যেতে গেলে পাঁজীর দরকার হয় না—তা আমিই ত নিতে এলাম। এখন গেলেই ভালো হ'ত।

—তোমাদের মত হা-ঘরের বংশ নয় আমাদের। মেয়েকে শ্বশুর ঘর করতে পাঠাবো, তার গোছগাছ আছে, নেমন্তন্ন করতে হবে—ওঠ বল্লেই ত যাওয়া হয় না। মেয়েটার এতবড় অসুখ যাচ্ছে তা দেখতে পাও নি, কেবল খাঁচায় ফেলে খোঁচায় মারবার ফিকিরে আছ, কেমন নয়! পারবে আমার মত বড় ডাক্তার দেখাতে! জানো সরকার ডাক্তারকে দিয়ে ললিতার চিকিচ্ছে করানো হচ্ছে—তার ভিজিট লাগে ফি বারে একবুড়ি টাকা। তোমরা ত অমানুষ। যোবতী পেলে গিলে খেতে সাধ যায়—কেমন নয়!

নফর মৃদু স্বরে বলে—অসুখ বিসুখ ত ওর কিছু নেই, এ সময়ে অমন কার না হয়!

—দূর হয়ে যা! আমার একরত্তি মেয়ের নামে যত বাজে কথা! যা, যা, বেরো। বদমায়েস ইতর কোথাকার।

এবং এর সঙ্গে আরও কতকগুলি সময়োচিত কথা বল্‌তে বল্‌তে ললিতার মা জামাইকে প্রায় মারতে তাড়া করে।

বেগতিক দেখে নফরচন্দ্র রণে ভঙ্গ দিল। বস্তীর সকলেই এ ব্যাপার নিয়ে গোপনে দু'চার কথা বলাবলি করল কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলে না কেউ—বিপদ আপদ সকলেরই হয়, আজ বল্‌লে কাল শুন্‌তে হবে! তবে ফ্যালার পিসী বললে—আ মরণ, বুড়ো বয়েসে তোর ভীমরতি ধরল নাকি! মেয়েকে, বড়লোকের বাড়ীর চাকরীতে লাগিয়ে দে। সেখানে খাবে থাক্‌বে—কায়দা-সহবৎ শিখবে। আর তেমন ভদ্দরলোকের ছোঁয়া পেয়ে মন-মেজাজও ভালো হবে। পচা বস্তীতে এই সোমত্ত মেয়ে কি রসে থাকবে শুনি। আর বল্‌তে নেই ললিতের চটক আছে ত। এখানে রাখ্‌লে ছোঁড়াটা আবার আসবে। কোন্‌দিন দু'জনে সলাপরামর্শ ক'রে পালাবে হয়ত। তার আগে ওকে দে সরিয়ে। কোনো রকমে মেয়েটাকে ভদ্দরলোকের ছোঁয়াচ লাগিয়ে ভদ্দর করে ফ্যাল্‌—তারপর নিশ্চিন্দি!

ললিতার মা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি কতকগুলো কথা বলে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে মেয়েকে উচ্চকণ্ঠে বলল—বেলা ত অনেক হল। আজ বাবুদের বাড়ি বকুনী খেতে হবে—সব এই ধিঙ্গী মেয়ের জন্যে। তবু যদি মায়ের দুঃখু বুঝত। বলি, চল তোকেও কাজে লাগিয়ে দিই—মাস গেলে পাঁচ দশ যা আসে তাই ভালো। একটা মানুষের যেমন তেমন করে পেটটা ভরাতে গেলেও কম খরচা নয়। বুড়ো বয়েসে আর টানতে পারি নি—এই আকালে!

ললিতা মৃদুস্বরে বললে—ওমা, ও কি, আকাল বললে!

মেয়ের গৃহিনীপনায় ললিতার মা রোষকষায়িত দৃষ্টি হেনে বল্‌ল—আর কি ভালো কথা মুখে আসে? নিত্যি নেই, নিত্যি চাই—আকাল ছাড়া আবার কি?

পরক্ষণে মনে মনে বিড় বিড় ক'রে তিনবার 'আকাল' বলে নিল গোপনেই। এই ভয়ঙ্কর শব্দটি মুখে উচ্চারণ করলেই নাকি যত সর্বনাশ এসে জুটবে। তবে যদি তিনবার উচ্চারণ করে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় তাহলে দুর্ভাগ্যমোচন সুনিশ্চিত।

মেয়েকে বল্‌ল—চল্ আজই রায়েদের বাড়ি তোকে দিয়ে—তবে সরকারদের ওখানে কাজে যাবো।

ললিতা রোদনবিধুর চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল। সে বুঝেছে প্রতিবাদ করলেও আজ কোনো ফল হবে না।

পার্বতী মায়ের কাছে অভিযোগ করে—তোমার ওই আদুরী ঝিকে নিয়ে ত আর চলে না মা! বেলা আটটা বেজে গেল তবু তার আসার সময় হল না। ওকে তাড়াও। দিন নেই—রাত নেই কেবল খাই খাই, এটা দাও, সেটা দাও—আর কাজের বেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না!

সকাল থেকে অনেকবার ঝি-এর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছে পার্বতী। ঝি আসতে দেরী হলে তাকেই নিজে হাতে কাজ সারতে হয়, নইলে আবার মা কাজে লেগে যাবেন কাউকে কিছু না বলেই। ললিতার মা বুড়ো হয়েছে তাকে দিয়ে আর কাজ চলে না, সে-কথা বলবার উপায় নেই। ললিতার মায়ের সম্বন্ধে কোনো অভিযোগই এ সংসারে তেমন আমল পায় না, বিশেষ করে পার্বতীর মায়ের কাছে। তিনি হেসে জবাব দিলেন—আমিও ত বুড়ি হয়েছি মা, তা মানুষ বেশিদিন বাঁচলেই বুড়ো হয়। ভয় হচ্ছে ললিতার মা-র সঙ্গে কোন্ দিন তোর মায়েরও জবাব হয়ে যাবে।

একথায় পার্বতীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়, সে বলে—তেমন ভাগ্য কি আমাদের হবে? তোমার যা শরীরের হাল তাতে ত তোমায় একবারে নাকচ করে বসিয়ে রাখাই উচিত। মহাপণ্ডিত দাদা ত ভীষ্ম হয়েই বসে রইলেন। একটা বিয়ে করতেই যত আপত্তি! কি যে এক বুঝলেন বিলিতী মেয়ের দরদ—জানি না বাপু!

পার্বতী বোধকরি হিসাবে একটু ভুল করে ছিল। মেয়ের কথায় খুশি হওয়া ত দূরের কথা, তিনি শান্ত ভঙ্গীতে কয়েকটি ছোট ছোট শব্দ দিয়ে প্রলয়ের সূত্রপাত করলেন—সবাই ত পণ্ডিত হয় না। দুনিয়ার সব লোকের মত একটা বিয়ে করে কতকগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে প্রভঞ্জন জড়িয়ে পড়লে কীই বা লাভ হত মা, শুনি! আজ যে তার নামযশ হয়েছে সেটুকুর দামও কম নয়—সেকথা কজন বোঝে মা! তার বিয়ে না করার জন্যে আমার একটু কষ্ট হয়—তা হোক্‌, কিন্তু গৌরবটা যে অনেক বড় মা!

পার্বতী ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে মায়ের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে থাকে। তারপর আহত কণ্ঠে বলল—আমরা যে মুখ্যু এ আর কে না জানে! তাই বলে তুমি মা হয়ে কি করে অত বড় কথাটা বল্‌তে পারলে!

চমৎকারিণী অবাক হয়ে গেলেন—কী আবার বড় কথা বলিছি রে!

—ওই যে পঙ্গপালের মত এগুিগেণ্ডী! তা নাতীনাত্‌নীদের জন্যে যদি তোমার অশান্তি হয়, বললেই পারো, চলে যাই। তোমার জামাই ত যাবার জন্যে বার বার লিখছেন—স্পষ্ট করে বলতে কষ্ট হয় তাই ঠেস দিয়ে বললে তুমি! তবু ত তোমার সংসারে বসে খাই না, যতটা পারি ঝি-চাকরের সঙ্গে তাল দিয়ে সমানে খেটে যাই।

চমৎকারিণী অধিকতর বিস্ময়ের পাথারে পড়লেন। অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি কি এমন বলেছেন যার জন্যে পার্বতী এতখানি আঘাত পেতে পারে। তবু মেয়েকে শান্ত করবার জন্য বললেন—তুই মিথ্যে রাগ করছিস পারী মা! কই এমন কিছুই বলিনি ত।

পার্বতী ছলছল চোখে মুখ তুলে বললে—এর চেয়ে আবার কী করে মানুষে মানুষকে বলে! বললে না—বিয়ে করে একপাল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে—এসবের মানে কী আমি বুঝি না?

তিনি বলেন—সব কথারই তুই আজকাল মানে খুঁজিস, তোর হয়েছে কী। আমি বলিছি প্রভঞ্জন বিয়ে করল না তাতে দুঃখু করবার কিছু নেই। সত্যি কথাই ত—চারদিকের যা হাওয়া তাতে ছেলেপুলেকে মানুষ করা কি রকম শক্ত তা নিজেও ত বুঝছ মা। প্রভঞ্জনের ছেলে যদি আজ বাদে

কাল অপোগণ্ড হয়ে দাঁড়াত তাহলে প্রভঞ্জনের বিয়ে না-হওয়ার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট পেতাম। সংসারে ষোলআনা সুখ ক'জনের কপালে থাকে!

—যার কপালে যা আছে তা কি কেউ খণ্ডাতে পারে মা! তা ছাড়া কোন্ মেমের মেয়েকে ভালোবেসেছিল ব'লে তার জন্তে চিরজীবন আইবুড়ো হয়েই কাটাবে দাদা এ-ই বা কেমন কথা! কেন এদেশে আর কি ভালোবাসবার মত মেয়ে নেই!

একটা আন্তরিক আলোড়নের অভিব্যক্তিতে মায়ের মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল তিনি সেটা দমন করবার ব্যর্থ প্রয়াসে বলেন—প্রভঞ্জন আমার তেমন ছেলে নয়। নইলে আজ তাকে খুঁজে পেতে না তোমরা। তোমার আমার মুখের পানে তাকিয়ে যে এতবড় আত্মবলি দিল তাকে নমস্কার না করে পারে না কোনো মানুষ। যা জানো না, তা নিয়ে কথা বল্‌তে যাওয়া ভুল।

কলহের যে তুমুল তুফানের আয়োজন পার্বতীর মনে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, বোধ করি মায়ের দুর্বোধ্য গম্ভীর চেহারা দেখে সেটা আপনিই সঙ্কুচিত হয়ে গেল। মায়ের রহস্য গভীর মুখের দিকে মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল পার্বতী।

মা বল্‌লেন—শুধু এইটুকু আজ শুনে রাখ, প্রভঞ্জন সাধারণ মানুষ নয়। বড় কথা বল্‌লেই মহাপুরুষ হয় না—যে মুখ বুজে আত্মবলি দেয় সেও মহাপুরুষের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়।

পার্বতী সরল স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে—আচ্ছা, কে যেন বল্‌ছিল দাদা নাকি বিলেত যাবার চেষ্টায় আছে।

—বিলেত যাবার জন্তে সে কোন চেষ্টাই করে নি, বরং পাছে আমরা আপত্তি করি এই ভেবে প্রথমটা না যাওয়া মনস্থ করেছিল। ক্রমে কথা শুনে আমিই তাকে যাবার জন্তে বলেছি। এবারে বিলেতী ডিগ্রী পাবে ও বিলেতে গিয়ে সব হাসপাতালগুলো একটু ঘুরে ফিরে দেখ্‌লেই। ওকে সরকার থেকে যা খরচ দিচ্ছে তার সিকি টাকাও খরচ হবে না ওর।

অবিশ্বাসের বাঁকা হাসি পার্বতীর ওষ্ঠপ্রান্তে খেলে যায়। মায়ের মনো-

ভাবের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের কল্পনাকুশলতায় খুশি হয়ে পার্বতী বললে—তুমি যা-ই বলো মা, এবারে তোমার ছেলে মেমসাহেবকে শাড়ী পড়িয়ে বাড়ি এনে তুলবে। তোমার ঠাকুর পূজোর হিমানী পাউডার হবে ধূপচন্দন।

মেয়ের রসিকতায় খুশি হলেন না, অন্তরের কোন সূক্ষ্মতন্ত্রীতে তাঁর বেদনার করুণ রস ক্ষরিত হচ্ছে। কতকটা অসহায় কণ্ঠেই তিনি জবাব দিলেন—বেশ ত তাই হোক। সন্তানের শান্তি আর কল্যাণের চেয়ে বড় ধর্ম ত আমার কিছু নেই। নিজের ধর্ম নিজের কাছে—কে কার ধর্ম্ম ঘোচাতে পারে বল মা। শেষ আশ্রয় কাশী বিশ্বনাথের আশ্রয় ত কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। জীবন ত অনেককালের হয়ে গেল।

বলে তিনি অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করে ব্যস্ত, হয়ে বললেন—যাই এখনও ঠাকুরঘরের অনেক কাজ বাকী রয়েছে। তুই একটু কষ্ট করে দেখে শুনে নে মা! বুড়ো মাকে আর সবাই মিলে তেক্ত করিস নে।

পার্বতী বলল—ঘ্যাখো না, এদিকে নিধুটা এখনও বাজার থেকে ফিরছে না। যাই, বসে থাকলে আমারই কি একদণ্ড নিশ্চিন্দি আছে। তোমার ত বোবা ঠাকুর, আমার আবার জ্যান্ত দেবতার আখড়া—উঃ সব ক'টা সমান বায়নাদেরে হয়েছে।

বলতে বলতে পার্বতীর চোখে মুখে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ প্রসন্নতা ছেয়ে যায়। মুহূর্ত-পূর্বের পার্বতীর সঙ্গে এই মাতৃমূর্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই।

ঘাড় থেকে বাজারের ঝুড়িটা রান্নাঘরের দাওয়াতে নামাবার সময় নিধু অভ্যস্ত কণ্ঠে ডাকল—কই গো দিদিঠাকরুণ!

কলঘরের মধ্য হতে সাড়া এলো—বসো যাই। মাছটা যেন কাকে না নেয়—একটু দাঁড়াও ওখেনে।

নিধিরাম চীৎকার করে বললে—সে কী গো দিদিঠাকরুন! নন্তের মা পলতে বুঝি আসেন নি! তা বলে তুমি বাসন মাজতে বসে গেলে। দুমিনিট আর ত'র সইল না! যা ব্বাবা! বলি নিধে হতভাগা কি মরেছে?

দিদিঠাকরুণের এরকম কাণ্ডকারখানায় নিধিরামের মাথা গরম হয়ে উঠল। সে বললে—থাকল পড়ে বাজার তোমার। মাছ কাগে খাকগে আমি দেখতে পারব না। যত অনথ কাণ্ড!

পার্বতী বেরিয়ে এলো কলঘর থেকে—বলি অত চেঁচামেচি করছ কেন?

—নাঃ চেঁচাবে না। এ বাড়ির রীতই এই, ঝি-চাকরকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুল্লে ত হবেই এসব! এখুনি গিয়ে বুড়িকে হিড়হিড় করে টেনে আনছি—দুবেলা গামলা বোঝাই করে ভাত নিয়ে যাবার বেলায় ঠিক আছে—এই ব্ল্যাক মার্কেটের অন্ন ধ্বংস করে মায়ে বেটাতে বেশ রাজার হালে চালিয়ে দিল! ওসব আজ থেকে আর হবে না, বুড়ির ভাত বাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে না। দু'বেলা বাড়ি যাওয়া ওর বন্ধ করে দাও। তিন দিনে সিধে বানিয়ে দিচ্ছি ডাইনীকে দাঁড়াও।

পার্বতী এতক্ষণ কথা বলবার ফাঁক পায় নি—নিধিরাম নিজের মনেই বকে যাচ্ছিল। তার কথায় ছেদ পড়তে পার্বতী বললে—অত গাঁক-গাঁক করে চেঁচাচ্ছিস—মা পূজোয় বসেছেন সেটা নিত্যি বলে দিতে হবে!

জিভ কেটে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে নিধিরাম ঠাকুরঘরের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গলার স্বর রুদ্ধ করে বললে—তুমি ওঠো দিকিন, আমি ও ক'খানা ডলে দিচ্ছি।

হয়ত ললিতার মা মিনিট কয়েক আগেই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল। আবহাওয়া প্রতিকূল দেখে আড়ালে অপেক্ষা করছিল। নিধিরামের কণ্ঠস্বর দমিত হওয়ার পর মুহূর্তেই সে আত্মপ্রকাশ করল—বিষণ্ণ গম্ভীর চেহারা। ললিতার মায়ের এই চেহারাটার সঙ্গে এ বাড়ির সকলেই সুপরিচিত। নিধিরাম সে আড়ালে যতই লম্ফঝম্ফ করুক না কেন ললিতার মায়ের সামনে নিধু অত্যন্ত নম্র; 'মাসী' ছাড়া সম্বোধন করে না।

পার্বতী হাত ধুয়ে কাপড় বদলে ওপরে উঠে গেল।

নিধু প্রশ্ন করল—কী মাসী! আজ কি শরীরটা ভালো নেই?

—গরীবের আবার শরীলগতিক কি, বাবা, বাঁচতে গেলে বইতে হবে। বহু পাপে মানুষ ভিকিরী না হয়ে পরের দোরে ঝিবিত্তি করে।

নিধু গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে প্রশ্ন করে—কি হ'ল গো মাসী!

ললিতার মা বলল—না, কিছু না এমনিই বলছি। এই আজ কদিন ধরে মেয়েটার চোখের ব্যামো—দিনরাত মাথা ধরেই আছে। আবার কপালগুণে এমন জামাই জুটেছে যে একবার খোঁজটুকু নিয়ে উব্‌গার করে না। দেখছি সবই, সইচি সবই। ডাক্তার দাদার দয়া, তিনি ওষুধবিষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেয়েটা যেন হলুদে পোকা হয়েছে শুকিয়ে, পেটে ভাত তলায় না আজ তিন মাস।

নিধু সহানুভূতির সুরে বলে—আহা বড় কষ্ট ত!

—তা আর বলতে। নিজে হাতে করে সেই মেয়েকে চাকরীতে দিয়ে এলাম। বলি কদ্দিন আর এভাবে চলবে। কপাল ছাড়া আর কি বলব—ছেলেটা ডাগর হল, বিড়ি বেঁধে তা দিন গেলে টাকাটা আসটা আনছিল। ভাবলাম গরীবের দেবতা মুখ তুলে চেয়েছেন! হুঃ দেবতা কি কখনও গরীবের হয় রে বাবা! ওই এক সব্বনেশে কড়ি খেলার রোগে ছোঁড়াটা যা রোজগার করছিল সবটাই। ফুঁকে দিচ্ছিল বলে দু'কথা বল্‌তে গিয়েই হলো বিপদ! আজ সাতদিন বাড়ি ঢোকে নি, কাঁচি নিয়ে সেই যে পালিয়েছে তার আর পাত্তা নেই।

নিধিরাম বিস্মিত হয়ে বলল—কড়ি খেলা কি গো মাসী!

—জুয়ো খেলা! ও মা তাও জানিস নে!

—ওইটুকু বিচকে ছোঁড়া জুয়ো খেলতে শিখেছে!

—হাড় জুয়োরী হয়ে উঠেছে। এসবের কিছুই জান্‌তাম না বাবা। রোজই এক টাকা পাঁচ সিকে এনে দিত—কিন্তুক ক'দিনই করে কি আট-আনা, ন-আনা দিতে লাগল! আমি বলি—'হ্যাঁ রে এত কম কেন?' বলত—'ওই ত সব দিলাম। দোকানে—কাজ হচ্ছে না তার আমি কি করবো?' ভাগ্যগুণে সেদিনই দোকানদারের সঙ্গে দেখা, সুখদুঃখের কথা অনেক বলে ফেল্লাম, তারপর বল্‌লাম—'ছোঁড়াকে একটু বেশি করে পাতা দিও বাঁধতে, নইলে উপোস করে মরব যে সবাই, অপুষ্যি ত কম নয়!'

দোকানদার বললে—'কেন, তোমার ছিপতি ত ভালো কারিগর গো, কোনোদিন ত ডেরটাকার কম পায় না।' অবাক কাণ্ড! বাড়িতে যখন ধমক দিয়ে ধরলাম, 'বলি—পয়সা কি করিস?' হাজার হলেও বয়েসে কচি, আস্তে আস্তে সব কথা বেরিয়ে এল! আমি বলি কি—এ ত ভালো নয়! কিন্তু আজকালকার ছেলে বাবা, সে কী তোদের মতন? এককথা বললে দশ কথা শুনিয়ে ছাড়ে। বললে কি 'রোজগার কি তোমাদের পেট ভরাবার জন্যে করি? আমার পয়সা যা খুশি করব আমি।' রাগের মাথায় আমিও দু' ঘা বসিয়ে দিলাম—তারপরে সেই যে কাঁচি হাতে করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, একেবারে নিখোঁজ!

কথা বলতে বলতে ললিতার মায়ের চোখ বেয়ে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ে—ওর সেই বিবিধ-অভিজ্ঞতা-কুঞ্চিত বলিরেখাকীর্ণ মুখমণ্ডল বেদনায় করুণ হয়ে উঠল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিধু বলল—আজ দেখছি তোমার শরীরও তেমন জুৎ নেই মাসী, মনটাও খারাপ তা এ ক'খানা বাসন আমি মেজে দিচ্ছি, তুমি থির হয়ে বসো বরং।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে ললিতার মা ম্লান হেসে বলে—না, না সে কী হয়। তুই যে মুখে বললি এই ত অনেকখানি করা রে। আহা তোর ভালো করুন তিনি।

বৃদ্ধা একবার আকাশের পানে ব্যথাকরুণ দৃষ্টিতে তাকায়—তখনও তার চোখ সিক্ততায় আর্দ্র-উজ্জ্বল। ললিতার মা বলল—শরীল আমার ঠিক আছে রে। কাজ করতে ভালো লাগে। তবে মনটা কেমন আনচান করে—ওই হাঘরে ছেলেটার জন্যে।

ওপর থেকে পার্বতী সংক্ষেপে জানিয়ে দিল—সাড়ে ন'টা বেজে গেল নিধু!

চোখের ইসারায় ললিতার মা নিধুকে বললে—দিদিঠাকরুণ বিরূপ হয়েছেন।

নিধিরাম ঘাড় নেড়ে সে কথাটা সমর্থন করে বললে—ভীষণ! এবং

পরমুহূর্তে গলা ছেড়ে বললে—হাত চালিয়ে নাও মাসী বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল যে।

তারপর কিছুক্ষণ বাড়িটা যেন চুপ করে থাকে। সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত। শুধু বাইরের বারান্দা থেকে ছেলেমেয়েদের কোলাহল ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে বুঝি এই ধরণের টুকরো নীরবতাই মানুষকে জীবন-স্পন্দনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাসনের গায়ে তেঁতুল বুলিয়ে ঘষতে ঘষতে ললিতার মা নিজের কথাই ভাবছিল। এইসব আত্ম-সচেতন মুহূর্তে ওর নিজের প্রতি করুণা হয়, ঘৃণা, লজ্জাও কম হয় না—আর সব চেয়ে বেশি অনুভব করে একটা তিক্ততা। এই তিক্ততার জন্য দায়ী করে ও ললিতাকে। ললিতা এই অল্প বয়সেই তার মায়ের প্রথম যৌবনের মত কোমল প্রীতির আধার হয়ে উঠছে। ও যদি এইরকম নরম হয়েই থাকে তবে সবাই ওকে মাড়িয়ে যাবে—ওকে কঠিন আবরণ দিয়ে গড়ে তোলা প্রয়োজন কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে কই! এই বয়সে একবার একটা ছেলেপুলে হয়ে গেলে তখন কেউ ফিরে চাইবে না। ললিতার মায়ের চেয়ে আর কেউ কি সেকথাটা ভালো ভাবে জানে? তখন নফরচন্দ্রের পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে হবে আর উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও কোন সুখ-শান্তি মিলবে না। ললিতার মা সারাজীবন জ্বলেছে আর একটা অকর্মণ্য পুরুষকে নিয়ে। ললিতার বাপ কেবল চোখ রাঙিয়েই কাটিয়ে গেল আর ললিতার মা শুধু খেটেখেটেই মরল। শুধুই পরিশ্রম করবে মানুষ! জীবনকে একটুও উপভোগ করবে না এ-ই বা কেমন কথা! কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে এই দুর্দিনে কোনো মানুষ পারে না কি সৎভাবে সংসার চালাতে? ললিতার যেন দুঃখের দিন না আসে—যেমন করে হোক ললিতার সুখস্বাচ্ছন্দ্য আসুক এইটাই তার মা চায়।

পার্বতী ভাবছিল জয়ন্তর কথা। একুশ বছরের ঝকঝকে তলোয়ারের মত চেহারা নিয়ে জয়ন্ত কিশোরী পার্বতীর বয়ঃসন্ধিতে যে স্বপ্নরঙীন ছবি এঁকে-ছিল, সে জয়ন্ত বুঝি স্বপ্নের ওপারেই হারিয়ে গেছে কবে। সংসারের অনিবার্য

গতি পার্বতীকে টেনে নিয়ে চলেছে—আর জয়ন্ত চলছে অন্য কোনো পথ ধরে সেই রহস্যময় পথের সঙ্গে পার্বতীর পরিচয় নেই। শুধু পার্বতী যেটুকু জানে তা এই—ক'বছর ওদের সংসারে অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু আজ যে কোথাও কোনো আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না একথাটাও কম সত্য নয়। জয়ন্তর যুদ্ধের পয়সা যুদ্ধের বাজারেই শেষ হয়ে গেছে। অত পয়সা কোথায় গেল!···উড়ো পয়সা উড়েই গিয়ে থাকে সেটা বড় কথা নয়, এখন যে চাকরী নিয়ে টানাটানি, জয়ন্তদের আপিসে এবারে নাকি হিসাব-নিকাশে গোলমাল হয়েছে খুব, অনেকেই ধরা পড়েছে। দাদার কাছে এখন স্বামীর হয়ে সুপারিশ করতে হবে, সেইজন্যই জয়ন্ত ওকে রেখে গিয়েছেল—কিন্তু আজ পর্যন্ত লজ্জায় সে কথাটা মায়ের কাছেও খুব স্পষ্ট ক'রে বলতে সাহসে কুলোয় নি। অহরহ এই চিন্তাই পার্বতীর মনকে বিষণ্ণ করে রাখে। একা থাকলেই আরও পীড়া দেয় সেই চিন্তাটা।

পার্বতী রান্নাঘর থেকে বল্‌ল—কী গো বাসনপত্র কিছু পাওয়া যাবে?

—এই দিই দিদিমণি, দিই!

বাসনের পাঁজা নিয়ে ললিতার মা উঠে এলো—এই নাও, জলবুলিয়ে দেখে তোলো ভাই, বুড়ো হয়েছি আজকাল আর তেমন নজরে আসেনা।

তারপর একটু মিনতিমাখা কণ্ঠে ধরা গলায় বল্‌ল—তোমরা যদি এমন মুখভার করো দিদিমণি তাহলে এ পোড়া জীবনটা রেখে কি লাভ, বলো!

সেকথার জবাবে পার্বতী বলল—কালকের পান্তা আছে তাই খাবে, না মুড়ি-চিঁড়ে নেবে? দাদা কাল কোথা থেকে খেয়ে এসেছিলেন, রাত্রে কিছু খান নি।

—আহা ভাত কখনও ফেল্‌তে পারি, বলি তারই দুঃখে এত খোয়ার—আর সেই নথ্‌থি! দাও, দাও, ভাতই দাও।

পান্তাভাতের সঙ্গে পেঁয়াজ কামড় দিয়ে খেতে খেতে ললিতার মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল খুশির আতিশয্যে। স্বরগ্রাম একটু চড়িয়ে বল্‌তে লাগল—জানো গো দিদিমণি, এইবারে যদি ডাক্তার দাদার মতিগতি ফেরে ত ফিরতেও বা পারে!

সকালে মায়ের সঙ্গে ভাই-এর প্রসঙ্গে বচসা হয়েছিল সেটা ললিতার মায়ের কথাতে নূতন করে মনে পড়ে পার্বতীকে অপ্রসন্ন করে তুলল। পার্বতী সংক্ষেপে জবাব দেয়—মতিগতি ফিরল আর না ফিরল তাতে আমাদের কি এসে যাচ্ছে! আমরা ত পর!

—না, মানে এই ক'দিন ধরেই দেখছি দাদাবাবুর কাছে এক পরমাসোন্দর মেয়ে আসে। আহা যেন সরস্বতীর পিত্তিমে। বলে, নতুন রুগী। কী সেজেই যে আসে—ওই রাঙা টকটকে রঙ, তার ওপর সাদা খড়ি গুঁড়ো আর হিমানী মাখে কেন তা বুঝিনে ভাই। আহা অমন মেয়ে এলে ঘরদোর আলো হয়ে যাবে। আমি ত ভাই ওর কোথাও অসুখ দেখি নে।

পার্বতী বলল—রুগী নয় দেখেই বুঝে ফেললে? এবারে তুমিই ডাক্তারী করো গিয়ে।

—আঃ মরণ আমার, তা কে বলেছে! এমনিতে দেখলে মনে হয় না যে মেয়েটার কোনো রোগ আছে। দিব্বিটি খট্‌খট্ জুতোর ঠোক্কর দিয়ে চামড়ার লতাপাতা আঁকা ঝুলি ঝুলিয়ে, ইয়া বড় গাড়ি চড়ে আসে। আর বলতে নেই, দাদাবাবুর মেজাজও আজকাল বেশ নরম-নরম। আমাদের ত তিনকাল গিয়ে এককালে এসে ঠেকেছে—অনেক দেখেছি, তাই কেমন কেমন মনে হচ্ছে ব'লেই বলছি।

—ত্যাখো, এসব কথা যেন ব'লো না মা'র সামনে।

ললিতার মা মুখের ভাত গিলে নিয়ে বললে—না ভাই, আমি সে ভাবে ত কিছু বলিনি। হরদম মেয়েটা ডাক্তার খানায় আসে তাই মনে হলো বুঝি খবরটা দিলে তোমরা কায়দা করে ধরে দাদাবাবুকে সংসারী করতে পারো। মেয়েটা কিন্তু বেশ দেখতে, আর বলতে নেই দাদাবাবুর সঙ্গে খাশা মানাবে।

তারপর গলা খাটো করে বলল কতকটা চুপিচুপিই—তা বিয়ে না-ই বা করল। ওসব পুরুষ মানুষের বিয়ের দরকারটাই বা কী। আহা বেঁচে থাক তোমার ছেলেমেয়ে—খুঁটে খেতে তারাই ত থাকবে। মামার সম্পত্তি—!

এ কথায় পার্বতীর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত রী-রী করে ওঠে। একটা কঠিন কথার ঘায়ে ও যেন ললিতার মাকে জর্জরিত করতে চায়—কিন্তু

তার যোগ্য ভাষা খুঁজে পায় না। নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে জলন্ত দৃষ্টি দিয়ে এই বৃদ্ধাকে দগ্ধ করতে চায় পার্বতী।

একটু পরে যখন বাকশক্তি ফিরে পেল তখন দাঁতে দাঁতে চেপে পার্বতী বলল—দুপুর বেলায় মানুষকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে গেরস্তর অমঙ্গল হয় তা নইলে তোমায় দূর করে দিতাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি এসেছি ভাই-এর পয়সার গন্ধে, একথা বলবার আস্কারা তোমাকে কে দিয়েছে শুনি?

ললিতার মা ঘাড় নীচু করে ভাতের থালায় মনোনিবেশ করেছে—পৃথিবীর আর কোনো কিছুতে কান দেবার যেন অবসর নেই তার।

প্রভঞ্জনের আজকাল বাড়ি ফিরতে বেলা আড়াইটে তিনটে বেজে যায়। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে সে দুএকখানা বিলেতী ডাক্তারী কাগজ ওন্টায় ইজি চেয়ারে বসে। দিনের বেলায় শোয়া তার অভ্যাস নেই। একটু বিশ্রামের পর সে যায় ক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরীতে। সকালের অর্দ্ধসমাপ্ত কাজগুলি সেরে নিয়ে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। সেখান থেকে একবার ডাক্তারখানা এবং শেষে রোগী দেখা, কতকটা এই নিয়মেই তার চলছে। অবশ্য কোনো একটা নিয়ম তার দীর্ঘস্থায়ী হয় না, প্রয়োজন মত নিয়ম বদলায়।

ফুরসৎ এত কম যে মায়ের সঙ্গে তার খুবই কম কথাবার্তা হয়। যা হয় সে ওই দুপুরে খাবার সময় এবং তেমন দরকারী কিছু কথা থাকলে সেটা রাত্রে শোবার সময় সে যখন মাকে প্রণাম করতে আসে তখনই হয়।

কিন্তু আজ দুপুরে দাদা বাড়িতে পা দিতে না দিতেই পার্বতী হাতের কাজ ফেলে এসে দাঁড়াল, এতক্ষণ যে বিপুল কৌতূহল এবং অভিমানের অন্তর্বিপ্লবে তার মন বিধ্বস্ত হচ্ছিল সেটা তাকে অবিলম্বেই নিরসন করতে হবে।

কালক্ষেপ না করে পার্বতী বলল—একটা কথা বলছিলাম দাদা!

কাঠের 'হ্যাঙ্গারে' কোটটা ঝুলিয়ে রাখতে প্রভঞ্জন বোনের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

পার্বতী বল্‌ল—এভাবে আর কতদিন নিজে হাতে জামাকাপড় গুছিয়ে রাখা চল্‌বে, শুনি! আমরা ত ভূত, আমাদের দিয়ে এসব কাজ হয় না, ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে। তা কাজ জানা একটা—

কথার মাঝ পথেই প্রভঞ্জন বলল—হ্যাঁ, চাকরের কথা ত অনেকেই বলেছি! দু'চার দিনের মধ্যে মনে হয় পাওয়া যাবে। মুস্কিল কি জানিস, যুদ্ধের দৌলতে সবাই দু'মুঠো রোজগার করেছে এখন অল্প মাইনেতে আসতে চায় না। তা বলে তোর দাদা ত আর এত লাটসাহেব হয় নি যে ষাটসত্তর টাকা দিয়ে লোক রাখতে পারে!

হতাশ ভাবে পার্বতী বল্লে—আচ্ছা দাদা, তুমি দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছ বলো তো?

বোনের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসল প্রভঞ্জন—কেন রে?

—আর কেন! আমি বল্‌ছিলাম কি, তুমি এবারে মাকে ছুটি দাও।

—তুই এখানে থাকলেই ত বেশ হয়, মাও ছুটি পান। সে কথা কবে থেকে বলছি। তা যদি না হয় তবে ঠাকুর চাকরদের হাতে নিজেকে সঁপে দেবো।

—আহা একটা বৌ এলে ত সংসারটা আপনার মনে করে দেখবার একজন পাবে তুমি।

—কেন তোরা কি আমার আপন ন'স?

পার্বতীর মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা উন্মুখ হয়ে উঠেছে সেটা কিছুতেই বল্‌তে পারছে না সে। অথচ না বলে থাকাও তার পক্ষে অসম্ভব।

অবশেষে মরীয়া হয়ে বলে বস্‌ল—আচ্ছা তোমার ডাক্তারখানায় রোজ রোজ কে একটি মেয়ে আসে, দেখতে খুব সুন্দরী?

প্রভঞ্জনের প্রাণখোলা হাসিতে ঘরখানা ভরে যায়।

পার্বতী কতকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—অমন হেসে উড়িয়ে দিও না। বল্‌তে হবে।

হাসি থামিয়ে প্রভঞ্জন বল্‌লে—এ নিশ্চয় নিধুর কাজ। কাকে দেখে আর কাছে লাগিয়েছে তা কি ক'রে বলি বল।

পার্বতী মনে মনে কি যেন চিন্তা করে প্রশ্ন করল—আজও এসেছিল বুঝি?

—কত মেয়েই ত আসে, কার কথা বলছিস তুই?

—উঁহু, অত হামেশা আমার মত মেয়ে নয়, এই যে শুনলাম রোজ একটি খুব চমৎকার সুন্দরী মেয়ে আসে।

—তা আসতে বাধা ত দেখি না।

—ললিতার মা ত তার রূপের ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ। খুব সুন্দর, মেয়েটি গাড়ী করে খুব সেজেগুজে আসে!

—তা রূপসী মেয়ে তাতে কোনো ভুল নেই। লেখাপড়াও জানে। আর পয়সা করেছে বিস্তর। রমিতা মজুমদার ওর নাম—ফিল্মষ্টার!

—রমিতা মজুমদার? ওঃ, বুঝলাম। অমন পয়সার মুখে ঝাড়ু। রূপের কপালে আগুন। মুখ বাঁকিয়ে পার্বতী বলল।

প্রভঞ্জন বলে—কেন রে! ওই রকম একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে, আর কোনো ভাবনা থাকে না। দিব্যি খাও দাও আরামে ঘুম দাও।

—তুমি থামো দেখি! ও মেয়ের নাম মুখে আনা উচিত নয়। উঃ জাঁহাবাজ মেয়ে একটি! স্বামীর মুখে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় যারা তারা মেয়ে জাতের কলঙ্ক।

প্রভঞ্জন বিস্মিত হয়ে বলে—কিন্তু মেয়েটিকে দেখে ত মনে হয় না।

পার্বতী রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বলে—ওসব মেয়ে ওমনিই হয়। আমাদেরই স্কুলে পড়ত ও, ওর বিয়ে হয়েছিল একটা বামুনের ছেলের সঙ্গে—সে কী কাণ্ড!

—আচ্ছা, তুই এসব কি করে জানলি?

—আমি কেন? একথা ত সবাই জানে। স্কুলে পড়তে পড়তে হেডমিস্ট্রেসের এক পাতানো ভাই-এর সঙ্গে খুব জমালো। তাই নিয়ে কি কেলেঙ্কারী। বিয়ে কিছুতেই হয় না, মেয়েটা কলেজে পড়তে পড়তে ছেলেটাকে নিয়ে কি নাচানাচিই না করল। বিয়ে-থাও করল। কিন্তু ওসব ঘর জ্বালানী মেয়ে, পারবে কেন বেশীদিন শান্তিতে থাকতে। ওর স্বামীর মস্ত অপরাধ সে নাকি মদ খায়। আহা বলি, সবাই কি আর আমার দাদার মত

মহাপুরুষ। খুঁজলে ত ঘরে ঘরেই অমন একটু আধটু গলদ বেরোবে, তা বলে সে নিয়ে কে আর কবে হৈ হৈ করেছে। স্বামীর সঙ্গে ঘর করবি না বেশ কথা—কিন্তু তাই বলে হাজারো জনকে রূপ দেখিয়ে খুশি ক'রে পেট ভরানো! ছি-ছি-ছি! আমি কি আর অত জানতুম ছাই। ওঁর সঙ্গে একদিন টকী দেখতে গিয়ে দেখি আমাদের সেই সান্ত্বনা! সেই তেমন ঘাড় বাঁকিয়ে, এড়িয়ে এড়িয়ে কথা বলা, তেমনি মনভোলানো ভঙ্গিতে তাকানো। আমি বল্লাম—এ আমাদের সান্ত্বনা না হয়ে যায় না। উনি বল্লেন—না, ওর নাম রমিতা মজুমদার। এই নিয়ে খুব তর্ক হল। তারপর এই সেদিন কোথা থেকে উনি সব শুনেছেন, বল্লেন—তুমি ঠিকই বলেছো। রমিতা মজুমদার ভদ্রঘরের মেয়ে। বুঝলে দাদা, তারপর থেকে তোমার ভগ্নিপতি ত আমায় ঝুলোঝুলি, বলেন যে, দাও না আলাপ করিয়ে একবার।

প্রভঞ্জন বল্ল—তা দিলেই পারিস।

পার্বতী রীতিমত চটে গেল—আহা, তোমার কথার কি ছিরি। ওদের সঙ্গে কথা বল্‌তে যাওয়াই ত অপমানের ব্যাপার আমাদের কাছে।

—কেন? তাতে কি হয়েছে।

—সে সব তুমি বুঝবে না।

প্রভঞ্জন অকস্মাৎ বল্‌ল—তুই কি বল্‌তে চাস ওর স্বামী সম্পূর্ণ নির্দোষ।

পার্বতী দাদার এ কথায় যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হল। বলল—সে প্রশ্নই ওঠে না। স্বামীর দোষগুণটা এত বড় ক'রে দেখা কেন!

—বাঃ তা কেন দেখবে না! স্ত্রী ত জড় সম্পত্তি নয়, মানুষ মাত্রেরই ন্যায়সঙ্গত কতকগুলো অধিকার আছে।

প্রভঞ্জন শান্ত কণ্ঠে বলে।

পার্বতীর মনে হয় তার দাদা রমিতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে। তা কিছুই বিচিত্র নয়। ডরোথীকে যার ভালো লাগে, রমিতাকে সে পছন্দ করতেই পারে। পার্বতী বল্‌ল—তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে এভাবে ঘরভেঙে দেশের সর্বনাশ যারা করে তারাই ভালো।

প্রভঞ্জন আগের মতই অনুত্তেজিত ভাবে জবাব দেয়—না, তা বলিনে।

তবে স্বামী যদি অকথ্য অত্যাচার করে তবে তার প্রতিবাদ করবে না?
অবশ্য আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ অশিক্ষিত, তারা নিরুপায় বলেই
সব কিছু সহ্য করে, তার সুযোগ নিয়ে পুরুষেরা যা খুশি তাই করে বেড়ায়।
সত্যি বলছি পার্বতী তুই বিশ্বাস কর, মাঝে মাঝেই এমন এক একটা কেস্
আসে যার মূল হচ্ছে অবিবেচক পুরুষের অমানুষের মত ব্যবহার। রমিতার
ওপর আমার একটু শ্রদ্ধা হয়েছে, তার কারণ সে আত্মনির্ভরতার সাহস
দেখিয়েছে। সাহসটাই বড় কথা। সৎ বা অসৎ যা-ই হোক সেটা যে
সাহস তাতে সন্দেহ নেই। জীবিকার পথ হিসেবে সে যা বেছে নিয়েছে,
সেটা অবিশ্যি আমাদের সমাজে প্রশংসনীয় নয়।

পার্বতী এবারে জলে উঠ্‌ল—তোমার মতে এটা অন্যায় নয় বুঝি?

প্রভঞ্জন তেমনি নির্বিকার ভাবে জবাব দেয়—এমন আর কি অপরাধ!

ঠিক এমনি সময়ে মা এসে ঘরে ঢুকলেন। পার্বতী কি একটা কথা
বল্‌তে যাচ্ছিল, মাকে দেখে চুপ করে গেল।

মা অনুযোগ করলেন—হ্যাঁ রে, কারুর কি ক্ষিদে তেষ্টা নেই? বেলা
চারটে পর্য্যন্ত শুকিয়ে থাকতে খুব মজা লাগে, না।

প্রভঞ্জন ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। এবং পার্বতীর দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর
ভাবেই বল্‌ল—ছাখো মা, যদি বা এতদিন পরে আমার একটা মেয়ে পছন্দ
হল—পারুটা ভাংচী দিয়ে বসল। এরপর ক্ষিদেতেষ্টা থাকে?

মা বুঝতে পারলেন। এরকম পরিহাস প্রভঞ্জন অকপটেই করে। কিন্তু
পার্বতী আজ কেন যেন প্রভঞ্জনের এ কথাটা এত হাল্কা ভাবে নিতে পারল
না। হয়ত সকাল থেকে একের পর একটা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ওর মনটা
তেমন সুস্থির ছিল না। তা ছাড়া তার বিবাহিত জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতা
দিয়ে জেনেছে মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আর ললিতার যা আজ
অতর্কিতে পার্বতীর মনে একটা সংশয়ের কাঁটা জাগিয়ে দিয়েছে, পরোক্ষ-
ভাবে প্রভঞ্জনও সেটার দিকেই ইঙ্গিত করছে কিনা পার্বতী ঠিক বুঝতে পারে
না। ও যেন নিজের ওপর বিরক্ত হয়েই বলে—তোমার যাকে খুশি বিয়ে
করো না, আমি কেন ভাংচী দিতে যাবো? আমার কী স্বার্থ!

প্রভঞ্জন হেসে হেসেই বল্‌ল—ও রকম বাঁকা কথা বলাই ত ভাংচী।

মা বাধা দিলেন—তোর ছেলেমানুষী আজও গেল না। পারুকে রাগিয়ে কি লাভ বল্‌তে পারিস! একে ত বেচারী নিজের দুঃখে—

শেষের কথাটা সমাপ্ত করবার আগেই মা নিজের ভুল বুঝতে পেরে থেমে গেলেন—কিন্তু পরক্ষণে মেয়ের মুখের পানে চেয়ে দেখ্‌লেন আঁধার নেমেছে সেখানে। প্রতিনিয়ত যে মনে দুঃখ দমনের যুদ্ধ চলেছে সেখানে বাইরে থেকে কোনো সহানুভূতির ছোঁয়াচ পেলে আর সে দুঃখকে লুকিয়ে চেপে রাখা যায় না। অন্তরকে উদ্বেলিত ক'রে আত্মপ্রকাশ করে বেদনার অশ্রুধারা। পার্বতী মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে অন্যত্র চলে গেল।

প্রভঞ্জন ডাকলে—মা!

চমৎকারিণী ছেলের কথার সাড়া দিতে পারলেন না। একবার তার মুখের পানে তাকালেন। সে চাহনীও খুব শুষ্ক নয়।

প্রভঞ্জন আবার ডাকে—মা। তোমরা কি সত্যিই চাও আমি একটা বিয়ে করি।

চমৎকারিণী কোনো জবাব দিলেন না সে কথার। বল্‌লেন—বেলা যে আর নেই রে।

সন্ধ্যে হয়ে গেলে যে কি হবে প্রভঞ্জনের তা জানতে বাকী নেই। ছেলেবেলা থেকে বিধবা মায়ের ছায়ার মত অনুচর সে। মায়ের প্রতিটি হাঁচি কাশি পর্যন্ত তার সুজ্ঞাত। মায়ের নিয়ম-আচার তার নখদর্পণে। তিনি সন্ধ্যার পর ফলমূল ছাড়া আর কিছুই খান না। এবং ছেলেকে পাশে বসিয়ে খাওয়ানো তাঁর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। তেমন দেরি হলে সেদিন আর তিনি অন্ন গ্রহণ করেন না।

প্রভঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বল্‌ল—এখনও খেতে দাও নি, হ্যাঁ মা। বিয়ের আনন্দে খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠ্‌লেই হয়েছে আর কি।

মায়ের চোখে মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বল্‌লেন—অনর্থক অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে রঙ্গ করিস নে। আজও যে ওই কথাটা উঠ্‌লেই ভরোথীর কথা মনে পড়ে। ভগবান বুঝি ভুল করেই ওকে সাহেবের ঘরে

পাঠিয়েছিলেন। আহা অমন লক্ষ্মীর মত শ্রী আজকাল আর আমাদের ঘরেও দেখা যায় না।

একটা চাপা নিশ্বাস সহসা চমৎকারিণীর বুক ঠেলে উঠ্‌ল তারপর শূন্যের বায়ুস্তরে ক্ষীণ তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও এই নিশ্বাসটুকু তিনি গোপন করতে পারলেন না।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে প্রভঞ্জন বলল—স্থাখো মা, বিলেত যাবার আগেই তাহলে একটা বিয়ের ঠিকঠাক করে ফ্যালো!

বিস্মিত হয়ে চমৎকারিণী ছেলের মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে বুঝলেন যে প্রভঞ্জনের এ কথার মধ্যে গুরুত্ব রয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন—কেন রে?

—সবাই যখন চায়!

—কিন্তু তুই তো চাস না?

—একলার মতটা গায়ের জোরে সবাইকে গিলিয়ে দেবো—সবাই তা শুনবে কেন?

—কিন্তু সবাই মিলে তাদের মতটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে তুমি সেটা মেনে নিতে পারবে কি? তারা ত কেবল মতামত দিয়ে ছুটি, দায়িত্ব ত তোমারই!

পরক্ষণে তিনি থালার পানে চেয়ে বললেন—ও কী রে, কিছুই যে ছুঁস নি। এর জন্তে খেতে বসা কেন? দিন দিন তোর পাখীর আহার হয়ে উঠছে যে! আর ছুটি ভাত দৈ দিয়ে মেখে নে।

প্রভঞ্জন মৃদু হেসে বলল—এখনই আবার বেরুতে হবে যে। হ্যাঁ, শোনো —ভেবে দেখলাম, বিলেত যাওয়ার আগে বিয়েটা সেরে যাওয়াই সবদিক দিয়ে নিরাপদ।

মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল—কেন, আমি কি কোনোদিন অবিশ্বাস করেছি তোকে?

—না, মা সেজন্তেই ত বেশি ভয়। শেষে যদি তোমার মর্যাদা রাখতে না পারি?

—বুঝব ভগবানের অভিপ্রায় আলাদা। সবচেয়ে কষ্ট হয় যখন মনে পড়ে সে মেয়েটির কোনোই দোষ নেই। সে যে সত্যিই দেবী। জানি সে আমাদের চেয়ে অনেক—অনেক বড়! নইলে আজও সাত সমুদ্রের পারে থেকে নিজের নিষ্ঠাকে এতটুকু ছোট করে নি!

প্রভঞ্জন অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

নীলাম্বর দৌড়ে এসে খবর দিল—মামাবাবু, টেলিফোন ঝন্-ঝন্ করছে।

প্রভঞ্জন ত্বরিত পদে উঠে চলে গেল।

মধ্যপথে পার্বতী অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল—দাদা, তোমায় কে একটি মেয়ে ফোন করছে।

একবার বোনের দিকে তাকিয়ে প্রভঞ্জন রিসিভারটা হাতে তুলে নিল,—হালো, হ্যাঁ আমি! আপনি? ও, নমস্কার রমিতা দেবী! আবার কি হয়েছে? কিন্তু আজ ত আমার মোটে অবসর দেখছি না। না, না, তা নয়। আমি কথা দিতে পারছি না, তবে হ্যাঁ চেষ্টা করব। ভাববেন না, একটু সামলে থাকতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আজ আর কোনো কাজ নয়—বিশ্রাম নিন। আচ্ছা, নমস্কার।

ল্যাবরেটরীর কর্মব্যস্ততায় ডাক্তার সরকার নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। অসংখ্য মানুষেরই বিচিত্র পরিচয় এখানে এসে ধরা দেয়। প্রত্যেকের শিরা ধমনীর রক্তস্রোতে যে সংবাদ বাহিত হচ্ছে তা ক'জন জানতে পারে! এক একটা বিশ্লেষণে এক-এক রকম ফল দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার গভীর মনোনিবেশে প্রত্যেকটি নিরীক্ষণ করছে।·· মানুষের রক্তপ্রবাহে জটিলতার অন্ত নেই। তার মধ্যে কত বিচিত্র ব্যাক্‌টেরিয়া প্রতিনিয়ত জীবন লাভ করছে, কত মরছে! এই অনন্ত জীবন-মৃত্যুকে ধারণ করে মানুষ কোন্ পথে চলেছে অন্ধ শক্তির আকর্ষণে। প্রতিদিন পরীক্ষায় বিষাক্ত রক্তের নমুনার সংখ্যা বাড়ছে। সম্মুখে রয়েছে আরও—আরও জটিল সমস্যায় ঘনীভূত ভবিষ্যত, জাতির ভাগ্যে স্বাস্থ্যহীন মর্কটের আবির্ভাব সূচিত করে। সমাজের স্তরে স্তরে যে পার্থক্য এতদিন একদল মানুষকে সুখী রেখেছিল, আর একদলকে রেখেছিল অন্ধকারে নীচের তলা অত্যাচারে তাদের জীবন আচ্ছন্ন ছিল আজ

কোন এক অলক্ষ্য শক্তির অলঙ্ঘ্য নিয়মে তারা দুইদল মিশে যেতে বসেছে। রোগ উঠে এসেছে সমাজের ওপর তলায়। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ দুইয়ে মিলে এনে দিয়েছে মানুষের মনে শিথিলতা! অথবা এরা সব আগেও ছিল—অন্য কক্ষে বিচরণ করত। মানুষের এই বিকৃতির পরিচয়-বিশ্লেষণই সব কিছু গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। এই কী খ্যাতির মূল্য? প্রতিদিন অসুস্থ মানুষের ভিড় বাড়ছে—আরও খ্যাতির সঙ্গে আরও অনেক এমনতর রোগীরই দেখা পেতে হবে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে প্রভঞ্জনের। সেই রুদ্ধ শ্বাসের নীচে সূক্ষ্ম আত্মপ্রসাদের ধারা ক্ষরিত হয়—ভগ্নস্বাস্থ্যকে সুস্থ করার কল্পনায়ও আনন্দ আছে বই কি!

ডাক্তার সরকার লিখে যাচ্ছে পরীক্ষার রিপোর্ট। তার মনের মধ্যে চলেছে একটা প্রতিক্রিয়া। এই মুহূর্তে সে ভুলে গিয়েছে বাইরের পৃথিবীর কথা, যেখানে সুস্থ মানুষ প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রামে নিয়োজিত করছে নিজের নিজের শক্তিকে, যেখানে তাদের আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দিনরাত্রি চলছে আপন নিয়মে—সেখানকার কথা ভুলে গিয়েছে ডাক্তার সরকার। তার মনে হচ্ছে মানুষ নিজের বর্তমান, ভবিষ্যতকে একটা যন্ত্রণার কাতরতায় ভরে দেবার জন্য প্রস্তুত। পরক্ষণে মনে হয় তার, যারা রক্ত পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসা করাতে চায় তাদের সংখ্যা ত কম, প্রায় নগণ্যই বলা চলে। কিন্তু এ ছাড়া যারা অশিক্ষার অজ্ঞতায় ব্যাধির যন্ত্রনার বোঝাকে ভাগ্যের দুষ্ট চক্রান্ত বলে উপেক্ষা করে যাচ্ছে তাদের সংখ্যার সীমা কোথায় কে বলতে পারে! তারা কি করছে? ডাক্তার সরকার হাসপাতালের খবর জানে। সেখানে এসব রোগের তেমন যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করা হয় কি? হাসপাতালে সাধারণত ছাত্ররা অথবা যদি কোনো ডাক্তার দেখেন, তাঁরা সব সময়েই রোগীদের অবজ্ঞা করে থাকেন। রোগীদের তাঁরা নৈতিক উপদেশ দিতে গিয়ে এমন তিরস্কার করেন যে, তারা অনেকেই সেখানে যেতে ভয় পায়।

একতাড়া কাগজপত্র দেখেশুনে সই করে ডাক্তার সরকার যখন ঘাড় তুলে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করল তখন রীতিমত রাত্রি হয়েছে। সামনে

স্তূপীকৃত কাচের টিউব এবং রাসায়নিক সরঞ্জামের মিলিত তীব্র গন্ধে নাসারন্ধ্র যেন জ্বালা করতে থাকে। একখানা ওষুধের বিজ্ঞাপনওয়ালা আমেরিকান জার্ণাল পড়ে ছিল মাটিতে, সেখানা কুড়িয়ে রাখতে রাখতে প্রভঞ্জন ভাবে—এত মানুষ যে এইভাবে অস্বাস্থ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের ঠেকাবার কি কোন উপায় নেই! অসহায় ভাবে নিজের মনে সে হাতড়ে বেড়ায়! Medical science honour the genuine rights of facts. অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কথাই আজ মনে পড়ছে! তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে কোনো পথ খুঁজে পান নি। তাঁরা শুধু এইটুকুই জেনেছেন যে রোগ হলে কি উপায়ে চিকিৎসা করা চলে—কিন্তু তাঁরা কেউ দেখতে পান নি কি করে এই মারাত্মক রোগটিকে প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু উপায় একটা আবিষ্কার করতেই হবে। এই নিয়েই ডাক্তার সরকারের গবেষণা। প্রতিদিন এই একটি বিষয় তার সকল চিন্তাকে ছাপিয়ে ওঠে। মানুষ বাঁচুক, সুস্থভাবে বাঁচুক মানুষ।

ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে প্রভঞ্জনের মাথা যেন বেশ হাল্‌কা বোধ হয়। ল্যাবরেটরীর খোলসপরা সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবটি অন্তর্হিত হয়েছে, মুখের ওপর একটা চিন্তার ছায়া ছাড়া আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। সহসা যেন নিজের কাছ থেকে তার মুক্তিলাভ ঘটেছে। চিন্তার গুরুভার একপাশে সরিয়ে দিয়ে প্রভঞ্জন একটা চুরুট ধরাল।

রোগী দেখার পালা।

আজ নিজেকে বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে। ঘুমে চোখ দুটো বুজে আসতে চায়। এখনও পর পর পাঁচটা রোগীর বাড়ী যেতে হবে। মনে মনে প্রভঞ্জন ভেবে দেখল—না, এতগুলো case হাতে নেওয়া ঠিক হয় নি! এতে করে রোগীদের ওপর অবিচার করা হয়। ভালো ভাবে তাদের চিকিৎসা না করলে নিজেরই বিবেকে খোঁচা লাগে। অথচ উপায় নেই। কেউ একবার এলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। তাদের মুখচোখে কাতরতা ফুটে ওঠে, প্রত্যাখ্যানের আভাষে সেটা আরও করুণ দেখায়।

আজ তার সবচেয়ে কষ্ট হল রায় বাড়ির তিন মাসের একটি শিশুকে

দেখে। তার গায়ে ঘা, প্রবল জ্বর—আজকেই একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁচবার নাকি আশা নেই।

বাচ্চার মা কেঁদে প্রভঞ্জনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল—ডাক্তার বাবু, আপনি বাঁচিয়ে দিন আমার খোকাকে, আপনার পায়ে পড়ি। হোক না আমার কানা-খোঁড়া, ওকে আপনি বাঁচান, দোহাই ডাক্তার বাবু! বাঁচবে ত? খোকা বাঁচবে না?

প্রভঞ্জন বিষণ্ণ হেসে বলল—আপনি উঠুন, ছেলেকে বাঁচাতে চাইলে ত শক্ত হতে হবে মা'কে।

মেয়েটি বলল—এই ত শক্ত হয়ে আছি। চোখের সামনে ছেলের চোখ খসে গেল চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তবু বেঁচে আছি—আর কি করে শক্ত হয়! ও আপনিও বুঝি ওই দলের? দোহাই ডাক্তার বাবু, খোকাকে মেরে ফেলবেন না।

প্রভঞ্জন সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু মেয়েটি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল—আপনি জানেন না, ওরা সবাই খোকাকে ঘেন্না করে। খোকার গায়ে নাকি বিশ্রী ঘা। ওর গায়ের দুর্গন্ধে কেউ কাছে আসে না। আমাকেও ওরা ঘেন্না করে সবাই। ডাক্তার বাবু আপনি অমন পাথরের মত চুপ করে আছেন কেন? আপনাকে ওরা টাকা দিয়ে এনেছে বলে যেন ওদের কথা শুনে খোকাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবেন না—আমি, আমি আমার গায়ের যা কিছু গয়না আছে সব খুলে দেবো। খোকাকে বাঁচিয়ে দিন আপনি। মায়ের মুখ চেয়ে ছেলেকে বাঁচালে ভগবান আপনার ভালো করবেন। আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু।

প্রভঞ্জন ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি টেনে আনে—ডাক্তার-সুলভ স্বল্প হাসি। সে বলে—ব্যস্ত হবেন না। ছেলে আপনার সেরে উঠবে বই কি।

হাসি-কান্নায় মায়ের চোখ ছলছলিয়ে আসে। ভালো হবে! ভালো হবে! সত্যি আপনি ভালো করে দেবেন?

মনে মনে প্রভঞ্জন হতাশ হয়ে পড়ে—এই বিকলাঙ্গ শিশু বেঁচে থেকে পৃথিবীর বিড়ম্বনার ভারই বাড়াবে!

বৈঠকখানা ঘরে এসে ডাক্তারকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে গৃহস্বামী চিন্তান্বিত ভাবে বললেন—কেমন দেখলেন ?

প্রভঞ্জন সে কথার জবাবে বললে—এটিই প্রথম সন্তান ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সবে দেড় বছর ছেলের বিয়ে হয়েছে। বৌমা আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে ডাক্তারবাবু। কিন্তু—।

—এ সম্বন্ধে আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ছেলে যদিও বাঁচে কোনো কাজে আসবে না। ওর চোখ দুটো ত নষ্ট হয়েছেই—আরও কি যে হবে বলা যায় না।

—তাহলে অনর্থক বাঁচিয়ে ওকে কষ্ট দিয়ে কি হবে ?

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে 'হুঁ' বলেই থেমে গেল। অধিক কিছু মন্তব্য সে করল না। নিজে হাতে এই একটি মানুষের জীবনকে সমাপ্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে কি ? যদি বাঁচে তবে এই শিশুই একদিন সমাজের শিরায় সঞ্চারিত করবে বিষ। না, ঠিকমত চিকিৎসায় রাখলে ফল ভালো হতে পারে বই কি ! প্রভঞ্জন ভালো ভাবেই চিকিৎসা করবে।

গাড়িতে বসে প্রভঞ্জনের মনে হল—মানুষ বড় স্বার্থপর। নিজেরটুকু ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আসক্ত নয়। সমস্তটাই এদের আত্মসর্বস্বতা। এরা চায় না সবাইকে নিয়ে বাঁচতে। এরা পাশের মানুষের কথাটুকু পর্যন্ত ভাবতে ভুলে গেছে। স্বামী ক্ষমা করতে পারে না স্ত্রীকে—স্ত্রী পারে না স্বামীকে বিশ্বাস করতে। এরা দেখতে পায় কেবলমাত্র বর্তমানটুকু—ভবিষ্যৎ এদের কাছে অনেক দূরের। নিজের ভবিষ্যৎকে এরা ঠকায় বর্তমানের মোহে।...এই শিশুটি, এর মা—এদের ওপর কি সুবিচার করল পৃথিবী ! এরা জানে না কেন অপরের অর্জিত ব্যাধির ফল ভোগের দায়িত্ব এলো এদের ভাগ্যে। কেন একটি অজ্ঞান শিশুকে মানুষের চক্রান্ত বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত ? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্য কোন্ আদালতে আর্জি জানাতে হবে শিশুটি কি জানে ! অন্ধকার গাড়িতে একলা ষ্টিয়ারিং ধরে সামনে শূন্য দৃষ্টিতে প্রভঞ্জন তাকিয়ে থাকে। তার সামনে পথের অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু দুটি চোখ—করুণ আকুতির আবেদনে সজল

সৃষ্টি করা নরক মুখচ্ছবি। মানুষের আকুলতায় বিধাতার অনুশাসনকে লঙ্ঘন করার দুঃসাহস জেগে উঠেছে মানবীর মর্মে।

ল্যাবরেটরীতে আবার ফিরে এলো প্রভঞ্জন। ডাক্তারখানায় আজ আর এ বেলায় সে যায় নি। ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে—শরীর খারাপ। অন্ত যে সব রোগী দেখতে যাবার কথা ছিল সেসব জায়গায় যাওয়া চলবে না—কারফিউ। স্বদেশী সরকারের আইন অমান্য ক'রে ছাত্ররা শোভাযাত্রা করতে চেষ্টা করেছিল। অতএব কর্তৃপক্ষ আত্মরক্ষার জন্য গুলী চালাতে বাধ্য হয়েছিল।

ডায়েরী লিখতে বসল ডাক্তার সরকার।

···কিছুদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান যুগে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ জন্ম-হার কমাবার জন্য মনে মনে সচেষ্ট। তারা সহজ পথটা দেখতে পায় না। তারা যথেচ্ছভাবে দৈনন্দিন জীবন কাটিয়ে দিয়ে অবশেষে বিপদের সামনে পড়ে তারা অবশ্যম্ভাবী সন্তানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অপসারণ করতে চায়। এটা ক্ষতিকর তা তারা বুঝেও বুঝতে চায় না। আর্থিক অস্বচ্ছলতার চাপে অনেক কিছুই অগ্রাহ্য করছে সবাই। তারা ভাবে—একটি ছেলে অথবা মেয়েকে মানুষ করার দায়িত্ব বড়ই গুরুভার। কথাটা সত্যি। খুব কম করে ভারতের চার থেকে সাড়ে চার কোটি লোকের একবেলার বেশি আহার জোটে না। কিন্তু একটা কথা অনেকেই জানে না যে, কেবলমাত্র জন্মশাসন দিয়ে মানুষের খাদ্যহার বাড়ানো যাবে না। জন্মহার কমছে এবং দারিদ্র্যও বাড়ছে। খাঁটি সত্যি কথা বলতে গেলে, মুষ্টিমেয় কয়টি অবস্থাপন্ন এবং মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্যক্ষেত্রে চিকিৎসার চেয়ে বেশি দরকার খাদ্যের।

আমি জানি, এদেশে আমার এই বিশেষ ধরণের চিকিৎসার দরকারই হত না। এলো দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধ। দুর্ভিক্ষ টেনে এনেছিল একশ্রেণীর মানুষকে অভাবের চরম সীমায়। আর একদিক থেকে যুদ্ধ এনে দিয়েছিল অর্থের প্রাচুর্য অন্য শ্রেণীর হাতে। যারা অর্থ পেল তারা সেই হঠাৎ-পাওয়া টাকা দিয়ে একটা কিছু আনন্দের সন্ধান করল—অপরপক্ষ খাদ্যের আশায় কখনও গোপনে, কোথাও বা প্রকাশ্যেই ইজ্জতের খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারা বাঁচতে চায়, খেয়ে প'রে।

ডায়েরী লিখতে লিখতে ডাক্তার সরকার কলম থামিয়ে পাতা ওল্টালো। আবার তার লেখনী চলতে লাগল শুভ্র কাগজের ওপর সারি সারি কালো সৈনিকের মত অক্ষর সাজিয়ে।

…আজ আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে ওই বিষজর্জর কচি শিশুটিকে দেখে। একে বাঁচিয়ে লাভ নেই—কিন্তু মেরে ফেলতেও ইচ্ছে করে না। ছেলেটি যদি অন্ধ না হত তবে তাকে বাঁচাতাম। কিন্তু এখন আর ওর চোখ ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।…রমিতা মজুমদার আমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর চিকিৎসা মানসিক পথ ধরে হওয়া দরকার। ওর ধারণা হয়েছে সমাজকে ভেঙেচুরে দিয়ে নূতন করে গড়তে হবে—এটাও মানসিক বিকার। খুব সাবধানে ওর এই মনের গতি একটু একটু করে ফিরিয়ে আনতে হবে। অথবা ওর চিকিৎসার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু বাদ দিলে ক্ষতি বই লাভ নেই। She is spoiling a lot of young men.…

প্রভঞ্জন ডায়েরী লেখা বন্ধ করে ড্রয়ারে রেখে দিল। তারপর আগামী কালের কাজের হিসাব নিকাশ করতে করতে বেরিয়ে এল বাইরে।

পথে বিশেষ লোক নেই। রাত অনেক। ক্লান্তিতে প্রভঞ্জনের চোখ দুটো ভারি হয়ে এসেছে। হাত দুটো ষ্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে নেমে পড়বে বলে আশঙ্কা হচ্ছে তার। সামনে থেকে এক জোড়া হেডলাইট চোখের ওপর এসে পড়ল। সহসা প্রভঞ্জন সচেতন হয়ে মাথা নাড়া দিয়ে একটা হাত ব্রেকের ওপর রেখে সোজা হয়ে বসল। আপাত দৃষ্টিতে যে এ্যাসফ্যাল্টের রাস্তাটা সমতল মনে হয়, আলোর উজ্জ্বলতায় সেটা যে কত উঁচুনীচু আর বাঁকাচোরা তা ধরা পড়ছে। প্রভঞ্জনের ঘুমের ঘোর কেটে গেছে।

মন্দাকিনীর চিকিৎসাটা শেষ সময়ে খুব সমারোহ সহকারেই শুরু হল। এখন আর অনুকূলের হাতে পয়সার অভাব নেই। সে এখন স্ত্রীর চিকিৎসা এবং নিজের পান-ভোজনের ব্যবস্থা দুইই বেশ ভালো ভাবে বজায় রেখে চলছে। ভারবাণী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের সে একজন উপদেষ্টা এবং কত ব্যক্তি

বিশেষ। বাড়িতে থাকার মত সময় তার নেই বল্লেই হয়। একসঙ্গে দু'খানা ছবির কাজ চলছে—এ সময়ে স্ত্রীর শিয়রে বসে বসে ঔষধ খাওয়াবার তার সময় কোথায়! দু'জন নার্স রাখা হয়েছে আর বড় ডাক্তারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর চেয়ে আর কতটা সম্ভব! অনুকূল রাত্রে বাড়ি ফিরে নার্সের কাছে সারাদিনের খবর নেয়।

অনুকূল কাছে গিয়ে বসলে মন্দাকিনী তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি দিয়ে যেন তাকে লেহন করে। শান্ত স্তিমিত কণ্ঠে এক সময়ে প্রশ্ন করে—হাঁ গো ক'টা বাজল?

বাসাডেরা পাহাড়ের নীলাভপুষ্পগুচ্ছের মত সে কণ্ঠস্বরে মায়া ঝরে পড়ে। কলকাতার এই ইলেক্‌ট্রিক লাইটের সঙ্গে এর যেন কোন সামঞ্জস্য হয় না।

অনুকূল নির্লিপ্ত ভাবেই বলে—সাড়ে এগারোটা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্দাকিনী অনুকূলের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে রাখে। ধুক্‌ধুক্ করছে শ্বাসতরঙ্গ। এককালে যে সেখানে বর্ষার প্রচুর প্রাণবন্যা উত্তাল হয়ে উঠেছিল তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

আস্তে আস্তে মন্দাকিনী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বলে—আমাকে নিয়ে আরও কত কষ্ট তুমি পাবে। সেই সকাল থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী। তোমাকে দেখলে আমার আরও কষ্ট হয়। সত্যি তোমার জীবনে আমি একটা বিড়ম্বনা হয়েই রয়েছি। এখন যাও শুয়ে পড়ো—আবার ত ভোর না হতেই ছুটবে!

অনুকূল বলে—আমার কর্তব্য ত সব সময় তোমার কাছে থাকা। কিন্তু কার্যগতিকে সবই বদ্‌লে গেছে।

—না, না আমার কাছে থাকতে হবে না—শেষে তুমিও যদি অসুখে পড়ো ত কে দেখবে? যাও ঘুমোও গে। আমার কাজ ত নার্সরাই করে।

অনুকূল চলে যায়। এই এক ভাবেই ওদের দিন কাটছিল।

সেদিন অনুকূল একটু আগেই বাড়ি ফিরেছিল। হাতমুখ ধুয়ে সে যখন মন্দাকিনীর কাছে এসে বসল তখন সবে মাত্র সাড়ে নটা বেজেছে।

মন্দাকিনী বলল—আজ একটু গান শোনাবো তোমায়।

অনুকূল হেসে জবাব দিল—তোমার ওই গানই ত আমাকে একদিন পাগল করেছিল। তুমি সেই যে গেয়েছিলে, যেন তোমার সমস্ত দেহ মন, গেয়েছিল। আমি পাগল হয়ে গেলাম সেদিন।

শীর্ণ মুখের ওপর কালো চোখের গভীর চাহনি যেন কিসের দ্যুতি দিয়ে যায়। মন্দাকিনী বলল—শোনো তবে—

অনুকূল বলল—কিন্তু ডাক্তার যে তোমায় বেশী কথা বলতে বারণ করেছে।

অনুযোগের সুরে ক্ষীণ কণ্ঠে মন্দাকিনী বলল—তোমার ডাক্তার কিছু জানে না। আমার আজ গান গাইতে ইচ্ছে করছে বড্ড!

অনুকূলকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ও গাইতে শুরু করল—

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,

বার কয়েক এই চারটি কলি গেয়ে মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

অনুকূল তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল—শান্ত হয়ে ঘুমোও মন্দা।

মন্দাকিনী অধীর ভাবে বলে—আর মনে পড়ছে না কেন? কই আর সব কলিগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়েছে! ভুলে গিয়েছি।

শীর্ণ মুখের ওপর আয়ত দুটি চোখের কোলে কোলে অশ্রু ছলছল করছে। অসহায় মূক ওর সত্তা গুমরে মরতে চায় যেন। তারপর মন্দাকিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

অসহায় ভাবে অনুকূল ঘরের চারদিকে দৃষ্টিপাত করে।

মন্দাকিনী কাঁদতে কাঁদতে বলল—আর নয়, আর আমি বাঁচব না গো, গান ভুলে গেলাম। এ সেই গান, যেটা গেয়ে রোজ রাত্রে আমি ঘুমোতে যেতাম। যে গানের সুরে আমার মন শান্ত হয়ে যেত। এলিয়াসের মুখখানা যেন কাছে দেখতে পেতাম এই গানের মধ্যে দিয়ে। সেই গান হারিয়ে গেল! হারিয়ে গেল।

তারপর কখন মন্দাকিনী ঘুমিয়ে পড়েছিল, কখন যে অনুকূল চলে গেছে মন্দাকিনী কিছুই টের পায় নি। ওর ঘুম ভেঙে গেল নিশুতি রাতে। কেউ নেই—কেউ ত নেই তার বিছানায়। ঘাড় তুলে চেয়ে দেখল ঘরেও কেউ নেই। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আস্তে আস্তে ডাকল নার্সকে—কুন্দদিদি! কুন্দদিদি!

সাড়া নেই। বোধ হয় নার্স ঘুমিয়ে পড়েছে।

অসুখের আগে থেকে প্রতিনিয়ত একটা প্রশ্ন মন্দাকিনীর মনকে আলোড়িত করত—এবং আজ পর্যন্ত যা অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছে।

এই নিশুতি রাতে নিজেকে আবার সেই প্রশ্নই করে—আচ্ছা, এটা কেমন ক'রে হয়? এলিয়াস কেমন ক'রে অনুকূল হয়ে গেল! অনুকূল আর এলিয়াস আজ কি ক'রে আমার চোখে এক হ'ল!...পরক্ষণে ওর মনটা নিজের কাছেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল। এবার যেন তৃষ্ণার অনুভূতি আরও অস্থির করে তুলল ওকে।

আরও একটু জোরে ডাকল মন্দাকিনী। পাশের বাড়ী থেকে কর্কশ কণ্ঠে ভেসে এল - আ মরণ! রাতদুপুরে এই এক জ্বালা হয়েছে। ছেলেটা যদি বা ঘুমোলো, এখন শুরু হল পেত্নীর কান্না।

ভারী গলায় কে বলল—আঃ, কেন এ সব বলো! বেচারী মরছে নিজের জ্বালায়।

কর্কশ নারীকণ্ঠে তার প্রতিবাদ শোনা যায়—তোমার যে দেখি দরদ উপ্‌ছে পড়ছে।

তারপর আবার সব চুপচাপ।

মন্দাকিনীর কথা কইতে সাহস হয় না। নিজের উপর ধিক্কার দিতে

দিতে ও পাশ ফিরল। পৃথিবীর সকলের কাছেই ওর অপরাধ অন্তহীন। কোনোদিনই ও কাউকে আদেশ করতে জানে না। নার্সকে শাসন করা ত দূরের কথা, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নার্সকে কিছু বলেও না মন্দাকিনী।… খুব কষ্ট হচ্ছে, গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে ওর মনে পড়ে গেল—

মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বনপর্বত
মোর বীর্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়।

আবেগের আতিশয্যে মন্দাকিনীর শীর্ণ কণ্ঠে এক আশ্চর্য শিহরণের লহর উঠল। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে অনুকূলকে শুনিয়ে আসে গানের এই কয়টি কলি। তৃষ্ণার কথাটা একেবারে ভুলে গেল ও।

কতদিন বিছানায় পড়ে আছে মন্দাকিনীর ঠিক মনে পড়ে না, উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না একবারও সেকথা মনে হ'ল না। অন্তরের উদগ্র আকুলতায় ও পেল অমিতশক্তি, নিমেষের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কোলে চকিত বিদ্যুতের মতই মন্দাকিনীর শক্তিটুকু নিমেষেই নিঃশেষ হ'ল। মন্দাকিনীর অবশ দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কয়েক মুহূর্ত ওর আর কোনো জ্ঞান ছিল না। যখন চোখ মেলে তাকাল তখন ও বুঝতে পারল ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আছে। মাথার উপর কে যেন হাতুড়ির ঘা মারছে—অসহ্য যন্ত্রণা। ইতিমধ্যে নার্স ছুটে এসেছে। অনুকূলও এসে বসেছে মন্দাকিনীর পাশে।

মন্দাকিনীকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে অনুকূল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। সে কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলল—তুমি হঠাৎ ওভাবে উঠে কি দেখতে গিয়েছিলে? ডাকো নি কেন কাউকে?

বিভ্রান্ত অর্থহীন দৃষ্টিতে মন্দাকিনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর কাছে এসব প্রশ্ন যেন নিরর্থক।

অনুকূলের ঠোঁটের ডগায় একটা প্রশ্ন উন্মুখ হয়ে ছিল, কিন্তু মন্দাকিনীর

চাহনী দেখে সে চুপ করে রইলো। মন্দাকিনী হাঁ করে কি যেন বলবার চেষ্টা করল। অনুকূল বল্‌লে—জল খাবে?

তারপর নার্সকে ইসারায় জল দিতে বল্‌ল। নার্স ব্যস্ত হয়ে ফিডিং কাপটা মন্দাকিনীর মুখের কাছে ধরল, মন্দাকিনী মুখ বুজে তাকিয়ে রইল অনুকূলের পানে। অনুকূল প্রশ্ন করলে—কি হল, জল খাবে না?

মন্দাকিনীর চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা নেমেছে। ওর রোগপাণ্ডুর কপোলপ্রান্ত আবেগে থরথর করে কাঁপছে—অশ্রুবিন্দুও যেন সেই সঙ্গে কাঁপছে।

অনুকূল নার্সের হাত থেকে ফিডিং কাপ টেনে নিয়ে নিজেই মন্দাকিনীর মুখে ধরল।

কান্নার বেগ বিন্দুমাত্র প্রশমিত হল না। বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত অশ্রুপ্রবাহে মন্দাকিনীর শীর্ণ দেহ ভেসে যাবে নাকি! মন্দাকিনী নিজেকে সংযত করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যত বার ও হাঁ করবার চেষ্টা করে ততবারই কি এক অবাধ্য আবেগের ধাক্কায় ঠোঁট দাঁত জিভ আড়ষ্ট রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

অনুকূল ডাকল—মন্দাকিনী!

কণ্ঠস্বর তার সেই আবেগস্পর্শপ্রভাবে কম্পিত।

মন্দাকিনী অশ্রুরুদ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

অনুকূল বল্‌ল—জল খাবে না! খাও।

মন্দাকিনী তবুও দৃষ্টি নত করে না। একভাবে চেয়ে থাকে। দুচোখে অশ্রু—ও যেন দু'জনের মধ্যে সাগরের ব্যবধান এনে দিয়েছে। তবু ওই অশ্রুর ওপারে যে চাহনী ভাস্বর সে যেন অনুকূলের অন্তরের গোপনতম প্রদেশের সকল খবর পেয়েছে। মন্দাকিনীর এই অশ্রুতে যে [illegible] ভাব-বৈষম্য পরিস্ফুট হয়েছে তার অর্থ বুঝতে অনুকূলের কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না —তবু যেন সে নিজেকে প্রতারিত ক'রে বল্‌ল—কিছু বলছ?

তার কণ্ঠস্বরে একটা শূন্য অসহায় ভাব। এ ভাবে সে ত কোনদিন ধরা দেয় নি। সে কাতরকণ্ঠে বলে—আমায় ক্ষমা করো মেরী।

মন্দাকিনীর অশ্রু যেন পাষাণ হয়ে যায়। সহসা রূপান্তর ঘটল যেন। আর সে ওষ্ঠপ্রান্তে কম্পন নেই, কোনো শি[illegible] লেশমাত্র কিছু নেই। শুধু অনুকূলের অসাবধানতায় জলপাত্র হতে কয়েক বিন্দু জল মন্দাকিনীর কণ্ঠদেশে পড়েছিল সেটুকু ওর কালো মসৃণ ত্বকের ওপর মুক্তোর মত টল্‌টল্‌ করছে।

অনুকূল গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে—ওর বুক বেয়ে একটা বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সেই সঙ্গে এনে দিল অসীম অবসাদ।

মন্দাকিনীর শেষ অভিমান অনুকূলের জীবননাট্যে বড় একটা অঙ্কের যবনিকা টেনে দিল।

অনুকূল আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে তারা ঝক্‌-ঝক করছে। চাঁদ এখনও ঝলমল করছে। সকাল হতে [illegible]ক দেরি।

ভোরের প্রথম আলো তখনও কলকাতার পথের সুপ্তির শান্ত পরিবেশকে স্পর্শ করে নি। পরিবর্তন প্রাত্যহিক স্নানের পর ছাদের ওপর গিয়ে বসল—এই সময়টুকু তার একান্ত আপনার। আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে পরিবর্তন উপাসনা করে। শুধু আজ কেন, জীবনের অনেকখানিই তার কেটেছে সেই নির্ভীক দার্শনিক শঙ্করের কথা ভেবে। পরিবর্তনের কণ্ঠ থেকে গম্ভীর নাদে ধ্বনিত হয়—জয় শঙ্কর।···ত[illegible]র শুরু হয় স্তোত্রপাঠ।

> প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
> সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
> [illegible] প্রজাগরসুষুপ্তমবৈতি নিত্যম্
> ত[illegible]ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ॥
> প্রা[illegible]র্ভজামি মনসাং বচসামগম্যম্
> [illegible]চোবিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ
> যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচং-
> স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্॥

প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণংসনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্ত্তৌ
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ॥

ঠিক এমনি সময়ে নীচের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। একবার, দু'বার, তিনবার। এমন অসময়ে কে? পরিবর্তন অনুমান করতে পারে না, অবশ্য তার জন্য ব্যস্তও নয় তার মন। সে আপন মনে স্তব পাঠ করতে করতেই নীচে নেমে গেল।

দরজা খুলে দেখল রুক্ষমূর্তি অনুকূল নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। পরিবর্তন নিজেও অনুকূলের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে ছিল কিছুক্ষণ, তারপর সে বল্‌লে—এস অনুকূল! এত ভোরে যে!

অনুকূল তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল। পরিবর্তন শুনতে না পেয়ে প্রশ্ন করে—কি বল্‌লে? রাত্রে বিশ্রাম পাওনি দেখছি। চলো আমার ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর কথা হবে।

এবারে অনুকূল স্পষ্ট করেই বল্‌ল—না, বিশ্রামের সময় নেই। একবার দিদির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পরিবর্তনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সে কতকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতেই বলে—এখন? সে এই ত ঘণ্টা খানেক দেড়েক হবে ঘুমিয়েছে। তোমার শরীর ত তেমন ভালো মনে হচ্ছে না বাবা, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। ভেতরে এসে জিরোও আমার ঘরে। সকালেই ত সান্ত উঠ্‌বে। এখন আর ওকে ডেকে কাজ নেই।

অনুকূল হাসল—তার সে হাসি অদ্ভুত। বিস্ময় নেই, আনন্দের লেশমাত্র নেই সে হাসিতে, একটা অতি পরিচিত উপেক্ষার হাসি। পরিবর্তনের মনে হয় এ যেন রমিতার হাসি—গভীর রাত্রে হঠাৎ এই ধরণের হাসিই রমিতা হাসে। এ হাসিকে পরিবর্তন বড় ভয় করে, তার বিশ্বাস অপ্রকৃতিস্থ মানুষের চরম তিক্ততার অভিব্যক্তি এ হাসি। পরিবর্তন অনুকূলের হাত চেপে ধরে—অমন করে উড়িয়ে দিও না অনুকূল। পৃথিবীতে যতক্ষণ আছো ততক্ষণ

তুমি পার্থিব সুখদুঃখের অতীত নও। এস আমার সঙ্গে। তোমার কি বলবার আছে পরে সুস্থ হয়ে শুনিয়ো। এখন এস।

অনুকূল হাসি থামাতে পারে না—জ্যাঠামশাই, আপনার বিশ্বাস হয়েছে বুঝি আমি নেশার ঝোঁকে যা তা বল্‌ছি'! না, না ঘাবড়াবেন না অত।

পরিবর্তন সে কথার জবাব দিল না। শুধু তার মনে হয়, এই অনুকূল, রমিতার মত একদল মানুষ দুনিয়ার সবকিছু বুঝি হেসেই উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু ওরা ত জানে না যে এ প্রবাহে তারাই ভেসে চলেছে, পৃথিবীর গতিপথ কিছুমাত্র পাল্টায় নি!…কিন্তু ইদানীং পরিবর্তনের মনেও একটা সংশয়ের ছায়া পড়েছে, সত্যিই কি পৃথিবীর আপন কক্ষপথে অবিচ্যুত অবস্থায় রয়েছে? তাই যদি থাকবে তবে এরা কোন্ নিয়মে চলে? এই যাদের নিত্য নিজের চোখের সামনে দেখছে, আর সেই মিহিরলাল যে চলে গেছে দূরে, সে-ও ত এই একই পথের যাত্রী—এরা নিজেদের ভাগ্যকে কোন্ অন্ধকারের দিকে নিয়ে চলেছে!

অনুকূল এতক্ষণ কি বলে গেছে পরিবর্তন আপন চিন্তামগ্নতায় ডুবে গিয়ে সে সব কিছুই শুন্‌তে পায় নি। তার যখন খেয়াল হল অনুকূল তখন থেমে গিয়েছে।

পরিবর্ত্তনকে সপ্রশ্ন দেখে অনুকূল বল্‌ল—এখন এ অবস্থায় দিদির সাহায্য না পেলে আমি নিরুপায়।

পরিবর্তন বলে—হুঁ, কি বল্‌ছিলে?

অনুকূল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—আপনি কি ইচ্ছে করেই শোনেন নি আমার কথাগুলো?

—না, সত্যিই শুন্‌তে পাই নি।

অনুকূল আবার হেসে উঠল,—আজ রাত্রে আমার বৌ মারা গেছে, তাই দিদির কাছে একটু দরকার ছিল।

—ও, তোমার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে? তা সান্ত কি করবে। তুমি কি তার কাছে সান্ত্বনা চাও? তার চেয়ে আমাকেই তো শবযাত্রার জন্যে দরকার বেশি—চলো আমি যাবো।—জয় শঙ্কর!

—আজ্ঞে, আপনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন, তার জন্তে আমি মাঝে মাঝে লজ্জিত হয়ে পড়ি. আমি যে এ স্নেহের অযোগ্য! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, সৎকার সমিতির গাড়ী আসবে একটু পরেই। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে দিদির সঙ্গে একবার দেখা করি।

পরিবর্তনের সদ্যস্নাত স্নিগ্ধ চেহারা সহসা কঠিন হয়ে উঠল। সে বলল—তোমার অধিকার থাকে তুমি তাকে গিয়ে ডাকতে পারো, আমি অনুমতি দেবো না। সেও মানুষ—আর, সে অসুস্থ।

পরক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসবার সময় পরিবর্তন শুনতে পেল অনুকূল হাসছে। তারপর ছাদে কম্বলের আসনে বসে বসেও সে হাসি যেন স্পষ্ট ভেসে আসতে লাগল। মন্ত্রের গম্ভীর নাদে সেই অসহ্য অবজ্ঞার উপহাসকে ঢেকে দেবার জন্য পরিবর্তন উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল।

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গং নাহংকারঃ প্রাণবর্গোন বুদ্ধিঃ।

দারঃপত্যক্ষেত্রবিত্তাদিদূরঃ সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মাশিবোঽহম্।

আজ আর পরিবর্তনের উপাসনায় মন বসছে না। সে বার বার বর্তমানের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে বাধ্য হচ্ছে। সারাদিনের জন্য যে উদাসীনতা সংগ্রহ করবার প্রেরণা সে পেয়ে থাকে এই প্রভাতকালীন একাগ্রতায়—আজ তা ব্যাহত। অথচ এই সময়ের এই মানসিক স্থিরতাই সারাদিনের অসংখ্য বিসদৃশ ঘটনাকে উপেক্ষা করবার শক্তি দেয়। অনুকূল, রমিতা, মিহির সকলেই যেন তাকে উপহাস করছে। তার মনে হল অনুকূল, বুঝি এখনও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে। পরিবর্তন বসে থাকতে পারল না, আবার নীচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে চারদিকে দেখল—একখানা ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া পথে আর কিছু নেই। গাড়িখানার মাথায় মালপত্র বোঝাই। লোহা বাঁধানো চাকার ঘরঘর শব্দ পাক খেয়ে এগিয়ে চলেছে। আর শোনা যাচ্ছে অশ্বত্থপাতায় বাধাপাওয়া হাওয়ার শব্দ। আর কিছু নেই। পরিবর্তনের মনে পড়ে গেল অনুকূলের স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। অনুকূল সাহায্য চেয়েছিল। তাকে বিমুখ করেছে পরিবর্তন।

পরিবর্তন দোতলার ঘরে গিয়ে ডাকল—সান্তু, সান্তু!

রমিতা উঠে বসল। ঘুমের ঘোরে ওর হঠাৎ মনে হল যেন, কুমারী বেলার একটি দিন আজ। এখনই সুরু হবে দিনের আবাহনস্তোত্র। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে রমিতার ভুল ভাঙল। না, এটা পার্কিন্‌সন প্লেসের সাজানো ফ্ল্যাটের ঘর। তবে বাবা কেন তাকে ডাকলেন? এরকম ভাবে তিনি ত রমিতার ঘুম ভাঙান না। কতদিন পরে কত দূর থেকে একটা পুরাতন আহ্বান ভেসে এল। এককালে এই ব্রাহ্মমুহূর্তেই সান্ত্বনাকে শয্যা ত্যাগ করতে হ'ত পিতার আহ্বানে। এই ডাকারও একটা মাধুর্য আছে। সত্যি কতদিন পরে আজ এই ভোরের ডাক এসে পৌঁছলো।

পরিবর্তন বলল—শোন সান্তু, একবার তোমাকে যে অনুকূলের বাড়ি যেতে হবে মা।

অনুকূলের নামে রমিতার প্রসন্ন আয়ত-ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে যায়। ও প্রশ্ন করে—হঠাৎ এমন জরুরী তলব কেন বাবা?

পরিবর্তন বলে—সে এসেছিল একটা দুঃসংবাদ নিয়ে।

পিতার মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উন্মুখ হয়ে রমিতা বলে—আবার কি দুঃসংবাদ?

—তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে, তোমার সাহায্য চায়।

—অনুকূলের স্ত্রীবিয়োগ? ও বিয়ে করেছিল? কবে?

রমিতার এ প্রশ্নের জবাব পরিবর্তনের জানা নেই। সে চুপ করে থাকে। এ কথার পরও রমিতাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখে সে আবার বলল—মা, আমার অন্যায় হয়েছে। অনুকূলকে ফিরিয়ে দিয়েছি—তুই ঘুমোচ্ছিস বলে। এখন কিন্তু মনটা ভালো লাগছে না, তাই মনে করলাম যে, যাই সান্তুকে ডেকে বলি। সত্যি ও বেচারীর বড় বিপদ।

অনুকূলের উপর রমিতার ইদানীং আর তেমন ধারণা ভালো নেই। সেই ছবি বিক্রীর ব্যাপারটা রমিতার কানে এসেছে এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক উড়ো কথায় অনুকূলের প্রতি তার মন বিরূপ হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কারণ অনুকূল যে কিছুদিন থেকে তাকে এড়িয়ে চলছে এটা রমিতা

লক্ষ্য করেছে। আজ হঠাৎ বিপদে পড়ে অনুকূল এসেছিল এজন্য একদিক দিয়ে সে খুশি হল, তবে সে খুশিটুকু নিজের কাছে ধরা পড়ে না।

রমিতা বলল,—কিন্তু আমি যে তার ঠিকানা জানি না বাবা। মাস কয়েক আগে বাড়ি বদল করে সে অন্য পাড়ায় চলে গেছে শুনেছিলাম। আর, তার সঙ্গে আমাদের এমন কি ঘনিষ্ঠতা আছে যে—! যাক গে, সে না হয় বুঝলাম যে, মানুষ বিপদে সাহায্য চাইলে সব কিছুই ভুলে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে হয়। কিন্তু এখন তার ঠিকানা পাই কোথা থেকে? এই সাত সকালে কার কাছে যাবো?

হাল ছেড়ে দিয়ে পরিবর্তন বল্লে—তবে আর কি হবে? এখন ত আর কিছু উপায়ও দেখছি না। ছাখ দেখি মা, তখন বেচারাকে মিথ্যে ফিরিয়ে দিলাম!

তারপর নিশ্চিন্ত মনে পরিবর্তন চলে গেল ছাদের ছোট্ট কুঠ্‌রিতে, রমিতার কিন্তু আর ঘুম হল না। রমিতা ভাবতে লাগল নীড়-রচনা-প্রয়াসী মানুষের কথা। একবার নিজের মনের দিকেও জিজ্ঞাসু হয়ে ডুব দিল—বাসা বাঁধার সাধ কি এখনও মেটেনি?

জবাব এল—না, না, আর নয়। এখন শুধু ভাঙার পালা।

প্রশ্ন হল—আর কত ভাঙবে? এখনও ক্লান্তি আসে নি?

উত্তর পেল—ক্লান্তি ত আসবেই, কিন্তু দমলে চলবে না। মুখ থুবড়ে যখন পড়ে যাবে তখন বিশ্রাম। ব্রত ভুললে কি নিয়ে বাঁচবে?

আবার জিজ্ঞাসা—কিন্তু এ সর্বনাশা ব্রতের ফল কি? আর, একেই কি বাঁচা বলে!

এবার সমগ্র অন্তর রক্ত-দৃষ্টিতে প্রশ্নকে যেন উড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়—মৃত্যু! মৃত্যুর চেয়ে বড় কিছু নেই। আমার জীবনের সর্বনাশ দিয়ে বর্তমানকে ধ্বংস করব। যারা সে সর্বনাশ থেকে বাঁচবে তারা নতুন করে গড়বে আবার পৃথিবীকে।

—তার মানে এ নয় যে ভুলের বোঝা বাড়াতে হবে। ভুলটা বোঝবার চেষ্টা করা চাই। ভুল-চুকটাই ত সব নয়। ভুলচুক চোখে আঙুল

দিয়ে দেখানো এক জিনিষ আর ভুলের ফাঁদে নিজেকে টেনে আনা আলাদা কথা। এসব বাদ দিয়েও মানুষের পরিচয় আছে, আরো অনেক বড় পরিচয়।

—সেই পরিচয় যদি থাকে তবে তাই নিয়ে মানুষ বাঁচবেও। যারা মুখোশ এঁটে ঘুরে বেড়ায় তাদের নিয়ে আমার কারবার—মুখোশ খুলে দিই তাদের।

রমিতা আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার মনের এ প্রশ্ন যেন ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকারের প্রশ্ন। চোখের সামনে প্রভঞ্জনের গম্ভীর বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারাটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রমিতার মনে হয় তার সত্তা গভীরে যে গোপন সত্য লুকানো রয়েছে প্রভঞ্জন সেটা ধরে ফেলবে।

ছাদের উপর পরিবর্তনের উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রপাঠের প্রতিধ্বনি সমগ্র পরিবেশকে পরিব্যাপ্ত করেছে। কতকাল আগে রমিতা শুনত ওর বাবার কাছে প্রত্যেকটি স্তোত্র আর সমস্ত সত্তা দিয়ে তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করত। তার বাবাও এখনও সেই সব নিয়েই দিন কাটান, অথচ কত দিন পরে আজ রমিতা শুনছে পরিবর্তনের মুখে সে স্তোত্র। রমিতা বেশ বুঝতে পারে তার বাবা এখন ত্রিপুষ্কর স্তোত্র পাঠ করছেন। রমিতা সেই ধ্বনিতে আবিষ্ট হয়ে পড়ল। প্রাক্তনের একটি মুহূর্ত ওর মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়, বাবার মুখে শোনা একটি গল্পের ছবি এই স্তোত্রমন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। সত্যাচার্য চলেছেন কাশীধামে মোক্ষলাভের আশায়। তাঁর মন সেই ভাবে বিভোর। এমন সময়ে পথের মাঝখানে এক চণ্ডাল আর চণ্ডালিকাকে দেখে ওঁর মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি দেবতার আশীর্বাদ প্রয়াসী, এ সময়ে মধ্যপথে অপবিত্র এই দুটি অপবিত্র মানুষকে দেখে কতকটা বিরক্ত হয়েই বললেন—"ছাখো তোমরা একটু পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও না বাপু!" চণ্ডাল স্মিতহাস্যে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—"কেন গো মশাই! আমাদের সরতেই বা হবে কেন? আমরা তোমার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে নেই ত। তুমি কে?" সত্যাচার্য যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি ছদ্মবেশী দেবাদিদেব মহাদেব, চণ্ডালের ছদ্মবেশে এসেছেন ভক্তের পরীক্ষা নিতে, আর সঙ্গের ওই চণ্ডালিকা হচ্ছেন স্বয়ং

মহাদেবী পার্বতী! মহাদেব সত্যাচার্যকে বললেন—"তুমি কি রকম জ্ঞানী মহাযোগী! চৈতন্য থেকে চৈতন্যকে আলাদা করে ছাখো কি করে? যে চাঁদের প্রতিবিম্ব গঙ্গাজলে পড়ে, সেই চাঁদেরই প্রতিবিম্ব ত চণ্ডালের বাড়ির পাশের পুকুরেও পড়ে—এই দুই প্রতিবিম্বের মূল ত সেই একই চাঁদ, তফাৎ কিছু আছে কি? সোনার কলস আর মাটির কলসে প্রয়োজন-সাধক হিসাবে কিছু তফাৎ আছে কি? তুমি বাপু যাচ্ছ ভগবানকে দেখতে, অথচ সামান্য এই বিভেদটুকু তোমার মন থেকে এখনও দূর হয়নি! এখনও ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে চৈতন্যের পৃথক বাহ্য রূপ দেখছ এ কেমন কথা?"

অনেক দিন আগে এইরকম কত গল্প কত কথাই পরিবর্তনের কাছে রমিতা শুনেছে। কিন্তু আজ পিতা আর কন্যা দু'জনে পৃথক দুটি রাজ্যের মানুষ! তবুও সেই পুরাতনের প্রভাব রমিতার মনে বোধ হয় কিছুটা থেকেই গেছে। ত্রিপুষ্করস্তোত্র শুনতে শুনতে রমিতা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে আপন কেন্দ্রে ওর মন ফিরে আসে। বিগত রাত্রির ক্লান্তি এবং দ্বন্দ্ব ওর দুর্বল চেতনাকে শ্রান্ত করে ওর চোখে ঘুমের আমেজ আনে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অনুকূলের কথা মনে পড়ে। অনুকূল ত সেই পুরুষ-সমাজেরই একজন—তাকে পূজার ছলনা করেছে, তার মনোহরণের জন্য অনেক রকম কলা-কৌশল দেখিয়েছে। আর রমিতা শতবার চেষ্টা করেও অনুকূলকে ষোল আনা অবিশ্বাস করতে পারেনি। রমিতা অনুকূলকে সুযোগ দিয়েছে নানাভাবে। বার বার সেই সুযোগ অনুকূল কাজে লাগিয়েছে। রমিতাকে ঠকিয়েছে। কিন্তু কেন যে এই বিশ্বাসঘাতক অনুকূলকে রমিতা একেবারে নির্মমভাবে তাড়িয়ে দিতে পারেনি তা রমিতা বুঝতে পারে না। তবে কি আজ নিয়তিরই নির্দেশে অনুকূলকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হল রমিতার দরজা হতে? একবার রমিতা খুশি হয়—ভালোই হয়েছে, অনুকূলের উপযুক্ত মর্যাদা সে পেয়েছে। আবার ভাবে—কিন্তু বড় অসহায় অবস্থায় অনুকূল এসেছিল। ঠিক এই রকম বিপদে মানুষ যার কাছে আসে তার উপর অনেকখানি ভরসা রাখে বলেই ত আসতে পারে! বিবাহের কথা অনুকূল গোপন রেখেছিল কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু ত গোপন করতে চায় নি। ...ভাবতে ভাবতে রমিতা ঘুমিয়ে

পড়ল—ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে যে মাদকতা আছে সে মাদকতা যেন জাগ্রত রাত্রির সমস্ত অবসাদ দিয়ে গড়া।

হঠাৎ অসময়ে প্রচণ্ড বর্ষা নামল—তিন দিন ধরে আকাশ অন্ধকার, বৃষ্টি আর থামে না। কলকাতার পথেঘাটে জল থৈ থৈ করছে। শহরের বাড়ীগুলিতে দিনের বেলাও আলো জ্বালিয়ে রাখলে ভালো হয় এমনই অবস্থা।

যার মুখর চঞ্চলতায় সরকার বাড়ির নিঝুম [illegible] প্রাণসঞ্চার হয়েছিল সেই নীলিমার জ্বর হল। প্রভঞ্জনেরও গা-হাত-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা আর জ্বর। জ্বর নিয়েই প্রথম দিন সে ডাক্তারখানায় গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে সে বাড়িতে আবদ্ধ। একটানা জ্বর চলছে।

নীলিমা বিছানায় শুয়ে থাকতে চায় না। তার টান রান্নাঘরের দিকে। সে কেবলই মায়ের কাছে এসে দরবার করে, 'মামার ত খুব অসুখ করেছে মা, তা মামা কেন অত খায়।' এই প্রসঙ্গের পর অবশ্য ওর নিজের প্রতি যে অত্যাচার করা হচ্ছে সেটা নিঃসঙ্কোচে জানায়—'আর আমার বেলায় এইটুকু, এইটুকু—এঁ্যা!'

নীলিমা কখনও বা শাসন করে খোদ অপরাধীকে—[illegible] মামাবাবু তুমি এ রকম বসে বসে থাকো কেন, বিছানায় শুয়ে থাকো গিয়ে। আজ আমার সঙ্গে নুন্ বার্লি খাবে।

প্রভঞ্জন হাসতে হাসতে বলে—অমন করে বকছো কেন লিলিমা, আমার বুঝি ভয় করে না!

লিলি খিল্ খিল্ করে হাসে—ইস, তুমি ত কত বড়, ভয় করবে কেন? আচ্ছা মামাবাবু অসুখ করে কেন? অসুখটা ভারী দুষ্টু না!

প্রভঞ্জন চোখ দুটো নীলিমার মত অনুকরণ করে বলে—অসুখ আর কোথায় যাবে বলো! ওর যে কেউ নেই!

—মা,—বাবা,—দিদিভাই—কেউ নেই ওর ?

—না।

—ও বুঝেছি তাই সবার বাড়ি ঘুরে বেড়ায় বুঝি, নয় মামাবাবু ?

—হাঁ। আর বেচারীকে কেউ দেখতে পারে না, পেট ভরে খেতে দেয় না। শুধুই কষ্ট দেয় অসুখকে !

নীলিমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না, দুঃখও হয় বেচারী অসুখের কষ্ট দেখে। কিন্তু অসুখ যদি একটু ভালো ছেলে হত তাহলে ত সবাই ভালোবাসত তাকে। তা-নয় অসুখ এলেই জ্বর হবে, শরীর কেমন কেমন করবে ! লোকেই বা তাকে আদর করবে কেন ! অসুখের মীমাংসার পর নীলিমা আর একবার রান্নাঘরের দিকে রওনা হবার চেষ্টা করতেই প্রভঞ্জন বলল—এখন যেয়ো না লিলি ! খাটের ওপর উঠে বসো। সন্ধ্যে বেলা বার্লি খাবে আমার সঙ্গে।

নীলিমা বলে—আবার সন্ধ্যে কখন হবে—এই ত সূয্যি আসেনি আজকে ? পরক্ষণে প্রশ্ন করে বসল—সূর্য্যি কেন এলো না, বলো তো মামা ?

—বিষ্টিতে ভিজে গেলে কি হবে ? সেইজন্যে সূয্যি আসে নি।

এই ধরনের নানা গুরুতর সমস্যা নিয়ে প্রভঞ্জন এবং লিলি রীতিমত গম্ভীর ভাবে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে কখন যে অন্ধকার দিনটুকু পেরিয়ে চুপি চুপি সন্ধ্যা হয়েছে কেউ জানতে পারে নি। এক সময়ে নীচে একখানা মোটর থামার শব্দও শুনতে পাওয়া গেল। কে এই বর্ষায় বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে ? রোগীর বাড়ির লোক হওয়াই সম্ভব। আশঙ্কা এই যে, শেষ পর্যন্ত বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি না করে তারা। এই জ্বর নিয়ে তুমুল বৃষ্টি মাথায় করে বেরুনো মানেই অসুখটা বাড়ানো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এইভাবে বেকার বোকা সেজে বাড়িতে আবদ্ধ থেকে এই দুদিনেই প্রভঞ্জন হাঁপিয়ে উঠেছে। যদি তেমন কেউ এসে পড়ে ত গল্প করা যাবে এই আশা। দুটো কথা কইবার মত একটি প্রাণী নেই এ বাড়িতে। বই পড়তেও কষ্ট হয়—অসহ্য মাথার যন্ত্রণা এবং তার ওপর মায়ের নীরব

শাসনও রয়েছে। এই অরুচিকর পরিস্থিতিতে নীলিমার আত্মতুষ্টি প্রেম একটা মহামূল্য অমূল্য বৈচিত্র্য বই কি!

নীলাম্বরের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ঘরে এসে ঢুকল রমিতা।

মামার ঘরের দরজায় রমিতাকে পৌছে দিয়ে নীলাম্বর সরে পড়ল। পালাতে পেরে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। এত সুন্দর আর উঁচু উঁচু ধরণের কোনো মেয়ে নীলাম্বর দেখে নি কখনও। দরজা খুলেই সামনে রমিতাকে দেখে নীলাম্বর অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর রমিতা যখন তার হাত ধরে নাম জিজ্ঞাসা করল তখন নীলাম্বর মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠেছিল—এরপর শচীনের কাছে সে জোর গলায় গল্প করতে পারবে। রমিতা বলেছিল, —ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করব, তাঁকে একটু খবর দেবে খোকা!

নীলাম্বর মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছে—আমায়—খোকা বল্‌ছেন কেন আমি নীলাম্বর। মামাবাবুর কাছে আমি নিয়ে যাচ্ছি চলুন না।

তারপর রমিতার সঙ্গে যেতে যেতে নীলাম্বরের মনে হয় একবার দিদি-ভাইকে খবর দেওয়া দরকার, মা-মণিকে না ডাকলেও নয়! অতএব রমিতাকে মামার ঘর পর্যন্ত হাজির করে দিয়ে নীলাম্বরের অদৃশ্য হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

প্রভঞ্জন খুব আশ্চর্য হয় নি রমিতাকে দেখে। কারণ পৃথিবীর কোনো ঘটনাতেই আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু খুঁজে পায় না সে। বিস্ময় তার মনোজগতে কোনো তরঙ্গ তুলতে পারে না।

রমিতাকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আসুন মিস্ মজুমদার। এই বৃষ্টি মাথায় করে এসেছেন দেখ্‌ছি! কি খবর? শরীর ভালো ত?

রমিতা একটু হেসে জবাব দেয়—আজ আমি রোগী দেখতে এসেছি। আপনার খবর আগে বলুন। আমাকে দর্শক মনে করুন—গ্রাহক নই।

—অর্থাৎ আপনার নিজের সম্বন্ধে কোনো রকম কিছু বল্‌বার নেই?

—সত্যিই তাই। আপনার খবর আজ তিন দিন ধ'রে পাচ্ছি না। দুদিন ফোন করেছি। আপনার কম্পাউণ্ডার আজ সবে জানালেন যে, আপনার অসুখ, ভাবলাম সোজাসুজি চলেই যাই।

—আর বেশ করেছেন। বাড়ির মধ্যে এভাবে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি।

—তার চেয়ে বলুন রোগীদের ধমক না দিতে পেরে আরও বেশি অস্বস্তি হচ্ছে। মাস্টার আর ডাক্তারদের এই বকুনী দেওয়া রোগটি সারাবার কোনো ব্যবস্থা নেই কেন তাই ভাবি!

বলে রমিতা উচ্ছল হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে দিল।

নীলিমা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। মামার অমনোযোগের সুযোগে সে নিঃশব্দে রান্নাঘরের উদ্দেশে রওনা হল।

প্রভঞ্জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রমিতা ব্যস্ত হয়ে বলল—অসুস্থ মানুষ এভাবে ঠাণ্ডা মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলে যে অসুখ বাড়বে, বসুন আপনি!

প্রভঞ্জনের সৌজন্যবোধ এতক্ষণে সজাগ হয়ে অপ্রতিভভাবে বলে উঠল—দেখুন ত, আপনাকে বসতে বলব, তা ভুলে গেছি। আপনি বসুন! মাকে খবর দিয়ে আসি।

রমিতা নিশ্চিন্তভাবে বলে—আপনার ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তিনি খবর পাবেন ঠিক, আমিও তো খবরটা দিতে পারি।

—আচ্ছা!

রমিতা একখানা চেয়ার থেকে বইপত্র তুলে টেবিলের ওপর রাখল এবং সেই চেয়ারেই বসল। প্রভঞ্জন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজের চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করল।

রমিতা বলল—তারপর, রোজার ঘাড়ে ভূত চাপল কি করে?

—ও কিছু নয়, একটু mild ইনফ্লুয়েঞ্জা।

—তবু ভালো। জ্বর এখন কত?

—আছে—একটু!

—তার মানে? কত?

—অল্পই হবে!

—থার্মোমিটার দেন নি বুঝি!

—না।

—খুব অন্যায়। আপনি নিজে ডাক্তার বলে কি রোগ আপনাকে খাঁতির করে চলবে? এইসব ভুল কেন যে করেন আপনারা, বুঝি না!

—বাড়িতে ত থার্মোমিটার নেই। চেম্বারেরটাই আনাতে হবে দেখচি! তারপর, পরমেশের খবর কিছু জানেন?

—ইদানীং সে নাকি খুব পড়াশুনো করছে। এবার তাকে বলে দিয়েছি পাশ না করলে ভদ্রসমাজে যেন মুখ না দেখায়। সেই থেকে আর কোথাও বেরোয় না।

প্রভঞ্জন হেসে উঠল—ওর পাশ করার দরকার নেই। শুধু এক পুঁথিগত খুঁটিনাটি ছাড়া আর সব দিক দিয়ে ও একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

—শুধু তাই নয়, এই দুর্দিনে ওর মত খাঁটি মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। আপনাকে বল্‌তে কি, পরমেশ আমার অনেকদিনের বন্ধু। বাবাও আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন কখনও কখনও, কিন্তু পরমেশ বরাবর ঠিক এক ভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। মানুষকে ও মানুষ ব'লে মেনে নিয়েছে ব'লেই হয়ত অনায়াসে আমার দোষ-গুণ বিচার করবার জন্যে অঙ্কের খাতা খুল্‌তে চায় না।

—তাই নাকি, আমি কিন্তু অন্যরকম ধারণা করেছিলাম ওর সম্বন্ধে।

—আমি যতটুকু জানি পরমেশ সম্বন্ধে তাতে অন্য কিছু ধারণা করা যায় না।

তারপর দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরবে হয়ে পড়ে। প্রভঞ্জন মনে মনে অন্য কথা ভাবে। ওর মনে হয় রমিতার মানসিক বিকার এবং তৎসম্পর্কিত চিকিৎসার কথা। সত্যি যদি রমিতাকে বর্তমান ভুল ধারণার হাত থেকে মুক্ত করতে পারা যায় তবে ও একটি অসাধারণ মহিলায় রূপান্তরিত হবে তার এ বিশ্বাস হয়েছে। নিত্য নিয়ত কত রোগী নিয়েই ত ডাক্তারের কাজ, তবু ওরই মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য-বোধ গড়ে ওঠে। এই তারতম্যের জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে চল্‌লেও প্রভঞ্জনের মনের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা আছে—সে গঠনকে অস্বীকার করতে পারে না মানুষ।

রমিতা খানিকটা চুপ করে থাকবার পর আবার আলাপ শুরু করল—আপনি যেন কেমন হয়ে গেলেন আমাকে দেখে!

—না, না, খুশি হয়েছি। সত্যি, এমনিতে কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে সময় কেটে যায় টের পাই না; কিন্তু এই দুটো দিন যেন আমার অনন্ত অবকাশ গুরুভার ঠেকছিল। কিছুতেই ফুরোতে চায় না। তার ওপর অনবরত বর্ষা—কলকাতার এ বর্ষার আনন্দ নেই। হ্যাঁ হতো যদি এমন জায়গা যেখানে অসীম মুক্তিতে দৃষ্টি ছাড়া পেতো।...আপনি এসেছেন এ খুব ভালো হয়েছে। আমারও আজ অবসর, আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাবে।

রমিতার মুখে-চোখে চিন্তার ধারা নামল হঠাৎ। এতক্ষণ যে সাবলীল অকুণ্ঠতা তাকে ঘিরে ছিল সেটা কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে এক নিমেষে। ও বলল—কিন্তু আপনার শরীর আজ অসুস্থ যে!

—না তার জন্যে কোনো অসুবিধে নেই। তবে হ্যাঁ আপনি অভ্যাগত, একটু খাতির-যত্ন করা যাক আগে।

—কিন্তু রোগী দেখতে এসে কিছু খাওয়ার রীতি নেই। আচ্ছা ডাক্তার বাবু, আপনি সব সময় মানুষকে অত দূরে দূরে রাখতে চান কেন?

—কথাটা একেবারে ভুল। আপনার কথা ত আমায় প্রায়ই ভাবতে হয়। এই যে আজও পর্যন্ত আমার কথামত চলছেন না এ খবরও রাখি।

—কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি ত! আমি বিশ্বাস করি জীবনটা যা ঘটছে তা-ই নিয়ে, যা হওয়া উচিত ছিল সেটা জীবন নয়, সত্য ত নয়ই। Life does not deserve to be worried over.

—হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না জীবনকে, জীবন-সমস্যাকে।

—এককালে আমারও এই রকম একটা ধারণা ছিল। কিন্তু আজ অন্য রাস্তা ধরে ত বেশ চলতে পারছি একলাই। এ পথে পরের দাসত্ব করতে হয় না।

—আপনার এ পথ বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না। একদিন দেখবেন আপনার পথ ফুরিয়ে গেছে। সামনে কোনো কিছু নেই, তখন পিছনে ফেরবার সময়ও থাকবে না। বড় দেরি হয়ে যাবে।

—আমার ত শান্তি বা সান্ত্বনার দরকার নেই, তেমন দুর্দিনের আগে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করবার মত মনের জোর আছে।

—এটা ত মুখের কথা। জানি অপরিসীম পীড়ন আপনাকে মনে মনে একলা সহ্য করতে হয়, তারই প্রতিক্রিয়া আপনার সব কাজের মূলে।

—সে যদি বলেন, তবে আমারও একটা প্রশ্ন করবার আছে। এ প্রশ্ন আমি করব মানুষ হিসেবে মানুষকে।

—হ্যাঁ করুন না। অসঙ্কোচেই করুন।

—আচ্ছা, আপনি অপরকে বাসা বাঁধবার জন্য বার বার নির্দেশ দিচ্ছেন কিন্তু নিজের জীবনে সেটা নেই কেন আপনার ?

—আমার কথা আলাদা। আমি প্রত্যক্ষ কোনো অবলম্বনের জন্য ক্ষুধার্ত নই।

—এ কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

প্রভঞ্জন একটা চুরুট ধরিয়ে বার কয়েক টান দিয়ে বলে—হ্যাঁ আমার জবাবে কিছু ভুল আছে। আমার মত মানুষের পারিবারিক জীবন মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। আপনিই দেখুন, আমার অবসর কতটুকু।

—তাই বলে আপনি একেবারে স্বাভাবিক নিয়মকে অস্বীকার করবেন ? আপনি কি বলতে চান যে—

—না আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমার জীবনে যে রঙীন স্বপ্ন এসেছিল সেটা স্বপ্ন-রাজ্যে ফিরে গেছে।

—কিন্তু স্বপ্ন ষোলো আনা সত্য নয়। আমার মনে হয় আপনি আকাশ-কুসুমের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন।

—আপনার কথায় মনে হচ্ছে, আমার সম্বন্ধে অনেক খবর আপনার জানা আছে।

—তা বলতে পারি না, তবে এটুকু বুঝেছি যে, আপনি নিজেও আমার চেয়ে ছোট সমস্যা নন।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ আপনি নিজের ক্ষেত্রে এড়িয়ে যেতে চান যেটা, অন্যের জীবনে সেটা জুড়ে দিতে চান।

—আমার পেশার দিক দিয়ে বর্তমান জীবন ধারাই উন্নতির পথে সহায়তা করে।

—আমি যদি বলি, এটা আপনার ভুল।

—মোটেই তা নয়। আপনার জানা নেই যে, এক দিকের অতৃপ্ত শক্তি অন্যতর কাজে বলিষ্ঠ হতে প্রেরণা দেয়।

—তবে আমাকেই বা আপনি রূপান্তরিত করতে চান কেন?

—আপনার কল্যাণী শক্তির অপব্যবহার করছেন যে! আপনি সাধারণ মঙ্গলটুকু দেখতে ভুলে গেছেন! আমি আপনাকে সমাজের মঙ্গলদৃষ্টি দিয়ে বিচার করেই বল্‌ছি। It is my duty. আপনি ধরেছেন ভাঙনের কাজ। আর তাতে সহায়তা করছে আপনার অতৃপ্ত বাসনা। এমন যদি হতো যে আপনি কোনোদিনই সাংসারিক জীবন চাননি, তবে কিছু বলবার থাকত না। কিন্তু আপনি একজনকে আশ্রয় করে বাসা বাঁধবার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু সেই আশায় ব্যর্থ আপনার মন বিমুখ হয়ে চল্‌তে শুরু করল ঠিক বিপরীত ধারায়। এ তো আপনার বৈরাগ্য নয়, একে বিতৃষ্ণাও কেউ বল্‌বে না—আপনার বাসনার বিকৃত প্রকাশ। আমার ক্ষেত্রে সে কথাটা খাটে না। আপনি আবার ফিরে যেতে পারেন সেই কক্ষে যদি সুযোগ আসে। তাই বল্‌ছি আমি ত আমার সাধ্যমত চিকিৎসা করছি এবং করব, আপনি খেলা-খেলার পালা চুকিয়ে দিয়ে গৃহ-জীবনে ফিরুন। আমার সমস্যাকে আপনার সমধর্মী মনে করলে ভুল হবে মিস্ মজুমদার।

একথার জবাব দিল না রমিতা। ওকে এভাবে প্রখর বিশ্লেষণ ক'রে কেউ কখনও কিছু বলে নি। আস্তে আস্তে খোলা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো বাইরের দিকে মুখ করে।

প্রভঞ্জনের মনে হল, রমিতা তার কথায় রীতিমত আঘাত পেয়েছে। কিন্তু রমিতাকে আঘাত দেওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাই একটু সঙ্কুচিত

হয়ে পড়ল সে। এ অবস্থায় কি বলবে বা কি করা সঙ্গত হবে তার পক্ষে, বুঝে উঠতে পারল না প্রভঞ্জন। সে ব্যস্ত হয়ে রমিতার কাছে গেল—তারপর কুণ্ঠিত ভাবে বলল—আপনি আমার কথাটা অত Seriously নেবেন না রমিতা দেবী! আপনার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার কথায় যদি আপত্তিকর কিছু থাকে তাহলে বলুন, আর যদি সত্যি কথা শোনবার সাহস থাকে আপনার—আমার বিশ্বাস আপনি তেমন দুর্বল প্রকৃতির নন্ যে দুটো কথার ভর সইতে পারবেন না—।

রমিতা প্রভঞ্জনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। তারপর কতকটা সহজ ভাবেই বলল—না, আপনার কথায় বিচলিত হবার কি আছে ডাক্তার বাবু। আমার যে আর ফেরবার কোনো রাস্তাই খোলা নেই। সবই ত জানেন আপনি। যে সমাজকে ছেঁড়া কাঁথার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আজ আবার তার দ্বারস্থ হওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, মিহির ত আমার কাছে ফিরে আসে নি! আমার লুকোনো মনের চেহারাটা আপনি আজ দেখে ফেলেছেন। এ আত্মগোপন ত আমি নিজের কাছেও করে থাকি। ভয় করে নিজের কথা ভাবতে, জানেন ডাক্তার বাবু!…

বলতে বলতে মাঝ পথেই রমিতা থেমে গেল। খোলা দরজার মুখে কার ছায়া পড়ল এবং পরক্ষণে পার্বতী ঘরে ঢুকল। রমিতাকে দেখে কতকটা অপ্রতিভ ভাবে পার্বতী ফিরে যাচ্ছিল। রমিতা তাকে ডাকল—আসুন না অপনি।

প্রভঞ্জন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বলল—কে, পারু! আয় তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই রমিতা দেবীর।

পার্বতী ন-যযৌ ন-তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেমন, তেমনই রইল।

প্রভঞ্জন বল্‌লে—ইনি হচ্ছেন রমিতা মজুমদার, খুব নামকরা অভিনেত্রী, বুঝেছিস্। আর এটি আমার ছোট বোন পার্বতী! ঠিক ছোটবোন বল্‌লে ওকে ছোট করা হয়, আসলে ও আমার ওপর সব সময় দিদিগিরি ফলায়।

সসম্ভ্রমে রমিতা নমস্কার করে বলল—ও আপনিই তাহলে নীলাম্বরের মা! ওইটকু ছেলে কিন্তু খুব চটপটে। নীলাম্বর কোথায় গেল!

পার্বতী বল্‌ল—সে অনেকক্ষণ আগেই রান্না ঘরে গিয়ে বসে আছে। যাক্ তোমায় এখন বালিশ দিই।

প্রভঞ্জন বল্‌ল—আরে লিলি কোথায় গেল? এইত এক মিনিট আগেও ছিল যে! আপনি বুঝি নীলিমাকে দেখেন নি! পারু তুই একবার লিলিকে ডেকে দিস ত, সে বোধ হয় দিদিভাইএর দরবারে গল্প শুনছে।

পার্বতী বল্‌ল—হ্যাঁ এই দিই। তার আগে এঁকে একটু—।

রমিতা তাড়াতাড়ি বল্‌ল—চলুন না যাই, মার সঙ্গে আলাপ করে আসি।

পার্বতী বিরস কণ্ঠে জবাব দিল—মা ত এখন ঠাকুর ঘরে। আপনি বরং দাদার সঙ্গেই গল্প করুন। মা আসবেন এখানে।

পার্বতী আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না।

পার্বতী চলে যাওয়ার পরক্ষণেই প্রভঞ্জনের মনে হল কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটে গেছে।

রমিতা পূর্বকথার জের টেনে আনে,—আপনি যত সহজে আমাকে ফেরবার কথা বল্‌ছেন, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আর সত্যি কথা, কার জন্যে আমি এই অকরুণ সমাজের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করব? কি আশায়! বল্‌তে পারেন? তার চেয়ে এ আমার একান্ত নিজস্ব রাজ্য—!

প্রভঞ্জন কোনো জবাব দিল না।

রমিতা জিজ্ঞাসা করে—শুনলাম আমেরিকা যাচ্ছেন।

—না, প্রথমে লণ্ডন যাবো, তারপর—কি হয় বলা যায় না। যাওয়ার দিন যতই ঘনিয়ে আসছে মন ততই পিছিয়ে যাচ্ছে।

—কেন? এ সুযোগ, এ সৌভাগ্য অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। আর আপনি ত যাচ্ছেন ভারতের প্রতিনিধি হয়ে!

—সবই বুঝি, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে, যাওয়া আসার ফল ত আমার দেশবাসীকে দিতে পারব না। তবে হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে লাভ আছে বইকি, দর্শনী বেড়ে যাবে—হয়ত এমন ফি হবে আমার যে, খুব কম লোকেই ডাকতে

পারবে। পয়সাওয়ালা লোকের কিছু সুবিধে হবে—নতুন কিছু শিখে আসি ত তারা ভাগ পাবে।

—কেন আপনি ফি বরং কমিয়ে দেবেন! যাতে সবাই আসতে পারে। ডাক্তারের ফি আমাদের দেশে যেমন, তেমন আর কোথাও নেই।

—দেখুন, যদি বিনামূল্যেও চিকিৎসা শুরু করি তবু খুব উপকার হবে না দেশের লোকের। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পেট ভরে ক'জন খেতে পায়! অর্দ্ধেক রোগ আসে পুষ্টির অভাব থেকে। নইলে পঁচিশ লক্ষ লোকের যক্ষা হয় প্রতি বছর, আর পাঁচ লক্ষ লোক ফি বছর ক্ষয় রোগে মরে এ দেশে —তার কোনো প্রতিকার নেই। আমার মত দু'পাঁচ জন লোক একগাদা টাকা খরচ করে বাইরে ঘুরে এলেই কি, আর না এলেই কি! তবে আমার নিজের শিক্ষার দিক দিয়ে অনেক সুবিধে হবে তা সত্যি।

রমিতা এসব শুনতে উৎসুক নয়, ও প্রশ্ন করে—তা আপনি ইংলণ্ডে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন ত?

প্রভঞ্জন উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসতে লাগল।

তার হাসির প্রবাহে রমিতা কেমন যেন হয়ে গেল—বা রে, আপনি অমন হাসছেন যে!

—অনন্ত কৌতুহল দিয়ে ভগবান গড়েছেন আপনাদের মন।

চমৎকারিণী দরজার বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করল—কে এসেছে রে প্রভু!

রমিতা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে নমস্কার করে বলে—আপনারই কাছে যাচ্ছিলাম, তা শুনলাম আপনি ঠাকুর ঘরে রয়েছেন।

চমৎকারিণী বললেন—আর বলো না মা, ঠাকুর দেবতা মাথায় উঠেছে, নাতি-নাতনীরা ত আমায় খেয়ে ফেলল—ও দিদিভাই একবার দেখে যাও কেমন সরস্বতী ঠাকরুন এসেছেন। তা ঠিকই বলেছে দেখ্‌ছি, সত্যিই সরস্বতী ঠাকরুনই বটে মা! তা হ্যাঁ মা তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে, রমিতা মজুমদার।

—আজকাল সব কতরকমের নামই হয়েছে। তা তোমার নাম হচ্ছে রমিতা, তা বেশ।

আরও একটি প্রশ্ন তাঁর মনে স্বভাবতই উদয় হয়েছিল, পাছে মেয়েটি সেকথার অন্য অর্থ করে, অথবা প্রভঞ্জন ক্ষুণ্ণ হয় এইজন্য সেটা আর মুখে উচ্চারণ করলেন না, শুধু বললেন—তা হ্যাঁ মা, কার সঙ্গে এলে?

এ প্রশ্নের তাৎপর্য গ্রহণ করতে না পেরে রমিতা সরল ভাবেই জবাব দিল—কারুর সঙ্গে আসি নি। ক'দিন ডাক্তার বাবু যান নি, তাই খোঁজ নিয়ে শুনলাম অসুখ করেছে, তাই দেখতে এসেছি।

—তা বেশ। কিন্তু আজকালকার দিনে সন্ধ্যে বেলা এমন একলা চলাফেরা করা খুব নিরাপদ ত নয় মা, তাই বলছিলাম। আর বলতে কি তোমার মত মেয়ের এরকম ভাবে না বেরুনোই ভালো। ছোট ভাইটাই কাউকে সঙ্গে নিলেই পারো।

পার্বতী জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে এল, এক থালা ফল এবং মিষ্টান্ন।

চমৎকারিণী বল্লেন—আমি বাপু সেকেলে মানুষ, এ সব কথা বলছি, কিছু মনে ক'র না। ন্যাও একটু মিষ্টিমুখ করো, ভালো হয়ে বেঁচে থাকো মা। রাজরাণী হও। আচ্ছা আমি এখন চলি মা রমিতা! আবার এসো একদিন দুপুরের দিক করে।

রমিতা আর কোনো কথা বলবার আগেই তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে গেলেন।

পার্বতী টেবিলের ওপর থালা রেখে বলল—আসুন ভাই, বসুন। দাদা তুমি একটু বসে ওঁকে খাওয়াও আমি চট্ করে তোমার বার্লিটা নিয়ে আসি।

পার্বতী চলে গেল। রমিতা প্রভঞ্জনের দিকে চেয়ে বল্ল—দেখুন, এ যেন একটা লৌকিকতার মধ্যে পড়ে গেলাম। কোথায় এলাম রোগী দেখতে, আপনার সঙ্গে দু'চার মিনিট গল্প করে যাবো—তা নয় বাড়িময় এঁরা সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমনটা জানা থাকলে কিন্তু আসতে বাধ বাধ ঠেকে।

প্রভঞ্জন গম্ভীরভাবেই উত্তর দেয়—কি করবেন বলুন! আজ আপনি প্রথম এবাড়িতে এলেন। আমার এতে কোন হাত নেই। এখন না খেয়ে আরও ব্যস্ত এবং ক্ষুণ্ণ করবেন না এঁদের, আপনিও সময়ে সময়ে লৌকিক সৌজন্য দেখাতে কসুর করেন না, তার তুলনায় এ কিছুই না।

রমিতা বল্‌ল—আজ রাত্রে এখানেই নেমন্তন্ন লেখা আছে, মাঝখান থেকে আমার বাড়ির খাবার নষ্ট হোল, তা হোক আমার লোকসান দিয়ে আপনার মান বাঁচানো উচিত।

পার্বতী বার্লির গ্লাস নিয়ে দাদার হাতের কাছে ধরল, প্রভঞ্জন বল্‌লে—রাখ, একটু পরে খাবো। জুড়োতে সময় লাগে ত।

—না, না, উনি থাকতে থাকতে খেয়ে নিতে হবে তোমায়। নইলে গোলমাল। বেশ ঠাণ্ডা করেই আনা হয়েছে। আজও সেই বার্লি খেতে *তোমার জ্বর আসে দাদা, আর রোগীদের ত রোজ ও ছাড়া বেশি কিছু বরাদ্দ কর না!*

রমিতা হাসতে হাসতে বল্‌ল—ভাই, ডাক্তারদের বেলায় রোগীর নিয়ম খাটানো ভারী কঠিন। আমার এক কাকা ছিলেন এমনি বড় ডাক্তার, তিনি বার্লি খেতেন বরফে ঠাণ্ডা করে সিরাপ আর সেণ্ট দিয়ে।

সবাই সকলরবে হেসে উঠল।

রমিতা সেই হাসির জের টেনেই বল্‌ল—তা দাদাকে এমন তীর্থ করে রেখে দিয়েছেন কেন, ভাই?

পার্বতী গম্ভীর হয়ে গেল—আমরা ভাই নিজের নিজের নিয়েই বিভোর, কিন্তু দাদার হিতৈষীও ত কম নেই, তাঁরা ত ইচ্ছে করলে দাদাকে সংসারী করে দিতে পারেন!

রমিতা একটু হতচকিত হয়ে যায়—আপনি কি আমার কথায় রাগ করলেন? সত্যি আমি অতটা ভেবে বলিনি। মনে করুন সবাই মিলে ঘটকালী করে দাদাকে আপনার জব্দ করা যায় যদি।

পার্বতী একটু নরম হয়ে বল্‌ল—না, না, আমি রাগ করিনি—আপনার দলেই আছি।

প্রভঞ্জন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে বল্‌ল—সোজা কুমারটুলি গিয়ে ফরমাস দিয়ে দিন মিস্ মজুমদার।

রমিতা বল্‌ল—না, না কুমারটুলির দিন গিয়েছে এখন কুমারীটোলায় যেতে হবে। আপনার ওসব চালকী চলবে না। আমরা ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করতে দেবো না। তা ছাড়া, এদেশের কোনো অবস্থাপন্ন মানুষেরই অবিবাহিত থাকা অপরাধ।

প্রভঞ্জন জবাব দিল—বেশ ত আপনি সেই সব লোকদের বিচারের ব্যবস্থা আগে করুন!

—কাদের কথা বল্‌ছেন?

—যারা নিজের পেটের ভাত জোটাতে পারে না অথচ বিয়ে করে। এবং খাদ্যসমস্যাকে জটিলতর করে তুল্‌ছে সংসারে জীববৃদ্ধি ক'রে।

—তারা স্বভাবধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। এটা কি খুব বড় অপরাধ?

—কিন্তু সেই স্বভাবধর্মের নিয়মে যে তারা নিত্যই অবাঞ্ছিত মানুষকে পৃথিবীর বুকে এনে ফেলছে?

—সেও ত অনস্বীকার্য! তবে হ্যাঁ, জন্মশাসন হওয়া আরও ব্যাপকভাবেই দরকার।

—তবে আমিই বা কি এত অপরাধ করেছি? কেউ যদি এইসব শাসন অনুশাসনের বাইরে থাকে তবে দোষ কি?

পার্বতী ওদের দু'জনের আলোচনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। ওরা যেন সব কথাই গুছিয়ে আর কায়দা ক'রে বল্‌ছে। পার্বতীর ওরকম গুছোনো কথা বলবার শক্তি নেই। কাজেই ও চুপ ক'রে রইল।

রমিতা বল্‌ল—আপনি বড় স্বার্থপর।

প্রভঞ্জন বলে—খাতির করে স্বার্থপর বলছেন কেন?—আমি আরও সহজ, স্বার্থসর্বস্ব! কিন্তু তা বলে অন্ধ নই, আমি আত্মসচেতনও বটে।

একটু অপ্রতিভ হয়ে রমিতা কথা হাতড়ায়। তারপর হাসি টেনে এনে বলে—রাগ করলেন ত! আচ্ছা আজ আর চটাবো না, এবারে চলি! নমস্কার।

প্রভঞ্জন দাঁড়িয়ে উঠে বল্ল—আমার ত রাগ করবার কথা নয়। আপনিই এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন। যাক, চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। রাত হচ্ছে, মা ওদিকে আপনার জন্মে খুব ব্যস্ত হচ্ছেন। উনি বড় ভাবেন সকলের জন্মে।

পার্বতী বলল—তুমি আর বাদলার হাওয়া লাগিয়ো না দাদা, ওঁকে আমি এগিয়ে দিচ্ছি।

প্রভঞ্জন অধিকতর কর্তৃত্ব সহকারে বলল—তোর আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! ওপর থেকে নীচে নামলে ঠাণ্ডা লাগবে! যা তুই নিজের কাজ করগে।

কোনো কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিল পার্বতী, রমিতা তার হাত ধরে বলল—আজ তবে আসি ভাই। দাদার সঙ্গে একদিন আসুন না আমার ওখানে। পরক্ষণে সতর্ক হয়ে গিয়ে কতকটা আত্মগত ভারে রমিতা বলে—অবিশ্যি জোর করা চলে না। আর আমারও ত বাড়ি থাকার ঠিক নেই। তবে—

পার্বতী আর দাঁড়াল না, বলল—নমস্কার।

রমিতা যন্ত্রচালিতের মত প্রতিনমস্কার ক'রে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে রমিতা বলল—একটু সুস্থ হলে তবে বাড়ি থেকে বেরুবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

প্রভঞ্জন বললে—আমাদের দেশে ভালো নার্সের বড় অভাব। আপনার মত ঠাণ্ডা ধরনের মেয়ে যদি নার্স হয় তবে রোগীরাও খুশি মনে থাকে। তারা শুধু ওষুধ আর পথ্যি খেয়েই খুশি থাকতে পারে না, মনের খোরাকও চায় মানুষ। আজ নিজের অসুখে সেটা বেশ অনুভব করছি।

রাস্তার কোণে একটা আলো জ্বলছে, অনেক উঁচুতে। তার পরিমিত আলোয় বৃষ্টির অগণিত সরু ধারা অসংখ্য সুতো দিয়ে জাল বুনছে যেন অন্ধকারের বুকে। জনহীন পথ। রমিতার গাড়িখানা নিঝুম হয়ে এক পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে মনে হয়।

প্রভঞ্জনের কথায় রমিতা একটু হাসল।

সচেতন হয়ে প্রভঞ্জন শুধ্‌রে নিতে চেষ্টা করে, বলে—অবিশ্যি আমার এটা অসুখই বলা চলে না। হ'ল কি, হঠাৎ মনের মধ্যে আমাদের হাসপাতালের ছবি ভেসে উঠ্‌ল কিনা, তাই। কত শক্ত শক্ত অসুখে ত কত রোগী পড়ে থাকে, আমাদের চোখের সামনে নার্সেরা খুব কাজ দেখায় বটে, আড়ালে ব'সে আড্ডা দেয় তাও জানি! তা ছাড়া তাদের ব্যবহারের মধ্যে কেমন একটা যান্ত্রিক ভাব দেখি—

রমিতা বলল—মন্দ বলেন নি, সেবাধর্ম করবার সুযোগ পাওয়া যায় বটে হাসপাতালে। অনবরতই অসুস্থ মানুষের সঙ্গে থাকলে বোধহয় খুব বেশীদিন স্বভাবের মাধুর্য বাঁচিয়ে রাখা যায় না। বিশেষ ক'রে যাদের জীবনে ব্যর্থতা বেশী তাদেরই ত এইসব সেবার কাজে বা স্কুলে পড়ানোর কাজে লাগানো হয়, এটাও বোধ হয় তাদের রুক্ষতার আর একটা কারণ। আমাদের দেশে এমন খুবই কম দেখা যায়, যাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, যাদের মানসিক এবং আর্থিক দৈন্য নেই—তারা এই ধরণের সেবার কাজ করছে।

— কিন্তু মেয়েদের স্বভাবমাধুর্য ত নষ্ট হবার নয়।

—এ নিয়ে এখন তর্ক করতে বসলে আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এখন বিদায় হই।

গাড়িখানা যখন খানিক দূরে বাঁকের মুখে হারিয়ে গেল তখন প্রভঞ্জনের মনে পড়ল, রমিতাকে পুনরায় আসার কথা বলা হ'ল না ত!

সিঁড়ির মুখ থেকেই রমিতা বুঝতে পারল তার জন্য একাধিক আগন্তুক প্রতীক্ষা করছে। বাইরের ঘরে বেশ আলাপ গুঞ্জনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকেই। একজনের কণ্ঠস্বর বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না—সে পরমেশ। পরমেশের স্বর শুনেই রমিতা স্থির করে ফেলল, ওকে বেশ কড়া ধমক দিতে হবে। আর কে কে আছে তা অনুমান করা শক্ত। যে-ই

এসে থাকুক, রমিতা মোটেই খুশী হতে পারল না। নিরিবিলি হাত-পা মেলে চোখ বুজে একলা থাকতে পারলে বেশ হত।

নিজের এই নবলব্ধ বিরূপতাকে ভ্রূকুটী করে ওর মধ্যে থেকেই প্রতিবাদ এলো—এরকম এলোমেলো হাওয়াতে পথ হারালে চলবে না।

দোতলার দালানে পা দিয়ে রমিতা অভ্যস্ত হাসিতে মুখমণ্ডল জাগিয়ে ঘরে ঢুকল। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। রমিতা একবার সকলের দিকে তাকিয়ে হাসল—আপনারা বসুন সবাই। একসঙ্গে 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' ভাব করে উঠে দাঁড়িয়েছেন দেখে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়েছি।

পরমেশ, ব্রজেন, অনুকূল, ভারবাণী, দীপ্তেন এবং আরও একজন যাকে রমিতা চিনতে পারল না।

রমিতা ভারবাণীর দিকে চেয়ে বললে—তারপর শেঠজী আপনার খবর কি?

ভারবাণী কুণ্ঠিত ভাবেই যেন জবাব দেয়—কিছু জরুরী কথা ছিল আপনার সঙ্গে। অনেক সময় অপেক্ষা করছি।

—আচ্ছা তাহলে আপনার জরুরী কথাটাই শেষ হোক আগে। আমার ত এ ঘরে ঢুকেই মনে হচ্ছে আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। এ যেন একটা চৈত্র মাসের হাল্কা সন্ধ্যা।

ব্রজেন বলল—সত্যি কথা বলতে কী, যা বাদলা পড়েছে তাতে আর কিছু ভালো লাগে না।

নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য সরবে কুমার দীপ্তেন বলল—বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে।

তার দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিতা বলে—বাইরের বর্ষায় মনটা হয়ত ঝিমিয়ে পড়েছে। তারপর, আপনি ভালো আছেন?

—এতক্ষণ ছিলাম না, তবে এখন যে ভালো আছি তাতে সন্দেহ নেই।

বলে দীপ্তেন হেসে উঠল এবং সেই হাসির জের টেনে বলল—কিছু বলব

বলে এসেছিলেন। এদিকের কাজ চুকিয়ে নিন, তারপর আমি আছি সবার শেষে।

অপরিচিত লোকটিকে সুদর্শন স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। লোকটি সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল যে রমিতার হয়নি তা নয়, তবে যে ব্যক্তি ধাওয়া করে এসেছে এই বর্ষা মাথায় নিয়ে, সে নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করবে এটুকু জানা হয়েছে রমিতার এতদিনের অভিজ্ঞতায়।

ভারবাণী উঠে দাঁড়িয়ে বলল—শুনুন, একটু প্রাইভেট ছিল কথাটা।

—আসুন এ ঘরে। বলে রমিতা পাশের ঘরে গেল।

ভারবাণীর সঙ্গে ব্রজেনও গেল।

ব্রজেনই প্রথম বললে—মিস্ মজুমদার, ওই লোফারটাকে আপনি কেন যে এত আমল দেন বুঝি না।

ভারবাণীও ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে সে কথাটা সমর্থন করল—ওই অনুকূলটা একটি মহাজুয়াচ্চোর। জানেন বর্জেন বাবু, ও হারামী আমার কাছ থেকে সাড়ে সত্তরো হাজ্জার টাকা স্রেফ ধোঁকা দিয়ে আদায় করল এক তসবির গছিয়ে। আজ আমি বেইজ্জত—রমিতা দেবীকে সেদিন আমার সেই বারাকপুরের বাড়িতে হাওয়া খেতে নিয়ে গেলাম, উনি বল্লেন—'এ আমার ছবি। আপনি কোত্থেকে পেলেন?' আমি ত তাজ্জব! তখন সত্যি বল্লাম যে, একজন বিক্রী করে গিয়েছে।

ব্রজেন বলল—সে আবার কী—?

ভারবাণী বললে—সেই একঠো আওরাৎ কী তসবির মশাই। অবিশ্যি ইটা ঠিক যে, ছবিটা খুবসুরৎ।

—তার মানে?...ব্রজেন অবাক হয়ে যায়।

—আমার একটা ফোটোগ্রাফকে—রমিতার কথা শেষ হবার আগেই ব্রজেন বিচলিত ভাবে বলে উঠল—That means আপনি ওকে মাথায় তুলেছেন, নইলে এসব হয় কি করে। দেখুন রমিতা দেবী, আপনার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ছিল, ভেবেছিলাম বুঝি আপনি এ লাইনের আর পাঁচজনের চেয়ে কিছু পৃথক, কিন্তু এখন—

তার কথাটুকু রমিতা সমাপ্ত করে দেয়—দেখ্‌ছেন তা নই।

ভারবাণী গোলমালের আঁচ পেয়ে ব্যাপারটা মীমাংসা করে দিতে চায়—দেখুন বরজেন বাবু, এ আপনার খুব অন্যায়—জেনানা, না, খেলানা।

ব্রজেন সেকথায় কর্ণপাত করে না—বুঝেছি। রমিতা দেবী আপনিও শেষে ওই সব ছবি তুলিয়ে বিক্রী করাচ্ছেন—ছিঃ!

রাগে, ক্ষোভে রমিতার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে, কানের পাশটা কেমন যেন উত্তপ্ত বোধ হয়। পরক্ষণে ও বল্‌লে—আপনারা কি এই কথাই বলবার জন্যে এসেছিলেন আজ? তা হলে অনুকূলকেও এখানে ডাকা হোক, তার কাছে আমিও জেনে নিই সে আমায় কত টাকা দিয়েছে ছবির জন্যে।

ভারবাণী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌ল—যাইতে দিন, যাইতে দিন, ওসব তকরার বেফজুল। ছবি আপনার ত ফিরেই পেয়েছেন, ব্যাস গোল মিটেছে। হঁা যে কথাটা আজ বল্‌তে এসেছি রমিতা দেবী।

রমিতা ধূমায়িত বহ্নির মত বিষণ্ণভাবেই বলে—না, না শেঠ্‌জী এইসব নোংরা ব্যাপার আমার ভালো লাগে না। আমার উদারতার সুযোগ নিয়ে যদি কেউ আমাকে ঠকায় তবে সে শুধু বিশ্বাসঘাতক হয়েই খালাস, আর দুর্নাম ষোলো আনা আমারই।

ব্রজেন চুপ করে থাকে।

ভারবাণী বল্‌ল—ও লোকটাকে তাড়িয়ে দিলেই ত গোল চুকে যায়।

—সে কথা পরে হবে। আপনারা কি ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বল্‌তে চান?

—আমরা নতুন ছবি তুল্‌ছি একটা।

—আগের ছবিটা শেষ হল না, এর মধ্যে আবার নতুন ছবি কেন?

—সাম্‌নে দেখছেন না দেশ-প্রেমের গল্পগুলো কেমন জোরালো মার্কেটে পাচ্ছে! যে কাজ চল্‌ছে চলুক।

—কিন্তু অনেকগুলো ওই ধরণের ছবি ত শুরু হয়েছে। রমিতা বল্‌লে।

—তাতে কি হয়! হিড়িক লাগলে কম ক'রে এক বছর ত মরশুম! কেন আপনার মনে নেই, নেতাজীর হিড়িকে জয়হিন্দ বিড়ি, পাঁপড় পর্যন্ত বিলকুল

চলে গেল। শুনুন, আর যারা তুলছে তারা কেবল স্বদেশী আন্দোলন আর ইংরেজের অত্যাচার দেখাচ্ছে। আমরা শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাকমার্কেট, বাস্তহারা সমস্যা 'আর' চাই কি গ্রো মোর ফুড পর্যন্ত দেখিয়ে ছেড়ে দেবো। ছবির মার্কেট নিয়ে আপনার কিছু ভাবতে হবে না, শুধু চুক্তিটা পাকা করে নেওয়া দরকার। আপনি এ ধরণের অন্ত ছবিতে আর যাবেন না এটাই চাই।

প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে ব্রজেন একবার রমিতার দিকে আর একবার ভারবাণীর দিকে তাকায়। ভাররাণী সহাস্য মুখে সেটা সমর্থন ক'রে কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিল, সহসা রমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আচ্ছা এ সম্বন্ধে আপনাদের সাতদিন পরে খবর দেবো। একটু ভেবে দেখি।

ব্রজেন বিস্মিতভাবে বল্‌লে—এতে ভাববার কি থাকতে পারে? আপনি কথা না দিলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয় যে!

রমিতা অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করে—সে কী, আপনাদের ছবির মার্কেট যখন তৈরী তখন এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তার কী আছে!

ভারবাণী ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল,—না, না, সে কী কথা। আপনি বরজেন বাবুর কথা ধরবেন না। অবিশ্যি বাজারে হিরোইন অনেক আছে, তবে আমাদের তেমন ছবি নয়—ছবির সবটাই আপনার হাতে। আপনি রাজি হইয়ে যান রমিতা দেবী। আমরা কথা চাই, আজই বলুন! টাকা অ্যাডভান্স ক'রে দিচ্ছি।

রমিতা হেসে জবাব দিল—ভেবে দেখব। তবে আজই কিছু বলতে পারছি না। এ হাসি ওর স্বভাবসুলভ সুপরিচিত হাসি নয়।

যাবার সময় ব্রজেন আবার রমিতাকে অনুরোধ করল—আপনি ওই লোফারটাকে আর আমল দেবেন না। একটা পাকা জোচ্চোর আর—সে যাক, আমি আর কিছু বলব না। তবে এটা জেনে রাখুন, ও আপনার অনেক ক্ষতি করে বেড়াচ্ছে! ভারবাণী কোম্পানীরও অনেক সর্বনাশ করেছে। পরে এক সময় এসে সব বলব।

—আমি ত ঠিক দুগ্ধপোষ্য শিশু নই ব্রজেন বাবু! তবু আপনার সদুপদেশের জন্ত ধন্তবাদ। আচ্ছা নমস্কার।

রমিতার মধুর কণ্ঠস্বর শান্ত গাম্ভীর্যে কেমন রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। এক নিমেষের মধ্যে চৈত্রের হাল্কা আকাশ যেন আষাঢ়ের মেঘাবৃত অন্ধকারে পর্যবসিত হল। রমিতার ঠিক এমনই চেহারা আর একবার ব্রজেন দেখেছিল বাসাডেরা পাহাড়ে স্যুটিংএ গিয়ে একান্তে বসেছিল যখন ওরা, সেই সময়ে। কিন্তু সেদিন যে আশা অবশিষ্ট ছিল আজ সেটুকুও নির্মূল হল।

শেষের দিকে ব্রজেনের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ শোনায়—আপনাকে আর রক্ষা করা গেল না। আমারই ভুল, এ লাইনে যারা আসে তারা মানুষ হবার অবকাশ বিসর্জন দিয়েই আসে।

—আপনিও ত সেই লাইনেরই লোক ব্রজেনবাবু। তা ছাড়া আমার অভিভাবক দরকার নেই—যদি তেমন দিন আসে তখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো, যোগ্য লোকই সে কাজে বহাল হবে।

রমিতার মধুর কণ্ঠে কে যেন শানিত তরবারীর তীক্ষ্ণতা সংযোজন করেছে। এর পর আর দাঁড়াল না ব্রজেন।

বিদায় নমস্কার করে আর একবার চুক্তিটা পাকা হওয়ার আশা আছে কি না বাজিয়ে দেখল ভারবাণী—আমি কিন্তু আপনার কথা পেয়েছি ধরে রাখলাম।

রমিতা বললে—অত সহজে কি ধরা যায় শেঠ্‌জী! আচ্ছা আজকের মত নমস্কার।

ব্রজেন এবং ভারবাণী চলে যেতে না যেতেই পরমেশ এ ঘরে ঢুকে পড়ল। তার বিভ্রান্ত চেহারা দেখে রমিতা একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করে—তারপর তোমার খবর কি?

পরমেশ রমিতার মুখের ওপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে বসল—ভাখো, আমি আজ অত্যন্ত সিরিয়াস। তুমি কি মনস্থ করেছ?

—কি বিষয়ে মনস্থির করতে হবে জানাও!

—আমার বিয়ে সম্পর্কে। আজ আমার শেষ কথা চাই।

—যার প্রথম নেই তার শেষ ত যে কোন মুহূর্তেই হতে পারে।

—না, না, ওসব হেঁয়ালী রাখো। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

—পারো করো।

পরমেশ রমিতার ডানহাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে সজোরে পীড়ন ক'রে বলে—ত্যাখো সান্ত্বনা আর আমায় জ্বালিয়ো না। তোমার জন্যে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ হয়েছি। আজও আমার ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করা হয় নি।

হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে রমিতা শান্ত দৃষ্টিতে পরমেশের দিকে তাকিয়ে বলে—শেষে তোমারও মাথার দোষ হল! আমি যে তোমার ওপর অনেক বেশী ভরসা করেছিলাম পরমেশ!

—ওই ভরসার বোঝা আর কতকাল বইব! আজ দশ বৎসর ধরে তোমার আনন্দের আসরে ঠেকা দিয়ে দিয়ে কেটেছে, এক পয়সাও প্যালা পাই নি। আর পারছি না, এবারে মজুরী চাই। মুজরো ত মজুরীর আশাতেই—!

রমিতা বিচলিত ভাবে বলল—বাংলায় বলো, আমি ওসব আড়িচাল বুঝতে পারি না।

—এর চেয়ে বাংলা হয় না। প্রথমে যখন তুমি বিয়ে করলে, সে বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন থেকে যা কিছু করবার সবই আমি করেছি—শুধু বিয়েটা আর একজন এসে করল। এখন ভেবে দেখছি সেই সময়ে ওই বাকী কাজটুকু পরের হাতে ছেড়ে দিয়েই ভুল করেছিলাম। ওটাও আমার কর্তব্য ছিল।

—এতদিন পরে তামাদি হয়ে যাওয়া মূলধনের সুদ চাচ্ছ, তাও চক্রবৃদ্ধি হারে? কিন্তু আমি যে কতখানি দেউলে সে ত জানতে বাকী নেই তোমার। তোমায় বন্ধু করে ফেলেছি সারাজীবনের, সেটা আর এখন বদলানো সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের মেলামেশায় ঘনিষ্ঠতা হয়, তবে প্রেম হয় না। কিছুই যে রহস্য নেই তোমার আমার অন্তরালের মধ্যে! কিছু জানা আর অনেকখানি কল্পনাই ত প্রেমের পথ—সে ত তোমাতে আমাতে নেই।

পরমেশ অসহিষ্ণুভাবে ঘরময় পায়চারী করতে করতে বলল—তবে তুমি আমায় ছুটি দাও সান্ত্বনা। আমি বিয়ে করব!

—বেশ ত পাত্রী দেখি।

—যদি বলি তার প্রয়োজন নেই। নিজেই ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

—তাহলে বুঝব তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

—হায় এই বোঝাটুকু যদি যথাসময়ে বুঝতে!

—কিন্তু তুমি যে এরকম ভাবে আমার ছায়াকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল্‌বে সেটা ত তখন টের পাইনি পরমেশ।

—ভেবেছিলাম টের পেতে দেবো না। কিন্তু তা হল কই। মানুষের আত্মপ্রেম এতই অন্ধ যে সে কিছুতেই ভুল্‌তে পারে না সেটুকু। নইলে আমি ত একথা বল্‌তে চাইনি, তবু আমাকে দিয়ে কে যেন বলাচ্ছে—আশা ছিল আমার মত একটা মূল্যবান মানুষের দাম মিলবেই। উঁহু তা নয়, সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার আর বিয়ে না করে উপায় নেই।

শঙ্কিতভাবে রমিতা জবাব দেয়—কিন্তু আমি ত তোমার বিয়েতে অমত করি নি, আমার নিজের আবার বিয়েতে আপত্তি আছে। তোমার ত এই প্রথম বিয়ে। একবার বিয়ে হ'লে পুনরায় ওটা করতে তুমিও চাইবে না।

—ইস্, যদি তুমি বল্‌তে একটা মিথ্যে কথা—যদি বল্‌তে 'পরমেশ তোমায় আমি ছাড়তে পারব না' তাহলে আর বিয়েটা করতে হত না মিছেমিছি। একটু মিছে কথা বল্‌তে পারবে না, শুধু মুখের কথাটুকু?

এতক্ষণে রমিতা পরমেশের কথার মধ্যে একটা যেন রহস্যের সন্ধান পায়। ও কতকটা তিরস্কারের ভঙ্গীতে বল্লে—তোমার সঙ্গে মস্করা করবার সময় নেই। ব্যাপারটা চটপট সেরে নাও—!

—বাপ রে! তোমার যেন অনেকগুলো রোগী দেখতে বাকী রয়েছে! হাসপাতালের আউটডোর ডাক্তারের মত তেড়ে উঠছ কেন?

—দেখছ না রাত বাড়ছে। এখনও একগাদা লোক বসে আছে বাইরে। রমিতার চোখে বিরক্তির তির্যক ছায়া পড়েছে।

পরমেশ অপ্রতিভ ভাবে মুখখানা করুণ করে বলে—কি করি বলো। সাতটি মেয়ে একসঙ্গে আমার প্রেমে পড়েছে। তারা খুব কাছাকাছিই থাকে, সাতজনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বেধে যায়। মুস্কিল এই যে কার্য-

গতিকে তাদের কাছাকাছি আমাকেও মাঝে মাঝে থাকতে হয়, এ অবস্থায় সাত সতীন নিয়ে ঘর-করা আমার মত আনাড়ির পক্ষে অসম্ভব। পারো তো পাড়াগাঁয়ের একটি বেশ বলশালিনী মেয়ে দেখে আমার বিয়ে দিয়ে দাও। নইলে বেঘোরে প্রাণটা হারাতে হবে।

—তাদের বয়স কত!

—বাইশ থেকে শুরু ক'রে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত আছে। প্রত্যেকেই উপার্জনশীলা।

—তবে বাদ দেবে কাকে বলো!

—কিন্তু কাকে গ্রহণ করব? ওদের দেখলেই আমার দেশত্যাগের উৎসাহ পেয়ে বসে যে!

—কারণ কি? রূপ—।

—কোন্‌টা নয়? গুণই কি কেউ কম যায়? বাইরের রূপটা ধর্তব্যের মধ্যে অনেক দিনই ছাড়তে শিখেছি। অন্তরের মাধুর্যে ওরা একেবারে—!

রমিতা হাসি দমন করে কপট গাম্ভীর্যে মুখখানা রাঙা করে বললে—এই বুঝি তোমার লেখাপড়া হচ্ছে? যাও, বাড়ি গিয়ে পড়া মুখস্থ করো গিয়ে। আর একটিও কথা নয়।

—কিন্তু আজকের এই বর্ষণমুখর রাতে নিছক মানুষের প্রাণতত্ত্ব পড়ে কাটাতে হবে? আর্ট পেপারের ওপর লালকালো রেখা দিয়ে কেবল হাড় মাংসের বিরক্তিকর বিবরণ লিখছে। তাতে কিছু রস নেই যে। তবে একটা ভালো ওরা বইএর মধ্যেই থাকে। মলাট বন্ধ করলেই ছুটি। বই-এর গণ্ডি পেরিয়ে পিছু পিছু ধাওয়া করলেই হয়েছিল আর কি!

—আঃ, তুমি যাবে কি না!

—এই ত পা বাড়িয়ে বসে আছি। রাত্রের রসদটুকু সংগ্রহ হ'লেই আর এক মুহূর্তও দেরী হবে না। দেবি! দাও তব প্রসন্ন দৃষ্টির একটি কটাক্ষপাতে বক্ষ মোর আচূর্ণিয়া।

বলতে বলতে পরমেশ অন্তর্হিত হল।

আজকাল এইরকম ভাবেই সে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য এসে হাজির হয় এবং রমিতার কাছে তিরস্কৃত হয়ে চলে যায়।

কুমার দীপ্তেন রায়, অনুকূল এবং নবাগত অপরিচিত ভদ্রলোকটি প্রত্যেকেই বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল মনে মনে। কিন্তু সেকথা বলবার মত সাহস কারো নেই। বিশেষ করে অনুকূল আজ এসেছে তার জীবনের চরম অপরাধ স্বীকার করতে। এতদিন ধরে যে কথাগুলো পৃথিবীর অগোচরে রাখতে চেয়েছে, এমন কি সেই কথাগুলিই আজ তার প্রাণে, প্রাণ-সত্তায় প্রতিনিয়ত প্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে মাথা ঠুকে মরতে চাচ্ছে।

অনুকূলের অসহিষ্ণুতা এখান থেকে চলে যাবার জন্য নয়, আত্মপ্রকাশের দুর্নিবার আগ্রহের উৎপীড়িত মনের! সে আর একাকী সহ্য করতে পারছে না নিজের বিবেক দংশন।

কুমার দীপ্তেনের মানসিক স্থৈর্য অনুকূলের চেয়ে খুব বেশী প্রকৃতিস্থ বলা চলে না। সে সঙ্গে ক'রে একজন জ্যোতিষী নিয়ে এসেছে। ইনি নাকি পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ। খুব অল্প বয়সে যে পাণ্ডিত্য ইনি অর্জন করেছেন তা অবিশ্বাস্য। অতএব কুমার দীপ্তেন এঁকে এখানে আনতে বাধ্য হয়েছে। তার বিশ্বাস, ইনি রমিতাকে প্রভাবান্বিত করে তার প্রেমের উৎসকে দীপ্তেনের দিকে চিরকালের জন্য ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবেন।

যখন রমিতা এ ঘরে ফিরে এলো দীপ্তেন কতকটা ছোঁ মেরেই কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে—কুমারী রমিতা আপনি বোধ করি এঁকে চিনতে পারেন নি?

বিস্মিত ভাবে রমিতা জ্যোতিষীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর অনুনয় করে বল্লে—কিছু মনে করবেন না, আমি ঠিক—

দীপ্তেন হেসে বলল—আশ্চর্য, আপনি চিনবেন কি করে? মানে দেখেন নি ত, তবে নাম নিশ্চয় শুনেছেন! ইনি বিখ্যাত জ্যোতিঃশাস্ত্রপারংগত জয়দেব বাচস্পতি।

রমিতা তবুও চিনতে পারল না দেখে দীপ্তেন একটু হতাশ হল।

ওদিক থেকে অনুকূল এগিয়ে এসে নবাগত ভদ্রলোকটির গায়ে হাত দিয়ে

প্রণাম করে মুগ্ধ ভাবে বলল—আপনিই সেই যুগান্তকারী ভাগ্যদ্রষ্টা! আহা আজ বড় সুদিন আমার। কিন্তু বড় দুঃখ হচ্ছে, এতক্ষণ আপনার সামনে থেকেও বঞ্চিত রইলাম!

ইতিপূর্বে এই বিষণ্ণ মলিন লোকটির দিকে দীপ্তেন ভ্রূকুটি করে বার কয়েক বিরক্তিভরে তাকিয়েছিল। কিন্তু এই আশাতীত গুণগ্রাহিতায় দীপ্তেন গদগদ হয়ে বললে—দেখলেন রমিতা দেবী গুণ হচ্ছে ফুলের সৌরভ, নইলে ইনিই বা মহর্ষির কথা শুনবেন কি করে!

অনুকূল উৎসাহিত ভাবে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—যদি কিছু মনে না করেন ত একটা প্রশ্ন আছে!

মহর্ষি জয়দেব স্মিতহাস্যে মুখ খানি ঈষৎ উদ্ভাসিত করে বললেন—Please don't mind. I shall be glad to receive you at my chamber. আপনি আমার চেম্বারে দেখা করবেন। এখানে দেখচেন ত আমি Special call-এ এসেছি।

দীপ্তেনও খুশি হয়ে একবার চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বললে—চলুন আমরা একটু নিরিবিলি হই!

রমিতা অনুকূলের দিকে না তাকিয়েই বলল—তোমার কি টাকা-পয়সার দরকার আছে?

অনুকূল হতচকিত ভাবে প্রশ্ন করে—কার? আমার না, না!

—কাল আসতে পারো না? আজ—!

দীপ্তেন অনুকূলকে ঠিক সেই মুহূর্তেই অনভিপ্রেত ভেবে মনে মনে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, যখন ওইভাবে স্পর্ধিত হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল অনুকূল জ্যোতিষীর দিকে তখনই। এখন রমিতার মনের ভাবটা প্রকাশ পাওয়ায় সে আরও অধীর হয়ে উঠল।

অনুকূল বলল—হ্যাঁ, তা আসতে পারি। তবে কাজটা আজই যদি মিটে যেতো!

রমিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে দীপ্তেন অনুকূলের দিকে প্রকট ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে বললে—কিছু যদি না মনে করেন ত বলি। ওঁর শরীরটাও

আজ ভালো নয়। তার ওপর আমাদের কাজের কথা সারা হতে সময় লাগবে। তার চেয়ে আপনি কাল আসুন মশাই!

অনুকূলের আজকের এই উপস্থিতি রমিতার কাছে কাঁটার মত বিঁধছে। সত্যি, অনুকূলকে ও আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দীপ্তেনের কর্তৃত্বে রমিতা বিরূপ হয়ে উঠল। দীপ্তেনের কথাগুলো যেন শুনেও শুনতে পায় নি এমনি ভাবেই অনুকূলকে ও বলল।

অনুকূলের অপ্রতিভ শুষ্ক মুখের পানে চেয়ে বলল রমিতা—বেশ ত, এখানে মুখ বুজে বসে না থেকে, ভেতরে গিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করলেও ত পারো! মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারছি ক্ষিদে পেয়েছে।

কথাটা বিস্মিত দীপ্তেনের কানে মধু বর্ষণ করল না, অনুকূলও হতচকিত হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল।

রমিতার বহুধাবিভক্ত প্রেমধারাকে এককেন্দ্রিক করার প্রয়াসপর্ব সমাপ্ত করে কুমার দীপ্তেন এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রপারঙ্গত মহর্ষি জয়দেব নিজের নাম ঠিকানা সম্বলিত একখানি ইংরাজি কার্ড দিয়ে যখন বিদায় গ্রহণ করলেন তখন রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

বিদায়ের সময় মহর্ষি জয়দেব বিনীতভাবে বললেন—দেখবেন, একটু প্রচার করবেন। আজকাল গুণগ্রাহিতার বড় অভাব, বুঝলেন, তাই নিজে থেকেই লৌকিক কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। আপনার মুখে পরিচয় পেলে অনেকে হয়ত ভারতের এই সুপ্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। আমার ব্রতই এই, জ্যোতির্বিদ্যা যাতে পুনরুজ্জীবিত হয় সেটা আমাকে দেখতে হচ্ছে! আচ্ছা মা, নমস্কার!

অনুকূল যথাসম্ভব খাওয়া-দাওয়া করে একখানা কাঠের চেয়ারেই নিদ্রা জমিয়ে তুলেছে দেখে রমিতা তাকে ডাকল—কি ব্যাপার, তুমি যে এখানেই রাত কাটাবার যোগাড় করেছ!

চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে অনুকূল উঠে দাঁড়িয়ে বলল—টের পাইনি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

এই অল্পক্ষণ নিদ্রার ফলে তার জড়তা অনেকখানি কেটে গিয়েছে।

অনুকূল এখন কতকটা সহজভাবেই কথাবার্তা কইতে শুরু করল—ওরা বিদেয় হয়েছে দিদি !

রমিতা বল্‌লে—হ্যাঁ ওঁরা ত ভালোয় ভালোয় বিদেয় হলেন এখন তুমি— !

অনুকূল সঙ্কুচিত ভাবে জবাব দিল—আমি এখুনি যাচ্ছি। এতটা রাত হয়েছে বুঝতে পারি নি। থাক, না হয় কালই আসব। তোমারও শরীর খারাপ !

রমিতা এ কথায় যেন ফেটে পড়ল—ও কথাটা যেন তোমার মুখে বড্ড বেমানান্ ঠেক্‌ছে। অন্যের সুখ স্বার্থের ভাবনায় মাথা ঘামাতে শিখ্‌লে কবে !

অনুকূলের চোখে যেটুকু ঘুমের রেশ তখনও ছিল রমিতার কণ্ঠস্বরে সেটুকুও মুছে গেল। সে বল্‌লে—দিদি, তুমিও শেষে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের মত পুরোপুরি মাম্‌লা না শুনেই রায় দিতে শুরু করলে ? সত্যি ওই ভদ্রলোকের কথা ত মিথ্যে নয়, তোমার চেহারা দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায় শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

—তার জন্যে তোমরাই সকলে দায়ী। বিশেষ ক'রে তুমি !

অতঃপর কি কর্তব্য বুঝতে না পেরে অনুকূল আবার বল্‌লে—বেশ আমি কালই আসব, আজ তুমি এখন বিশ্রাম করো গিয়ে !

অনুকূলের কথার সঙ্গে মুখের চেহারার তেমন সঙ্গতি দেখতে পায় না রমিতা। ও যেন কাতরভাবে কথাগুলো বলছে। শুধু আজ নয়, অনুকূলের চেহারার মধ্যে বরাবরই কেমন একটা রহস্য ঘিরে থাকে। এই রহস্যটুকুই বোধ হয় অনুকূলের প্রতি রমিতাকে সহানুভূতিশীল করেছে। অনুকূল যে অত্যন্ত অস্থির একথাটা বারবারই প্রমাণ হয়ে গেছে। এবং এই লোকটা মিহিরলালের পরেই বড় ক্ষতি করেছে রমিতার। সেদিক দিয়ে হিসেব করতে গেলে অনুকূলকে অনেক আগেই দূর করে দেওয়া উচিত ছিল। তবু রমিতা পারেনি। অনুকূলের একটা দীনতার আবেদন সূক্ষ্মভাবে রমিতার সংকল্পকে শিথিল করে দিয়েছে। ওর করুণ চেহারা এই কথাই বলতে চায়—আমি

নিরুপায় হয়েই সব দুষ্কৃতির দুঃখভার বহন করব। তোমরা যে শাস্তি দেবে মেনে নেবো নীরবে—কোনো প্রতিবাদ করব না। কিন্তু এটা জেনো ঠিক যে, জ্ঞানতঃ আমার কোনো দোষ নেই। অবস্থা বিপাকে যা ঘটেছে তা আমার দ্বারা ঘটলেও আমি নিমিত্ত মাত্র।···কোথায় যেন একটা অসহায় মানুষের আবেদন ওর মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া, শিল্পীর নির্লিপ্ততা—ওর যত কিছু অকার্যের কালো ছায়াকে অগ্রাহ্য ক'রে চলে।

অনুকূলকে বিষণ্ণ মুখে চলে যেতে উদ্যত দেখে রমিতা বলল—না, থাক। কাল আবার অবসর পাবো কিনা তার ঠিক কি। তুমি এবাড়িতে আসা যাওয়া বন্ধ ক'রে ভালোই করেছো। কারণ ভবিষ্যতে এখানে আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার আশা নেই। তোমার স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে আমি প্রথমটা মুষ্‌ড়ে-পড়েছিলাম—কিন্তু খোঁজ খবর নিতে গিয়ে বুঝলাম যিনি মরেছেন তাঁর বাঁচতে সাধ ছিল্‌ না। আর কাউকে জানাও নি তাঁর মৃত্যু সংবাদ ?

অনুকূল এতক্ষণ রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, রমিতার কথা শেষ হ'তে সে মাথা নত ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড়টা সোজা ক'রে নিয়ে বল্‌ল—আত্মীয়দের কাছে যেঁচে সহানুভূতি পাবার লোভ থাকলে নিশ্চয় ব'লে বেড়াতাম। এদেশের নিয়মই হচ্ছে পরের আনন্দের কথা শুন্‌লে লোকের বুক ফেটে যায়—আর দুঃখের কথা শুন্‌লে লোকে বলে, 'লোক দেখানো'। সে যাক গে, আমি তোমার কাছে স্বার্থসিদ্ধির জন্যেও আসিনি, আর অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চাইতেও আসিনি দিদি !

—বুঝলাম এঁটা তোমার ক্ষমা চাইবার আলট্রা আধুনিক কায়দা।

—যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু আমি আজ কিছু গোপন সত্য স্বীকার করতে এসেছি।

—বর্ষার মেঘমেদুর রাতে আমার কাছে কি গোপন সত্য স্বীকার করবে ? তোমাকে ত চিনতে বাকী নেই। আর বোধ করি তুমিও আমার স্বরূপ জানো।

রমিতার চোখমুখে অবিশ্বাস-মিশ্রিত বিদ্বেষের অভিব্যক্তি।

অনুকূল বললে—তোমার করুণাও ভিক্ষা করতে আসি নি। তবে কি জানো, জীবনে সমস্ত অন্যায়ের সাক্ষী রাখা সম্ভব নয়, তাই মরবার আগে—তাই মরবার আগে, অন্ততঃ একজনের কাছে যতটুকু পারি স্বীকার করে যেতে চাই।

অনুকূলের মুখের পানে সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করে রমিতা বলে—শুনেছি কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরোহিতকে ডেকে অন্তিমকালে সকল অপরাধ স্বীকার ক'রে মনের বোঝা হাল্কা করে মরে। প্রথাটা ভালো—তবে মানুষ যদি প্রতিদিন নিজের কাছেই স্বীকার করত তাহলে হয়ত খাঁটি মানুষটা মরবার অনেক আগেই অন্যায়ের মৃত্যু ঘটত। এ ত তা নয়, শেষকালে পাপের বোঝাটা পুরোহিতের কাঁধে জিম্মা দিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে থাক, মানুষের মনঠকানো একরকম অসংখ্য প্রথা সবদেশেই আছে। তোমার অনুতাপের সাক্ষী হবার জন্যে যোগ্যতর মানুষ খুঁজে বার করো। ভগবান আমার এজাহার নিতে রাজী হবেন এমন ভরসা নেই। ধর্মকর্মের একটি গেজেটেড অফিসারের প্রশংসাপত্র আদায়ের চেষ্টা দেখলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অনুকূলের মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে কিন্তু তাতে তাঁর বিষণ্ণ মুখখানা যেন আরও করুণ দেখায়। সে বলল—না দিদি, স্বর্গ চাই না। বড়মানুষের বদান্যতা আরও কম কামনা করি। এখন সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছে নিজের স্বরূপটা—কেবলই মনে হচ্ছে, এত ছোট আমি! মনের ভারটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। অনেকদিন ধরে নির্বিকার ভাবে একটা অন্যায়ের জাল বুনছিলাম, হঠাৎ তার সুতো ফুরিয়ে গেল, আর এখন দেখচি আমার জালখানা চারিদিক ঘিরে আমাকেই বেঁধেছে। তখন টের পাই নি, এটা এতদিন পরে দেখতে পেলাম।

রমিতার মুখে গভীর রাত্রির আত্মস্থতা সজাগ হয়ে উঠেছে। ওর চোখেমুখে আর স্নেহের লেশমাত্র নেই। অনুকূলের কণ্ঠস্বরের আন্তরিক আবেদন রমিতাকে স্পর্শ করল।

—জানো দিদি, মেরী মারা গেছে।

রমিতার ভাবলেশহীন মুখখানার দিকে অনুকূল কিছুক্ষণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ তার কথার খেই ধ'রে আবার সে বল্ শুরু করে—মেরীকে তোমার মনে আছে? সেই যে বাসাডেরা গ্রামে জী লতার মত একটি মেয়ে গান গেয়েছিল! যার কথা তুমি শুটিং থে ফেরবার পথে বার বার বলেছিলে। সেই যে কৃষ্ণচূড়া গাছের সংগে য তুলনা করলে বুরুডি পাসে!

রমিতা স্মৃতির পিঞ্জরে অনেক অনুসন্ধান করেও ঠিক যেন মনে আন না পেরে চুপ করে রইল।

অনুকূল বল্‌ল—সেই যে মেয়েটি তার প্রিয়তমের পথ চেয়ে প্রতী করছিল।

রমিতার মুখে হাসি ফুটে উঠল—আর বল্‌তে হবে না। খুব সুন্দ রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিল। আর হ্যাঁ মনে পড়েছে, আমায় বলেছিল তা Lover-এর খোঁজ করবার জন্যে! দাঁড়াও মনে পড়েছে, সেই ছেলেটার না হচ্ছে এলিয়াস! আহা বড় সুন্দর স্বভাব মেরীর! বড় ভালো মেয়ে—কি মেরীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

অনুকূল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল—আমি তাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল!

—সে, পালিয়ে এলো? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—আসবে না কেন? এলিয়াসের দেখা পাওয়ার আশায় মেরী কি ন করতে পারে? তুমিও ঘাটশীলা থেকে চলে এলে, দিন তিনেক পরে যতী চৌধুরীরাও ফিরলেন। কিন্তু আমি রয়ে গেলাম। ওদের বললাম, একা কাজ বাকী আছে, শেষ করে যাবো। কাজটা অন্য কিছুই নয়। বাসাডেরা ফিরে গিয়ে মোরেনের সঙ্গে দেখা করে তার হাতে কিছু গুঁজে দিলাম আর মেরীকে বললাম, 'এলিয়াসের খবর পাওয়া গেছে—রমিতা দি তোমা কলকাতা নিয়ে যেতে লিখেছেন। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গেও যেতে পারো।' এক কথায় মেরী চলে এলো।—এরপর সে না এসে পারে!

রমিতা বাধা দিয়ে বলল—কিন্তু মোরেন ত খুব খাঁটি মানুষ। টাকায় তাকে কিনতে পারলে?

অনুকূলের চোখ-দুটোয় অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে—টাকায় কি না হয়! টাকা ছাড়া দুটো বিলেতীর বোতলও দিতে হয়েছিল মোরেনকে, সে হচ্ছে খাঁটি নেটিভ্ ক্রিশ্চান—এরপর আর ভাবনা কি! তার ওপর পেটে বিদ্যের আঁচড় পড়েছে, বোকা ত নয়। ওদিকে মেরীর প্রেমে গ্রামের ছেলেরা বেহেড, যাদের ঘরে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে তাদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। আমায় অত কাঁচা ছেলে ভেবো না। কেবল পারিনি শুধু তোমাকে জুত করতে, নইলে আমার এদিকে একটা ঈশ্বরদত্ত শক্তি ছিল একথা বলব! সে ত গেল—তারপর কলকাতায় এসে ওকে কয়েক দিন খুব শহর দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালাম।

রমিতা বলল—কিন্তু ও যেরকম এলিয়াসকে ভালোবাসত তাতে ত—

—অবিশ্যি কিছুদিন রীতিমত কষ্ট পেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু তারপর ব্রহ্মাস্ত্র নিয়োগে কার্য্যসিদ্ধি! এলিয়াসের খোঁজ ক'রে না পেয়ে প্রায়ই আমার মন খারাপ হ'তে লাগল—মেরীর চেয়েও বেশী মুষড়ে পড়তাম সময়ে সময়ে। কখনও বা প্রেমে কতখানি পাগল হয়ে গেছি সেটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে ওর কাছে গোপন করবার চেষ্টা চালিয়ে নরম করতাম। তুমি যতোই বলো দিদি, মানুষের ভ্যানিটিতে ঠিকমত উত্তাপ দিতে পারলেই সিদ্ধি। বিশেষ করে তরুণ বয়সের ভাবপ্রবণ মনের কাছে প্রেমের খাতির খুব বেশি। মেরী বুঝেছিল, তাকে আমি নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবেসেছি—কোনো কিছুর প্রত্যাশায় নয়। সত্যি কথা, ওকে আমার ভালো লেগেছিল। ওর প্রেমের তুলনাবিরহিত সম্পদের ওপর আমার সবচেয়ে লোভ ছিল।

রমিতা কখন তার বিরূপতা, বিদ্বেষ ভুলে গিয়েছে। অনুকূলের আলোচনায় ও বেশ সহজ ভাবেই নিজেকে নিয়োগ করেছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল যখন ও বললে—তোমার জন্যে অপরের মনে একটা বিশেষ আসন পাতা রয়েছে এই অনুভূতিই কাঁচা মনকে আত্মহারা করবার পক্ষে

যথেষ্ট। পুরুষেরা এই অস্ত্রটির ব্যবহার খুব ভালো করে শেখে। ওই সুদর্শনচক্রে একদিন মিহিরলাল আমায় মারে নি? কিন্তু তারপর?

—তারপর আর কি! একদিন ও বললে, 'আমি কিন্তু এলিয়াসকে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসতে পারব না। ওই নাম আমার ইষ্টনাম।' আমি বললাম, 'বেশ ত তুমি আমার নাম খারিজ করো এলিয়াস ব'লে।' আমি ওর নাম দিয়েছিলাম মন্দাকিনী। ও বুঝেছিল, এলিয়াসের দেখা আর কোনোদিনই পাবে না। তবু আমার ওপর ও বিরূপ হয় নি। আমি ওর মনের আকাশে নতুন দিনের আলো এনে ছিলাম তাতে কোনো ভুল ছিল না। ওর স্বভাবের মাধুর্য আমায় সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। মনে মনে ছন্নছাড়া জীবনের বেদিয়াটাকে বিদায় দিয়ে মন্দাকিনীর আশ্রয়ে ঘর বাঁধবার ইচ্ছেয় কিছুদিন বিভোর ছিলাম। কিন্তু অল্পদিনেই মনে হল, মন্দাকিনী যেন বড় মধুর—আত্মবিলোপ করবার শক্তিই ওর সম্বল। ওর বৈচিত্র্য হারিয়ে গেল ক'দিনেই। মন আমার তৃপ্তিতে হাঁপিয়ে উঠল। তার ওপর মন্দাকিনী অসুখে পড়ল। কি জানি হয়ত ওর অন্তঃশীলা মনের প্রবাহে ধাক্কা লেগেছিল প্রচণ্ড, যার আঘাত ওকে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না বেশিদিন। আমার কাছে আত্মনিবেদনের আঘাতে ওর শিকড় কাটা পড়েছিল। তবু কোনোদিন সেকথাও বুঝতে দিত না আমায়, লুকিয়ে এড়িয়ে যেতো। ওর অসুখ বাঁকা চেহারায় মোড় নিল। ওর ওপর একটা ভয়ানক মায়া পড়েছিল দিদি। ওকে বাঁচাবার জন্যে ডাক্তারের পিছনে জলের মত টাকা খরচ করেছি।

—কিন্তু কেবল পয়সা খরচ করে ত মনের খেসারত দেওয়া যায় না।

—তুমি ঠিকই বলেছো। আজ কোনো কিছুই লুকোবো না। আমার মনটা কেমন বাইরে বাইরে কাটাবার জন্যে ছটফট করত—ওর কাছাকাছি গেলে ওর ওপর যে অবিচার করেছি তার জন্যে মন ভারী হয়ে উঠত কি না। তা ছাড়া বাসাডেরা পাহাড়ের সেই বৈশাখের কৃষ্ণচূড়া গাছের মত মাধুর্যময়ী মেয়ে যখন টালিগঞ্জের বাসায় বিছানার মধ্যে মিশিয়ে গিয়ে তার দেহটা মাঘের শেষের নিষ্পত্র রিক্ত কঙ্কালের মত হয়ে উঠল তখন আর

তাকে ভাল লাগবে কেন! বরং দূরে থাকাটাই তখন আমার সাধনা হয়ে উঠ্‌ল।— তবে ওর সেই ডাগর দুটি চোখের স্নিগ্ধ চাহনি ভুলতে পারি নি। সেই অতল গভীর চাহনিই আজ আমায় নীরবে ধিক্কার দিচ্ছে জানো। ও আমায় কিছু বল্‌ত না কোনোদিন, বাঁধবার চেষ্টা করত না বাধা দিয়ে! শুধু ঢেলে দিয়েছিল ওর নিরুদ্ধ প্রেমধারা। আমি তাকে ঠকিয়েছি দিদি।

—তোমার মত মানুষের কাজই করেছো, তাতে দুঃখ করবার কি আছে।

—কিন্তু ওর সেই কালো গভীর আয়ত ভিজে ভিজে তাকানো আমায় পাগল করছে যে! আজও আমি সেটা মন থেকে মুছ্‌তে পারছি না দিদি। শেষকালে ও যখন মরল তখনও তেমনি করেই তাকিয়েছিল।

কয়েকটি কঠিন কথা রমিতার ঠোঁটের ডগায় এসেছিল। কিন্তু অনুকূলের বিবর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মনতা হল। রমিতা চুপ করে রইল।

একটু পরে অনুকূল বল্‌ল—তোমার ছবিখানা বিক্রী হয়ে গেছে। অভাবে পড়েছিলাম, ওর চিকিৎসার শেষ চেষ্টা করেছি সেই ছবি বিক্রীর টাকা দিয়ে। এখন বুঝছি সে টাকায় অভিশাপ ছিল। নইলে ওর অন্তিমকালে যে নার্স রাখলাম ওর তদবির করবার জন্যে আর সেই নার্সকে গোপনে আমারই নিজের—!

ছবির কথাটা অনুকূল নিজে থেকেই যখন তুল্‌ল তখন রমিতার ভুলে যাওয়া বিদ্বেষ দ্বিগুণিত হয়ে জেগে উঠ্‌ল। রমিতা আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারল না। বল্‌ল—তার আগে মেয়েটাকে গলা টিপে খুন করলে না কেন? আগে জান্‌লে তোমাকেই গুলী করতাম। বাসাডেরায় হাত কেঁপেছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে অব্যর্থ লক্ষ্যসন্ধান করতে ভুলতাম না। শিল্পী! অমানুষ! একদিন শিল্পী-মনের মর্যাদা দেওয়াকে উদারতা ব'লে গর্ব করেছি—আজ বুঝেছি সেটা নির্বুদ্ধিতা।

—ওর ভুল আমি শুধ্‌রে দিয়েছি, খুন করার কসুর হয় নি। গভীর রাত্রে নার্সকে ডেকেছে, আমি শুন্‌তে পেয়েছিলাম। তবু সাড়া দিই নি।

তারপর বিছানা থেকে নেমেছে মন্দাকিনী, দেখেছে তার ঘরে কেউ নেই! তারপরও কি সে কিছুই বুঝতে পারে নি? না-ই যদি বুঝবে, তবে এরকম জ্ঞানশূন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মরবে কেন? সহ্যের সীমা জীবনের প্রান্তে এসে থেমে গেছে।

রমিতার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। এতক্ষণের সঞ্চিত সমবেদনায় যেন বারুদ জেলে দিল অনুকূলের শেষের কথাগুলো, ও বললে—বাঃ সুন্দর! সুন্দর তোমার কণ্ঠস্বর, অপূর্ব তোমার বলবার ভঙ্গী, আরও চমৎকার তোমার হৃদয়বৃত্তির নিষ্ঠুর পরিচয়। কিন্তু অনুকূল, স্থান এবং কাল নির্বাচন ঠিকই হয়েছে শুধু ভুল ক'রেছো ব্যক্তি নির্বাচনে! আমি ত আর গলতে পারি না —কখনও কোনো কষ্টিপাথরকে কেউ নরম হ'তে দেখেছে এমন কথা শুনেছো! কি মহৎ তোমার শিল্পী-মনের অনুতাপ। আহা, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। একটু কাজ তোমার এখনও বাকী আছে—একটা তাজমহল বানিয়ে দাও মন্দাকিনীর স্মরণে। তাহলে শেষ কর্তব্য সমাধা হয়ে রায়—যথা একটা পাথর এঁটে দিয়ে এসো পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে—পুণ্যবতী মন্দাকিনী দেবীর স্বর্গকামনায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যদি একটা নলকূপ প্রতিষ্ঠা করে দাও তাহলে মারওয়াড়ীদের মত মহৎ লোক হবে তুমি। তারপর যা খুশি তাই করতে পারো, বিবেকের কাছে মুক্তি!

অনুকূল পাথরের মত নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রমিতার দিকে।

রমিতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—আশা করি তোমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে?

সে কথার জবাব দিল না অনুকূল। তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে মূক বেদনায়। রমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল—তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধে কিছু বলব না। তবে, আমার দেহ বা দেহের প্রতিকৃতি বিক্রয় করার অধিকার একমাত্র আমারই রয়েছে এটা ভুলে গিয়ে তুমি যে ছবিখানা বিক্রী করে আমাকে অপমান করেছ, তার জন্যে আমাকেই কিছু খেসারত দিতে হয়েছে। সেটা ভুলতে পারিনি, বা তোমায় তার জন্যে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না। তোমাকে শিল্পী ব'লে যে সম্মান ক'রেছিলাম, তার

প্রায়শ্চিত্তে তোমার হাতে দিয়েই হোক। তোমার প্রাপ্য যা, তুমি অবিশ্যি নিতে বাধ্য। মেরী মরে যাওয়ায় তোমার মনে একটু কষ্ট হয়েছে—সে জন্যে ভেবো না, দুদিনেই সেটা ঠিক হয়ে যাবে। একদিন অতি নির্জনে আমার সকল মানবিক লজ্জা অপসরণ ক'রে কোনো শিল্পীকে সহায়তা ক'রেছিলাম। সৌন্দর্যের রূপকে সুন্দরতর করার স্পর্ধাই ছিল সেখানে বড়—বিকচযৌবন ব্যক্তিত্বকে ভুলে প্রকৃতির গানে সুর মিলিয়ে ছিল। ...তারপর দুর্ভাগ্য আমার, সে ছবি একটি অমানুষ আর একটি লম্পটের কাছে টাকা নিয়ে বেচে দিল। অনুকূল শুনেছ এ গল্প? শিল্পীর মৃত্যু হয়েছে। আজ এ রাত্রে ছবিখানার মরণ যজ্ঞ হবে। ছবিখানা ভারবাণীর কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছি প্রাণহীন ছবির বদলে সজীব দেহ বিনিময় করে। আজ তোমাকে নিজে হাতে সেই ছবি জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে হবে। পুরুষকে নিয়ে খেলা করাটা আমার নেশা—তার হাতের খেলনা হবার মত তুচ্ছ আমি নই।

স্তব্ধ বিমূঢ় অনুকূল সহসা যেন বিভীষিকা দেখে চমকে উঠল—না, না, সে আমি পারব না, আমায় ক্ষমা করো। সে ছবি আর যা-ই করো পুড়িয়ে নষ্ট করো না দিদি। তুমি জানো না সে ছবি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। দিদি, শোনো—!

কিন্তু ততক্ষণে রমিতা ঘর থেকে ছবি আন্‌তে চলে গেছে।

পরিবর্তন মেয়েকে এ ঘরে আসতে দেখে বললে—আর কত রাত হবে তোর, সান্ত। খাওয়া-দাওয়া কর এবারে, এগারোটা যে বেজে গেছে!

পিতার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিতা বলল—খাবো না বলেছি ত! কিন্তু তুমি এখনও জেগে আছো বাবা!

একটা দীর্ঘশ্বাসে পরিবর্তনের দেহখানা কেঁপে গেল—শাস্তি ভোগ করতেই হবে যতদিন বেঁচে থাকব। অভিশাপ—তোকে মানুষ করবার শাস্তি নেবো না!

রমিতা যেন ধমক দিয়েই বলল—খুব হয়েছে এখন ঘুমোও। আবার ত ভোর রাত্রে উঠে পাড়া জাগাবে!

ম্লান হাসি হেসে পিতা বলে—কানে বুঝি মন্ত্রের বিষ গিয়ে তোর মনেও বিষক্রিয়া সুরু করেছে? তা বলিস ত বন্ধ করে দিই। শুধু ওইটুকুই ত বিসর্জনের বাকী। পিতা আমি, সর্ববিষয়ে অপরাধী। তাই হবে—কাল থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করব না আর। জয় শঙ্কর!

ইদানীং রমিতা পিতাকে আঘাত দিয়ে তেমন আর খুশি হতে পারে না। অথচ এককালে প্রতি পদক্ষেপে পরিবর্তনের ঘাড়ে নিজের তাবৎ অন্যায়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েই ও নিশ্চিন্ত থাকত। আজকাল কিছু বলতে গিয়ে মনে হয় অসহায় একটি প্রাণীকে এভাবে আক্রমণ করায় গৌরবও নেই, নিষ্কৃতিও নেই। তবু আঘাত দেওয়াটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতেই দু'চার কথা বলে, পরে বুঝতে পারে যে কাজটা কত দূর অনভিপ্রেত।

ছবি নিয়ে এ ঘরে রমিতা ফিরে দেখল অনুকূল নেই। শূন্য ঘরখানায় একটা রহস্যময় নীরবতা। নীরবতা ছাড়া আর আছে অনুকূলের বিষণ্ণ বেদনার্ত মুখের প্রতিচ্ছবি। মেরীকেও রমিতার মনে পড়ছে। মেরীর ছবি এত স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ল কেন এতদিন পরে? মেরী যেন আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘের নীচে পাহাড়ের পটভূমিকায় শ্যামল পুষ্পিতা কৃষ্ণচূড়া! ওর শ্যামলী দেহকে লীলাময় করে তুলেছে রঙীন ফুলের মত হাসি। রমিতার হাত থেকে ছবিখানা পড়ে গেল।······অনুকূল সেই মেরীকে তিলে তিলে ক্ষয় ক'রে নিঃশেষিত করল।

নীচু হয়ে ছবিখানা কুড়িয়ে নিল রমিতা। কাচটা ফেটে গেছে কিনা পরখ করবার জন্য ছবিটা ভালো করে দেখতে গিয়ে রমিতা তন্ময় হয়ে গেল। এত ভালো করে ও দেখে নি নিজের রূপমাধুর্যকে। বনসৌন্দর্যের সঙ্গে ছন্দ মেলেনি এ ছবির। শ্যামশোভায় প্রকৃতির কোনো কুণ্ঠা নেই, কিন্তু এই মানবীমূর্তির দীর্ঘ পক্ষ্মচ্ছায়ায় ব্রীড়াসঙ্কোচের রহস্য সুব্যক্ত। সত্যিই এ চিত্র রমিতাকে মুগ্ধ করল আজ। এতদিন কি একটা বিরূপতা ছিল ছবিখানার উপর, সেজন্য ভালো করে তাকিয়ে দেখে নি ছবিটি। রমিতা নিজেই বাধা দেয়—না, না, এ ছবি নষ্ট করতে পারব না। অনুকূল ঠিকই বলেছে।

আবার ওর মনে হ'ল—হয়ত অনুকূল বড় শিল্পী! খুব বড় শিল্পী না হ'লে এমন সাম্রগ্রন্থের কল্পনা সম্ভব নয়। রমিতা ছবিখানা নষ্ট করলে ক্ষতিই হবে। …অনুকূল কি সেই সর্বনাশের কল্পনায় ভীত হয়ে চলে গেল!

সোফায় বসে রমিতা অনুকূলের কথা ভাবছে। উল্কার মত এক একবার এই মানুষটা কোথা থেকে উদয় হয়ে রমিতার মনোজগতে প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দিয়ে আবার জনসমুদ্রে মিশে যায়। এত রাতে অনুকূল কোথায় গেল! যানবাহন ত কিছুই পাবে না। আজ রাত্রে কলকাতার অনেক অঞ্চলে কারফিউ জারী হয়েছে। রমিতার রীতিমত দুর্ভাবনা হয়। এমনিতেই ওর মুখটা কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছিল—এত রাতে কোথায় ঘুরে মরতে গেল অনুকূল।

অনর্থক একটি শোকসন্তপ্ত মানুষকে আরও জর্জর করাটা খুবই ছোট মনের পরিচয়। রমিতা কি শেষে এইভাবে তলিয়ে যাচ্ছে? ওর মনে মানুষের ওপর এতটুকু সমবেদনাও আর সঞ্চিত নেই!

হঠাৎ গিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা হাঁতে তুলে নিয়ে ডাকল—থানার বড়কর্তাকে।

তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ কি হয়েছে? মাতাল; না, প্রণয়ী? চোর, না ডাকাত?

রমিতা আপন মনেই হেসে নিল খানিকটা। তারপর বললে—না, না সে সব কিছু নয়। একটি বিশেষ লোককে আমার দরকার।

ও তরফ থেকে প্রশ্ন হল—কে সেই ভাগ্যবান?

—একটি অতি-সাধারণ মানুষ। সব ছিল তার।

—আজ্ঞে অতীতের কথা যদি বলেন তবে এ অধমেরও আছিল বিস্তর ঠাট। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে হাসতে হেঁচকী তোলার মত শব্দে টেলিফোনটা যেন ভেঙে ফেলবার উপক্রম করলেন তিনি।

রমিতা রিসিভারটা কান থেকে সরিয়ে নিয়ে একটু অপেক্ষা ক'রে তারপর আবার বললে—আপনি যদি একটু অনুগ্রহ করে তাকে ধরেন।

—বাঃ এইটুকু পারব না? আপনার জন্যে আরও সাংঘাতিক কিছু বললে তাও অসাধ্য নয়।

—না, না, তার দরকার নেই আপাতত। এই মিনিট দশেক হবে আমার এখান থেকে তিনি বেরিয়েছেন—আধ ময়লা কাপড়, তবে একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় এককালে রূপ ছিল।

—অত ওজন করে দেখবার মত চোখ ত আমার কনিষ্ঠবলদের নেই। তার চেয়ে বলুন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যতগুলো ভ্যাগাবণ্ড প্রচুর মদ খেয়েও যার পা টলছে না, এইরকম লোক—এ অঞ্চল দিয়ে যাবে তাদের হাজির করবে ওরা—তারপর আপনার মনোমত একটা বেছে নেবেন। তাই চান ত!

—না, না, শেষে কাকে ধরতে কাকে ধরবেন! রমিতা অত্যন্ত বিপন্নভাবে বলে।

—আপনার সে দুর্ভাবনায় কাজ কি। এই রাত বারোটায় কাতারে কাতারে মিছিল করে রাস্তা জুড়ে লোকে যাবে না।

—তাই বলে নিরপরাধ—

—উঃ হঠাৎ আপনি বিশ্ববাসীকে এত উঁচু বলে ঠাওরালে ত আর রক্ষা নেই। নিরপরাধ কেউ ধরা পড়ে না, ধরা পড়লেই সে অপরাধী। এখন নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন। ঘণ্টাখানেক পরে খবর পাবেন।

—আচ্ছা তাই হবে।

বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমিতা টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় বসে রইল রমিতা। কাঁটাটা বড়ো আস্তে আস্তে ঘোরে। একটানা আস্তে আস্তে চলার মধ্যে মাপা ছন্দ আছে কিন্তু বৈচিত্র্য কই! না, একে ঠিক ছন্দও বলা চলে না, শুধু নিয়মই বলা উচিত। ছন্দের পথে সুরের মাধুর্য, ধ্বনির বিভিন্ন সঙ্গীত, চিন্তার অবকাশ, জীবনের প্রকাশ সম্পদ থাকে। এ ত তা নয়—যোগফলকে বেঁধে নিয়ে পথ চলা, ভাগ করে করে সময়কে দেখানো, এর মধ্যে ছন্দ নেই, আছে শুধু সূক্ষ্ম খণ্ডতার পরিচয়।…

থানায় অনুকূলকে পাওয়া গেল না। খুব কম করে জনাতিরিশ লোক

জমা রয়েছে একটা স্বল্পালোকিত ঘরে। বিশ্রী দুর্গন্ধে গা বমি ক'রে ওঠে। আবদ্ধ বিচারসাপেক্ষ সকলেরই চোখে মুখে আতঙ্ক এবং বিষণ্ণতা মাখানো। এরই মধ্যে একটি ছোক্‌রা আর একজনের গা টিপে চাপা গলায় বললে—মাইরী দেখেছিস, রমণি এসেছে।

যাকে উদ্দেশ্য করে সে কথাগুলো বলেছে সে আরও অবাক হয়ে গিয়ে বলে—যাঃ, এই এঁদো জায়গায় তার আসতে দায় পড়েছে।

—বাজী ফ্যাল।

—আচ্ছা, একটা বায়স্কোপ বাজী! ছাড়া পেলে 'ফুল ডোরে বাঁধা' ছবিখানা দেখাবে, যে হারবে তার গাঁটগচ্ছা!

পরক্ষণেই উৎসাহী ছোক্‌রাটি ধাক্কাধাক্কি করে সবার সামনে এসে একটু গলা বাড়িয়ে গুছিয়ে কথা বল্‌বার চেষ্টা করে—বড়কর্তার সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করে বললে—শুন্‌ছেন স্যার!

সম্মানিত প্রাণী মাত্রকেই 'স্যার' বলা ভদ্রতা—এ তার দৃঢ় বিশ্বাস।

তার এ আহ্বানে বড়কর্তা অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন, মেয়েটিও না তাকিয়ে পারল না। ছেলেটি বল্‌লে—আপনাকে বল্‌ছি স্যার! এই দেখুন হাতে কাঁচি আর চটু রয়েছে—বিড়ির পাতাও আছে এতে। বুঝলেন, আমরা কারিগর—বিড়ির দোকানে কাজ করে ফিরছিলাম দু'জনে, এঁরা ধরে নিয়ে এলেন।

বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ ছল্‌ছলিয়ে উঠ্‌ল।

বড়কর্তা ধমক দিয়ে বল্‌লেন—যাও বস গিয়ে—বেয়াদপ! কমিউনিস্টদের উৎপাতে আজকাল বাঁদরগুলো মাথায় উঠতে চায়।

মেয়েটি একটু বিস্মিতভাবে বল্‌লে—কেন, ওর সঙ্গে কম্যুনিষ্টের সম্পর্ক কি!

বড়কর্তা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—আর বল্‌বেন না। বাড়াবাড়ি করলেই সব উপোস ক'রে বসবে, মিছিল বেরুবে! দেখতেই ত পান খবরের কাগজে—! সত্যাগ্রহ আজকাল লেগেই আছে, কাজেই আসামীদের খাতির করে চল্‌তে হয়। নইলে এরকম বেয়াদপীর জবাবে পঞ্চাশ ঘা দেওয়া রেওয়াজ

ছিল আগে! হাত নিস্‌পিস্‌ করে! যাক গে চলুন! আপনার লোক তাহলে এর মধ্যে নেই। সে হয় ত আরও ভালো জায়গায় এখন 'টুনটুন্ পেয়ালা'য় মশগুল! আপনিও যেমন—

বড়কর্তার সঙ্গে মেয়েটি চলে গেল। তারপর সেই বিড়ি-বাঁধা কারিগরটির মুখে খই ফুটতে লাগল—সে আজ স্বয়ং এতবড় চিত্রতারকা রমিতার সঙ্গে সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। এই তরুণীই যে বিখ্যাত রমিতা দেবী তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। উক্ত কারিগরটি বন্ধুকে বেশ ধমক দিয়েই বল্‌লে—আবে দোস্‌, দেখলি ত! মাইরি আর একটু সময় পেলে—ওই ইয়েটা অমন ধম্‌কে না উঠ্‌লে, মাইরী বলছি ঠিকানাটা আদায় করে নিতুম।

বন্ধুর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে শ্রীপতি বললে—তা হলে বল্‌ আমারই জন্যে হল! আমার হারতে হারতে ঝোঁক চেপে গেল,—আরও খেল্‌ব, আরও খেল্‌ব, সেই করে করে এতটা রাত হয়ে গেল তবেই ত পুলিশে ধরল—যদি পুলিসে না ধরত তবে কি আর দেখ্‌তে পেতিস!

এইভাবে সে প্রমাণ করে তার নিজের কৃতিত্ব। আর বাকী যারা ওখানে ছিল তারা কেউ কেউ এই আলোচনায় যোগ দিল কেউ বা নীরবে শুন্‌তে লাগল।

অফিসার হাঁক দিলেন—দর্‌ওয়াজা!

ঘুম জড়ানো চোখ মুছতে মুছতে একটি কন্‌ষ্টেবল এল। বলল—হুজুর!

—গাড়ী!

—তৈয়ার হুজুর।

আবার সেই বিষণ্ণ লোকগুলির সামনে দিয়েই রমিতাকে যেতে হয়। তার দিকে তাকিয়ে থাকে এরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে। প্রশংসা ছাড়া আর যেটুকু আছে সেটা বিস্ময়। তার বেশি কিছু এরা কল্পনা করতে পারে না। চিত্রতারকা রমিতা দেবীকে চাক্ষুষ দেখার গৌরব এদের অনেককেই অভিভূত করেছে। শ্রীপতি বন্ধুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে—দেখেচিস! দেখেই বোঝা যায় খুব উঁচু ঘরের মেয়ে!

তার বন্ধুটি বললে—তা বুঝি জানিস না—শালা, খবর রাখিস কেবল জুয়ার কড়ির, ও হচ্ছে কোথাকার জমিদারের মেয়ে।

—রেখে দে তোর বুজরুকী! আমার দিদি ললিতাকেও ত ফিলিমে নিতে চেয়েছিল। যদি নামতো দিদি তবে ওকেও জমিদারের নাতনী ব'লে চালিয়ে দিত।

—আহা দেশে মেয়ের অকাল পড়েছে! তোর দিদি—!

—একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যেতো। আমিই ত বললুম, জান থাকতে ওসব সইব না। বিড়ি বেঁধে মা-দিদিকে খাওয়াতে পারব না তবে কিসের মরদ!

—ওই মুখটা না থাকলে আর বাঁচতে হত না তোকে। এই এক মাস হতে চলল বাড়িমুখো হস নি, সে আর কে না জানে! তোর মা ত কালও আমাদের পাড়ায় খোঁজ করতে এয়েছিল। বুড়ো মাকে কষ্ট দিস তাই জন্যে ত ভগবান সাজা দিচ্ছে। এখন হাজতে কদ্দিন পচতে হয় ছাখ। তোর সঙ্গে পড়ে আমারও নাজেহাল! তবু বলিস, ভগবান নেই।—যদি নেই ত আজ এখানে ঠাণ্ডি আরাম খাচ্ছিস কেন। মাইরি, আর কোন্ ইয়ে বদ্‌খেয়াল করে!

বন্ধুর এই মর্ম-আক্রমণকারী সমালোচনায় শ্রীপতি অস্বস্তি বোধ করে। সত্যি মা-বোনের ওপর সে খুব অবিচার করছে। এবার ছাড়া পেলে সে নিশ্চয় বাড়ি ফিরে যাবে। একটুকু চুপ করে থেকে শ্রীপতি বললে—সত্যি ভাই পাজি নেশাটা ছাড়তে হবে। যা রোজগার করি কোথা দিয়ে উড়ে চলে যায় দেখতে পাইনে। এই ধর না আজকের কথা—তোর কত গেল?

—দু টাকা সাড়ে তেরো আনা।

—তবেই বোঝো! আজ কিন্তু পল্টু শালা বড় লোক হয়ে গেল। তা খুব কম করে বারো তেরো টাকা জিতেছে—না রে!

—তার বেশি হবে। মানে, ভারী মজাদার খেলা, জিততে পারলে কেমন মৌজ হয় তা বল্।

শ্রীপতি বয়স্ক সমঝদারের মত বিজ্ঞভাবে ঘাড় হেলিয়ে বলে—তা যা বলেছো। দেখি একটা বিড়ি দে! কিন্তু—

দু'জনে বিড়ি ধরিয়ে মুখ বুজে টান্‌তে লাগল। আশপাশের অনেকেই বসে ঝিমোচ্ছে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ একটু শোবার ব্যবস্থাও করে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে নাক ডাকাতে শুরু করেছে। হয়ত এদের অনেকেই থানা কেন জেলখানা পর্যন্ত ঘুরে এসেছে ইতিপূর্বে, তাই এই দার্শনিক সুলভ নির্বিকার ভাব।

পরদিন সকালে আশাতীত ভাবে মুক্তি পেয়ে শ্রীপতি বুড়োশিবের নামে সওয়া পাঁচ আনা পূজো বরাদ্দ করে বসল। আর স্থির করে ফেলল এবারে বাড়ি ফিরে মায়ের দুঃখ সে ঘোচাবেই। বাড়ি থেকে ঝোঁকের মাথায় পালিয়ে এসে অবধি একটানা ঝামেলা তার লেগেই আছে—অবিশ্যি হোটেলে হরদম ডিম, মাংস ইত্যাদি খুব খেয়েছে শ্রীপতি। সত্যি কথা বলতে কি এসবে এখন অরুচি হয়ে গিয়েছে তার। মা যেমন সাম্‌নে বসে খাওয়ায়, দিদি যেমন নিজের মুখের খাবারটা তুলে দেয় তেমনটা এরা কেউ করে না। হোটেলের ঠাকুর ঠকাস করে থালাটা ফেলে দিয়েই চলে যায়, ভালোমন্দ বিচারের কথা কেউ শুনতে রাজি নয়। এরা জানে পয়সা—মানুষকে পয়সা দিয়ে ওজন করে এরা। শ্রীপতির বন্ধুদের মধ্যেও সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এই ত সেদিন সন্ধ্যে বেলায় কড়ি খেলতে বসে পয়সা ফুরিয়ে গেল—বাঁ দিকের ট্যাঁকে খোরাকী বাবদ আট আনা আলাদা করে রেখেছিল শ্রীপতি। জেদের বসে সেটাও বার করে খেলে দিলে, ভেবেছিল এবারে জিতবে, কিন্তু হেরে গেল সে। এক একদিন এরকম 'বেপোট' পড়তা সকলেরই হয়। কিন্তু হরিপদর কাছে চেয়ে একটি আধলাও হাওলাত মিলল না। এরা সবাই সমান। রাতে সেদিন ওর খাওয়া জোটেনি, সবাই ত জানে তা। অবিশ্যি তাই বলে যে এদের সঙ্গ বাদ দিয়ে শ্রীপতি সাধু হয়ে যেতে পারবে এমন কথা সে নিজেও বিশ্বাস করে না। তবে রাত্রে থানায় বসে ভেবেচিন্তে এটা তার ধারণা হয়েছে যে, মা আর দিদির মনে মিথ্যে কষ্ট দেওয়ার শাস্তি দিয়েছেন ভগবান। তা ছাড়া থানায় আটক থাকার খবরটুকু

চাপা দিয়ে 'ফিলিম এক্টার' রমিতাকে দেখার গল্পটা অন্তত দিদির কাছে করতেই হবে।

অতঃপর সোজা বাড়িমুখো রওনা হল শ্রীপতি। পথ চলতে চলতে শ্রীপতি হঠাৎ একটা মনোহারী দোকানে ঢুকে দিদির জন্য একখানা 'টার্কিস বাথ সোপ' কিনলে আর মায়ের জন্যে জর্দা চার আনার। দোকানীকে বার বার বলে দিলে—ভালো জর্দা দিও, কাশীর জর্দা—আরও কিছু কিনতে পারলে ভালো হত কিন্তু ট্যাঁকের অবস্থা সঙ্গীন, পুঁজি রইল বাস ভাড়া বাদে আনা আষ্টেক পয়সা। কিছু হাতে থাকা ভালো, কি জানি বাড়ি গিয়ে কি অবস্থা দেখতে পাবে তার ঠিক কি! তেমন দরকার পড়লে কিছু না হোক ছাতু চিড়েটা কেনার পয়সা ত রইল।...

বস্তির কাছাকাছি এসে শ্রীপতির বুকের মধ্যে একটা কিসের যেন দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। এই পথটুকু ছুটে চলে যেতে চায় তার মন। কত প্রশ্ন ভীড় করে এসেছে। তার মা কি রকম ভাবে, কত কথা জিজ্ঞাসা করবে। দিদি হয়ত প্রথমটা কথাই বলবে না। না বলুক, দিদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেই দিদির যত কিছু রাগ ধুয়ে শরতের আকাশের মত হাল্কা হয়ে যাবে। যে যাই বলুক, দিদির জন্য শ্রীপতির দুঃখ হয়—ওদের পরিবারে ললিতাকে যেন বেমানান দেখায়। অমন মাজা রঙের ওপর এমন একটা আলগা শ্রী আছে যা নাকি আধুনিক ভদ্র পরিবারেও খুব বেশি দেখা যায় না।

মনে মনে অনেক কিছু ছকে রেখেছিল শ্রীপতি—কিন্তু বস্তির মুখে এসে ওদের ঘরের চালার ওপর লতানো পুঁইগাছটা দেখেই ওর মনের গোছগাছ সবকিছু আবেগের প্রবাহে এলোমেলো হয়ে গেল। শ্রীপতি এক দৌড়ে বাকী পথটা অতিক্রম করল। বস্তির আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগে সে দাওয়াতে গিয়ে উঠতে চায়।

ঘরের দরজায় একটা মিলারের তালা ঝুলছে—তালাটার বয়স হয়েছে বেশ। ওর মা যখন হাজিপুরের মেলায় গিয়েছিল এটা সেই সময়ের কেনা। এখন আর ওটাতে বস্তুত কিছু কাজ হয় না, টানলেই মরচেপড়া স্ক্রুগুলো

একবার আর্তনাদ করে, হাঁসুলীটা খুলে আসে। লোক দেখানোর জন্যে ওটা লাগানো হয় সাড়ম্বরে এবং তালা খোলার সময়ও চাবী লাগিয়েই খোলা হয়। অন্যদিন হলে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে শ্রীপতি তালা খুলতে দ্বিধা করত না—আজ কেন যেন ইচ্ছে করল না। সে হতাশ হয়ে দাওয়াতে বসে পড়ল এবং নিজের অজ্ঞাতেই মায়ের ওপর চটে গেল—তার তাবৎ সাধু সংকল্প কোথায় মিলিয়ে গেল।

একথা-সেকথা ভাবতে ভাবতে শ্রীপতি ঘুমিয়ে পড়েছিল। থানার ঠাণ্ডাঘরে কাল রাত্রে মোটে ঘুম হয় নি—আশপাশের দুর্গন্ধের জন্য নয়, মানসিক উত্তেজনায় তরুণ স্বপ্নাতুর মন অস্থির হয়ে ছিল, তাই সে চোখ বুজতে পারে নি একটুও। আজ অবসন্ন মন, ক্লান্ত দেহ, ঘুম ঠেকায় কার সাধ্য। যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে—ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। ওদের ঘরের দরজা তেমনিই বন্ধ আছে।

শ্রীপতি উঠে বসে চোখ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। একবার মনে হল গোপালের দোকানে বসে একটু চা খেয়ে এলে হয়—কিন্তু এখন যেন আর কিছুতেই উৎসাহ নেই। একটা বিড়ি ধরিয়ে শ্রীপতি অন্যমনস্ক ভাবে টানতে লাগল। হালদারদের জগা ওকে দেখে একটু হেসে বললে—কি রে ছিরিপতি ডানা গজিয়ে খাসা চেহারা বানিয়েছিস যে!

শ্রীপতি জগাকে একটু ভয় করে—জগার যা ষাঁড়ের মত চেহারা, যদি এক ঘা বসিয়ে দেয় তাহলে হাড়-হাড্ডি গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই ভালো। জগাকে সে ভয় করে, অপছন্দও করে, ও লোকটা চোখের আড়াল হলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে শ্রীপতি।

কিন্তু জগা গেল না, দাওয়ার ওপর চেপে বসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল শ্রীপতিকে। হাস্তে হাস্তে বল্লে—আরে ভাই, শালার ছোটলোক কখনও বড়লোক হয়! এই যে তুমি ছিরিপতি—তোমার মা যতই বাহার করে নাম রাখুক না, তুই শালার সেই বিচ্ছিরিই থাকবি। নইলে আমি একটা মাস্তো বড়ো বেক্তি, আমার মুখের ওপর ত ধোঁয়া

ওড়াচ্ছিস্, তা বেশ বাবা নিজে বিড়ির কারিগর, তোর ক্ষেতের ফসল খুব খাবি, কেউ মানা করছে না। ভদ্দরতাই করে দু'চারটে আমাদের দিয়ে খেলেই তো পারিস্। খাতিরকে খাতিরও হলো আবার মৌতাতকে মৌতাতও হ'লো।

শ্রীপতি সসঙ্কোচে গোটা-দুই বিড়ি বার করে এগিয়ে দিল।

জগা সস্মিত বদনে একটি বিড়ি ধরিয়ে বল্‌লে—আর তোর ভাবনা কি, মা-বোন সবাই রোজগার করছে, তুই ডানা মেলে এন্‌তার উড়তে থাক।

শ্রীপতি জগাকে ভয় করে ঠিকই, কিন্তু অল্পবয়সে উপার্জন করতে শিখেছে ব'লে স্বভাবতই সে একটু স্বাধীনচেতা। জগাই-এর মুখের ওপর সে বলে দিল—বেশ আমার মা-বোন রোজগার করে তাতে কার কি!

—ওরে বাপ্‌রে, তোর যে দেখি ভারি গরম। তা হবে, পয়সার গরম যাবে কোথায়! তোরাই দেখালি বটে বাবা!

জগা আর বিশেষ কিছু না বলে চলে গেল। শ্রীপতি অগ্নিদৃষ্টিতে জগাইকে যতক্ষণ দেখা যায় সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। লোকটার সব কথায় নাক গলানো স্বভাব—বসে বসে খায় আর আখড়ায় কুস্তী লড়ে, একটু কাজ করতে হলেই ঝেড়ে জবাব দেয়—পারব না, আমার মেহনতের দাম দেয় কে। শরীরটা তৈরী করা কি ভূতের ব্যাগার দিতে? দস্তুরমত তোয়াজ ক'রতে হয় এই শরীরের!

কিছুদিন ধরে ললিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার চেষ্টায় ছিল জগা, সেইজন্তে শ্রীপতি ওকে আরও বেশি অপছন্দ করে।

ললিতার মা বাড়ি ফিরল অনেক বেলায়। ছেলেকে দেখেই বল্‌ল—তা এতটা বেলা হয়েছে, এখনও ছ্যান করিস নি কেন! তেল চাপড়ে মাইতিদের পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আয়।

শ্রীপতি প্রশ্ন করল—হ্যাঁ মা, দিদি কোথায়?

—কেন, শুনি! সে কাজে গিয়েছে।

—কাজে?

—হ্যাঁ, নইলে ডান হাত মুখে উঠবে কি করে শুনি।

—ওঃ, তা কখন আসবে! দিদি এলেই না হয়—

—থাক, থাক খুব যে, দিদির দরদে গলে পড়ছেন! যাও বাবা খুব হয়েছে। তোমরা সব কোকিলের ডিম ছিলে, এখন আমি হচ্ছি কাগ—যা! একে একে নিজের পথ ছাখো-সে!

শ্রীপতির গলা বেয়ে কি যেন একটা শক্ত জিনিষ ওপরদিকে ঠেলে উঠছে। ছলছল চোখে ও বললে—ছাখ্ মা, আমায় এখন কিছু বলিস না, মনটা ভালো নেই।

—আহা, রোজগেরে ব্যাটা আমার! শুধু তোমারই মন আছে, বুড়ো মায়ের ত ওসব বালাই নেই। যা চ্যান করে আয় বেলা হয়েছে ঢেক।

—এই যাচ্ছি। দিদি কখন আসবে মা!

—তার কথা বলিস না বাবা। এই সেদিন পর্যন্ত রোজই ত রাত আটটা ন'টায় আসছিল। এদানে নাকি কাজের চাপ খুব, বাবুদের বাড়িতে অনেক লোক এসেছে। রোজ আর আসতে পারে না। তা খবর পেলে আসবে বই কি! ওরা মাইনে ভালোই দেয়। খাওয়া দাওয়া ভালো, আদর যত্ন করে খুব।

—খুব ভারী কাজ, বুঝেছি! দিদিকে ছাড়িয়ে আনো। আর তোমাকেও চাকরী করতে দেবো না। এই বলে দিলাম।

—আচ্ছা বাবা, দু'দণ্ড থির হয়ে বস, খেয়ে-দেয়ে তারপর ওসব হবে। তোমাদের দরদ দেখ্তে দেখতে বুড়িয়ে গেলাম। হুঃ।

—না, মা আমি আজই বলে দিচ্ছি!

শ্রীপতি মায়ের মুখের পানে চেয়ে থাকে।

ললিতার মা শুধু বলল—সে কপাল কি আমার হবে রে!

একটা দীর্ঘশ্বাস কিছুতেই দমন করতে পারে না ললিতার মা।

শ্রীপতি এই মুহূর্তেই নিজের মতামত জাহির করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। এই কদিনে ও বুঝতে পেরেছে যে, বাইরে বাইরে থেকে যতই মাছ-ডিম মাংস খাওয়া যাক না কেন, মা-দিদি কাছে না থাকলে শান্তি নেই। ওর একটা উচ্চাশা ছিল জুয়া খেলে বড়লোক হবে, সে আশাও সুদূরপরাহত—

'পেঁচো-কেনা'রা সব গল্প করে বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজনও তেমন বড়লোক দেখতে পায় নি শ্রীপতি। উল্টে এই সাতাশ দিনে বাজারে শ্রীপতির কিছু দেনাই হয়েছে।

সেদিন শ্রীপতি মায়ের পা-ছুঁয়ে সংকল্প করল—জীবনে আর সে কড়ি খেলবে না। তবে হ্যাঁ বছরের একটি দিন সে নিজের এক্তারে রাখতে চায়। সেটা বড়দিনে ক্যাপের ঘোড়দৌড় খেলার দিন। ছেলের এরকম পরিবর্তনে মায়ের হাত-পা কাঁপতে থাকে, একটা বিদ্যুৎপ্রবাহে প্রৌঢ়ার সারা দেহ অবশ হয়ে এল। সত্যিই কি শ্রীপতির মতি ফিরল?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মা বললে—এই ত বাবা, সবই বুঝিস! আমি একটা কথা বলি শোন্, দিদি যেমন কাজ করছে করুক। আর আমারও সরকারদের বাড়িতে এমন কিছু মেহনৎ করতে হচ্ছে না। তিনজনে মিলে যদি ঠিকমত রোজগার করতে পারি, তাহলে দেশে একটু জমি নিয়ে চার পাঁচ বছর পরে গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসা যাবে। তোর একটুকুন্ সংসার পেতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি। বলি, আমাদের জীবন যেমন করে গেল, তোকে যেন আর এই বস্তিতে কাটাতে না হয়।

শ্রীপতি বললে—মিছেমিছি তুমি দিদিকে শ্বশুর ঘর করতে দিচ্ছ না মা। নফর দা ওকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে কতদিন ধরে—পাঠিয়েই দাও না। বিয়ে যখন দিয়েছ, তাকে শ্বশুর ঘর করতেই হবে। আমার বিয়েটিয়ে ওসব কথা মুখে এনো না। বিয়ে আমি করব না।

—বিয়ে করবি না ত কি ধর্মের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াবি। আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেবো না। হালদারদের জগাই হয়ে লোকের দোর দোর ঢুঁ দিয়ে বেড়ানো—ছি-ছি!

সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দিদির কথাটাই শ্রীপতি তুললে আবার—তুমি সরকার বাড়ি যাওয়ার পথে দিদিকে পাঠিয়ে দাও মা। বাবুরা এমন কিছু লাটসাহেব নয়, দিদি একদিন একবেলা কামাই করলে তারা মরে যাবে না। ইস্, কতদিন দিদিকে দেখিনি!

ছেলের এ কথায় ললিতার মায়ের বিস্ময়ের অবধি রইল না—তুই বলিস

কি! হদ্দমুদ্দো বসে বসে কাজ কামাই করলে আর পরের দোরে খেটে খেতে হবে না। কথায় বলে, 'থাকতে বলদ না বয় হাল তার কষ্ট ছেরড়া কাল!' আমি মা হয়ে মেয়েকে তেমন বদ শিক্ষে দিতে পারব না, আখেরে ওর যাতে নাজেহাল—!

শ্রীপতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল—ওসব জানি নে, তোমার ধম্ম তুমি জানো। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে নিজের কাছে আটকে রাখা কি ধম্ম জানিনে। আমি তাহলে যাই তোমার সঙ্গে দিদিকে দেখে আসি চলো!

—ধরে রাখতে ভারি সাধ আমার! তোমার দিদি গেলেই পারেন। আমি কি তাকে বেঁধে রেখেছি? সে ত যেচে পরের বাড়ির কাজ নিলে—বলে কি, 'বসে-বসে থাকলে ভাত হজম হয় না মা'। কত করে মানা করলাম, কিসের কি, ওই এক মেয়ের জেদ—বললে, 'শ্বশুর বাড়ি যাবো না। ওরা লোক ভালো নয়'—ব্যাস, জন্মের মত নিশ্চিন্দি। শ্বশুর বাড়ির পিঁপড়েটা পর্যন্ত দেখলে ও জ্বলে যায়। আবার ঝোঁক যখন চাপল, 'বসে বসে গতর পুষব না' তখন আর তাকে ঠেকিয়ে রাখে কার সাধ্যি। নিলে চাকরী। তবে হ্যাঁ কপাল গুণে গোপাল জোটে। পড়ত তেমন জাঁহাবাজ বাড়িতে তাহলে বুঝত চাকরীর ঠেলাটা। তা ত হ'ল না। খাওয়াপরা বারো টাকা মাইনে, কাজও এমন কিছু না, বড়লোকের বাড়ি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো। ওই যা একটু চোখের সামনে হাজির থাকতে হয়।

—ওসব কিছু বুঝি না। যার যা—তার তা! দিদিকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতে হবে। আর তোমাকেও কাজ ছাড়তে হবে—একটু চেপে খাটলে দিনে দু'টাকা আমি আনতে পারি। তাতে দুটো মানুষের হেসে খেলে চলে যাবে! কাজে যাবার সময় দিদিকে একটা খবর দিয়ে যেয়ো তুমি! সে যেন আসে, আমি আর ওইসব বড়লোকের বাড়ি যেতে চাই নে। ওরা এমন বিচ্ছিরি ভাবে কথা কয় যে কান মাথা গরম হয়ে ওঠে!

ছেলের কথার কোনো বাদানুবাদ না ক'রে ললিতার মা দোক্তা গালে টিপে দিয়ে বললে—বেশত তাই হবে। এ মাসখান যেতে দে! তুই হাকিমের মত এখানে বসে থাকলে পয়সাটা আনবি কি করে শুনি! রাতভরে

সকাল সকাল ফিরবি, তখন সব কথা হবে—এখন কি খবর দিলেই তড়িঘড়ি আসতে পারবে ললিতে!

—আচ্ছা বেশ তাই—তাই। নেয়ে খেয়ে আমি কাজে বেরুচ্ছি—তুমি যেন দিদিকে খবরটা দিও। খবর পেলে সে নিশ্চয় আসবে।

কাঁচি এবং একটুকরো চটে জড়ানো সরঞ্জাম নিয়ে শ্রীপতি বেরিয়ে গেল। ললিতার মা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে হাই তুলে যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়। শ্রীপতি যেমন হঠাৎ চলে গিয়েছিল তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে এলো দেখে ললিতার মায়ের যতটা খুশি হওয়ার কথা, ঠিক সেই পরিমাণ আনন্দের আস্বাদ ললিতার মা বর্তমানে পায় নি। তার সবচেয়ে উদ্বেগ ললিতাকে নিয়ে। শ্রীপতিকে এ বেলার মত ঠেকিয়ে রাখা গেল বটে, কিন্তু রাত্রে কি বলবে! এই নিয়ে যদি একটা কথাও বস্তীর আর কেউ শুনতে পায় তাহলে সব কিছুই রাষ্ট্র হয়ে যাবে। বড়লোকের বাড়ির চাকরী, বারো টাকা মাইনে—এসব কথা তখন আর খাটবে না। এ কটা দিন বেশ কাটছিল, হঠাৎ শ্রীপতি এসে যেন একটা বিরাট ছন্দ পতন ঘটিয়ে দিল। যে সন্তানের অদর্শনে মায়ের অন্তর বেদনার্ত হয়ে ফেটে পড়তে চেয়েছিল আজ সেই সন্তানকে দেখেই এত দুর্ভাবনা, এত উদ্বেগ!

আর কোনো উপায় নেই। এখনও সুস্থ অবস্থায় আসতে ললিতার খুব কম করে আট দিন সময় লাগবে। তারপরও ঠিক এখানে আনা চলবে না মাসখানেক।...কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ ললিতার মা দেখতে পায় নি। ললিতার মত এই সেদিনের মেয়ের যদি বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতে ছেলে হতে শুরু করে তবে একদিন চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে নিয়ে বেচারীকে উপোস করে মরতে হবে যে! আর নফরচন্দ্র ত তখন তার দিকে ফিরেও চাইবে না। পুরুষদের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে ললিতার মায়ের। এই জীবনটা তাকে অনেক কিছু রূঢ়সত্য বুঝতে শিখিয়েছে। যে যাই বলুক, ললিতার মা নিজেকে দিয়েই বুঝেছে যে, পড়ে পড়ে মার খাওয়ার মাহাত্ম্য কিছু নেই। পুরুষদের জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়ে শেষটা দেখা যায় যে, প্রতিদানে ফাঁকা শূন্য মিলেছে। তার চেয়ে জৈবধর্মের

ফলাফলকে পথের পাশে রেখে দিয়ে আপনার জীবনটুকু সযত্নে রক্ষা করে চলাই শ্রেয়। এই জ্ঞানটুকু ললিতার মা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে পেয়েছে। অনেক দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিয়ে, অনাহার, অত্যাচার,' মন্বন্তর সহ্য করে, দু'টি সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে, এই ভগ্নাংশ দুটিকে নিয়ে আজও বেঁচে আছে ললিতার মা। এ ভাবে বাঁচার দুঃখ যেন ওর সন্তানেরা না পায়।...

একটু আগে শ্রীপতিকে যে কথা বলেছিল ললিতার মা সেটা নিতান্তই মন বোঝবার জন্য।...কিন্তু রাত্রে শ্রীপতিকে কি জবাব দেবে?

সত্যিই ত ললিতার আজই এখানে আসা সম্ভব নয়।

অনেক ভেবে, শেষে আপন মনেই খানিকটা হেসে নিল ললিতার মা! আর যাই হোক, কোনো দিন বুদ্ধির অভাব তার হয় নি। শ্রীপতিকে চুপি চুপি বলতে হবে, হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে ওবাড়ির মেজ গিন্নী কাশী চলে গেলেন—তাঁর বুড়ো বাপের শেষ সময়! তা ললিতাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন। সময় ছিল না বলে ওঁরা আর খবরও দিতে পারে নি—এই সবে কাল রাত্রেই ওরা গেছে। কথাটা যাতে শ্রীপতি আর কাউকে না বলে সেটা দেখতে হবে। কারণ এ বস্তীর অনেককেই এরকম ভাবে বাইরে যাওয়ার অছিলা করতে হয় এবং তার অর্থও সবাই জানে। ললিতার মা আর সকলের দলে নিজের মেয়েকে ফেলতে নারাজ।...পোড়ারমুখী কিছুতেই রাজি হয় না।...সে কী কান্নাকাটি। অশ্রুমুখী কন্যার করুণ মুখচ্ছবি ভেসে উঠল ললিতার মায়ের মনে। বাঁধভাঙা বন্যার বেগের মত ঝর্ ঝর্ অশ্রুধারা, ললিতার মায়ের মনেও সেদিন কম আঘাত হানে নি। যখন নিরুপায় ললিতা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল—'মা, তুই মা ন'স ডাইনী! মা হয়ে তুই এমন কাজ কি করে পারিস্!'...তখন একবার মনে হয়েছিল, থাক, এসবে কাজ নেই। কিন্তু পরক্ষণে ললিতার মা হাসি টেনে এনে বলেছিল—'মা হওয়া খুব সোজা, কিন্তু আমার মত মা হতে গেলে কলজের জোর দরকার।'...

এখন বসে বসে ওসব কথা ভাবলে চলবে না। বেলা পড়ে এলো, কাজে যেতে হবে। তারপর একবার ললিতাকে দেখতে যেতে হবে। উঠে বসে পুনরায় দাঁতে দোক্তা ঠেসে দিল ললিতার মা। কখন নিজেরই অজ্ঞাতে

কয়েক বিন্দু অশ্রু ওর লোলকুঞ্চিতকপোলপ্রান্তে এসে জমা হয়েছে ও বুঝতে পারে নি। অবজ্ঞাভরে সেটুকু মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজায় সেই পুরনো মিলারের তালাটায় সযত্নে চাবি লাগিয়ে ললিতার মা বেরিয়ে পড়ল।

পথটা কত ভালো—কত লোকজন চলেছে। গাড়িঘোড়ার সমারোহ। সবটা জড়িয়ে একটা উৎসবের ঘটা চল্‌ছে যেন। চারিদিকে তাকিয়ে মনের থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার এমন সুযোগ পেয়ে ললিতার মায়ের অদ্ভুত আনন্দ হল।

কথাটা বলি বলি করে অনেকদিন পর্যন্ত পার্বতী সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আর ত না বলে উপায় নেই, জয়ন্ত লিখেছে—"আমাদের এখানকার পুরনো নথীপত্র অডিটের রায় কলকাতায় চলে গিয়েছে। এখনও সময় থাকতে চাপা না দিতে পারলে, হাতকড়া পড়বে। নিজের জন্যে কোনো দিনই ভাবি নি। চিরকাল, তোমাদের ভবিষ্যৎটাই আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। দাদাকে বলো ওঁর চেনাশুনো কর্তাব্যক্তি দু'তিন জন রয়েছে—তাদের নাম···। এঁরা প্রত্যেকেই তোমার দাদার কাছে দু'চারবার চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন। এ খবর আমি ভালো করেই জানি। আর, তোমার দাদা একবার মুখের কথা বল্‌লেই আমি রক্ষা পাই। তুমি সব ব্যবস্থা করে রেখো—নইলে আর কোনো উপায় নেই। এখন আর ধার্মিক দাদার আদর্শ-বোনের মত আমাকে হিতোপদেশের নীতিকথা শোনাতে চেষ্টা করো না। জানো তো ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে দুটো লেটার পেয়েছিলাম!" তারপর জয়ন্ত যেসব কথা লিখেছে তার সারার্থ হচ্ছে যে, এই অসদুপায়ে অর্থার্জনের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে তার পুত্রপরিবার। এদেরই মুখ চেয়ে এবং ভবিষ্যতের সংস্থানের আশায় সে আর পাঁচজনেরই মত গোপন পথে পয়সা আনতে গিয়েছিল। এতে দোষ কি! এও নাকি এক-প্রকারের পরোপকার। একে চুরি বলে না, এর নাম উপরি আয়। অতএব উপরি দু'পয়সা নিয়ে সে কিছু অন্যায় করে নি। তবে যে দেশের

পবুচন্দ্র কর্তা সে দেশে এরকম উল্টো বিচার হওয়াটাও কিছু আশ্চর্য নয়। সেই বিচার মানতে যারা গলা বাড়িয়ে দেবে তারা মহামূর্খ! জয়ন্ত আরও অনেক নূতন ধরণের কথা লিখেছে। সব শেষে লিখেছে, আগামী সোম এবং মঙ্গলবার ছুটি আছে, অর্থাৎ শনিবার সকাল সকাল আপিসের কাজ ফাঁকি দিয়ে অনায়াসে কৃষ্ণনগর থেকে বারোটার গাড়ী ধরে সে কলকাতায় হাজির হবে। তার আগে পার্বতী যেন এসব তদ্‌বিরের হাঙ্গামা মিটিয়ে রাখে। জয়ন্তর এত কথা পার্বতী ভরসা ক'রে দাদাকে বল্‌বে এই আশাতেই চিঠিখানির লেখায় এত মুন্সিয়ানা করা হয়েছে।···আজ বৃহস্পতিবার। আর দেরি করলে জয়ন্ত এসে যৎপরোনাস্তি গঞ্জনা দেবে পার্বতীকে। অবশ্য পার্বতী অনেক আগেই দাদাকে বল্‌তে পারত।

আজকাল আবার দাদাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। বাকী যেটুকু সময় সে নিজের ঘরে থাকে তখন বইএর মধ্যে এমন ডুবে থাকে যে কোনো কথাই মন দিয়ে শোনে না। পার্বতী যে এক আধবার চেষ্টা না করেছে তা নয়, কিন্তু বই-এর পাতাতে যে প্রভঞ্জনের মন বাঁধা রয়েছে তার মুখ দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়। এই ত সেদিন রাত্রে পার্বতী গিয়ে খানিকক্ষণ টেবল্‌টা গোছাবার চেষ্টা করল, তাতেও দাদার চৈতন্য হ'ল না দেখে একখানা ভারী বই মাটিতে পড়ে গেল পার্বতীর হাত থেকে। সেই শব্দে চম্‌কে উঠে প্রভঞ্জন তাকিয়ে বল্‌লে—"কে? পার্বতী! তুমি ঘুমোও নি! ওটা কী, বই পড়ল বুঝি?···এখন আবার ওইসব গোছগাছ কেন!"

পার্বতী থতমত খেয়ে বলেছিল—"সারাদিন ত আর বসবার ফুরসৎ পাই না!· এখন বাচ্ছাগুলো ঘুমিয়েছে তাই তোমার টেবিলটা একটু—!"

কথাটা সমাপ্ত হওয়ার আগেই প্রভঞ্জন হাতের বইখানা মুখের ওপর তুলে ধরেছে দেখে পার্বতী মনে মনে হতাশ হ'ল। তারপর আর কোনো কথা হয় নি, দাদা যেন বড় বেশি পর হয়ে গেছে। নইলে, এর আগে পার্বতীকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করতে কেউ দেখেছে কি? যাক গে ওসব কথা ভাববে না পার্বতী, আজ দাদার কাছে নিজের প্রয়োজনের কথাটা বলে ক্ষান্ত হবে। ফলাফল সম্বন্ধে একটু আশঙ্কা আছে বই কি। এখনও সুযোগ পেলেই

প্রভঞ্জন বলে, 'ওই ত দৌড়, একুশ বছরে প্রেম করে বিয়ে যারা করে, তারা এর বেশি আর কীই বা করবে!' পার্বতী নিজের মনে মনেই দাদার সঙ্গে তর্ক করে। কিন্তু প্রভঞ্জনের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বল্‌বার মত দুঃসাহস ওর হয় না।

আজ ভোর থেকে উঠে অবধি পার্বতী সংকল্প করছে বার বার- দাদাকে অনুরোধ করতেই হবে। নিজের স্বামীর জন্যে আপনার দাদার কাছে একটা আবদার করার মধ্যে ত অগৌরব কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু—দাদার স্বভাবটা পার্বতী বেশ ভালো ভাবে জানে বলেই আরো মুশকিল হয়েছে।—তবু বল্‌তেই হবে।

প্রভঞ্জন টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখ্‌ছিল।

পেছন থেকে পার্বতী এসে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে—দাদা, তুমি কি খুব ব্যস্ত আছো?

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রভঞ্জন শূন্য দৃষ্টি মেলে বল্‌ল—উঁ—হাঁ, কি বল্‌ছিস!

—একটা কথা ছিল।

—কথা? বলে ফেল্লেই চুকে যায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন, এঁ্যা!

—উনি ত পরশু আসছেন।

—ও! তা বেশ ত! জয়ন্তর শরীর ভালো আছে ত! তোকে নিতে আস্‌ছে, না কি?

—শরীর আর তেমন ভালো কই। আপিসের ব্যাপার নিয়ে ত ভাবনায় ভাবনায় শুকিয়ে যাচ্ছেন, আর হজমও ভালো হয় না।

তবু আসল কথাটা বলতে পারে না পার্বতী।

—তা ভালোই হবে, দুচার দিন এখানে থেকে শরীরটা জয়ন্ত সারিয়ে নিতে পারবে, কি বলিস!

পার্বতীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন ঝড়ের বেগে ভেঙে পড়ল,—তার চেয়ে বড় বিপদ যে আমাদের মাথার ওপর ঝুলছে দাদা! তুমি তোমার বন্ধু··· চৌধুরীকে একটু বল্‌লেই উনি খালাস পেয়ে যান।

—চৌধুরী ত আমার পেসেণ্ট, বন্ধু নয়। তাছাড়া আমি বাপু চুরিচাপাটির ব্যাপারে ভিক্ষে চাইতে পারবো না। তোর দাদাকে এত ছোট ক'রে ফেল্‌তে পারবি ?

শেষের কথাগুলি প্রভঞ্জনের কণ্ঠে আর্দ্র এবং অস্ফুট হয়ে থেমে গেল। পার্বতী যে তার বোন হয়ে এই ভাবে তাকে অন্যায়ের সমর্থনে সহায়তা করতে বল্‌বে, প্রভঞ্জন তা বিশ্বাস করতে পারছে না।

পার্বতী বল্লে—ওঁকে এবারটি তুমি বাঁচিয়ে দাও দাদা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

পার্বতী সত্যিই মাটিতে বসে পড়ে প্রভঞ্জনের পা চেপে ধরল। ওর চোখের সাম্‌নে কেমন একটা ঘোলাটে ঝাপসা পর্দায় ঢাকা পড়ে গেছে দিনের আলো। ওর মনে যে আশঙ্কা ছিল সেটাকে এতদিন অবিশ্বাস করে এসেছিল পার্বতী, কিন্তু আজ বুঝতে পারল, দাদাকে চিন্‌তে ভুল করে নি ওর মন। তাই আরও বেশি আকুলিবিকুলি ক'রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল অবুঝের মত—দাদা, তুমি বাঁচাও আমাদের। নীলাম্বর, লিলি ওরা কি তোমার কেউ নয়!

প্রভঞ্জন পাথরের মত সোজা হয়ে চুপ করে বসে থাকে, কী করবে সে কিছুই ভেবে পায় না।

মা এসে ঘরে ঢুকলেন—হ্যাঁ রে কে কাঁদছে! পারু! কি হয়েছে? ওঠ্ মা।

তিনি এগিয়ে এসে মেয়ের হাত ধরে তুললেন—কি রে, কি হয়েছে মা!

প্রভঞ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখের ওপর দৃষ্টি অচল রেখে বললে—যাই হোক, তোমায় আগে থেকে মিনতি করি, মা তুমি যেন আমায় কোনো অন্যায়ের পক্ষ সমর্থনের জন্য আদেশ করো না। আমি পারব না। যে সব মেরুদণ্ডহীন মানুষ আমার কাছে তাদের দুর্বল বিকারগ্রস্ত মনের নোংরা প্রমাণ পরিচয় দিয়ে ওষুধ নিতে আসে, তাদের কাছে আমি দয়ার ভিখারী হয়ে দাঁড়াতে পারব না।

চমৎকারিণীর ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী লাগে না। তিনি

মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রভঞ্জনকে উদ্দেশ করে বললেন—এরা তোর আপনার বোন, বোনপো—এদের মুখ চেয়েও কি এটুকু করা সম্ভব নয়!

—না, মা, তার চেয়ে ভগ্নিপতির সম্পর্কটা অস্বীকার করা আমার কাছে ঢের সহজ।

হঠাৎ দলিতাফণিণীর মত চাপা হিস্ হিস্ শব্দ করে বলে উঠল পার্বতী—হ্যাঁ তা ত বটেই! বাইরে থেকে দেখলে সব মোহান্তকেই পরমধার্মিক মনে হয়। তবু যদি নিজের কীর্তির কথাটা আমাদের জান্‌তে বাকী থাকত!

একটা আল্‌গা হাসি হেসে প্রভঞ্জন বলে—অত রাগ করিস না পারু! মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবি, দাদা খুব অসঙ্গত কিছু বলে নি।

পার্বতী যেন আর নিজের আয়ত্তের অন্তর্গত নেই। একটা হিংসার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে ওর দু'চোখে, ও বল্‌লে—হয়েছে আর ন্যায়ের ধ্বজা জাহির করতে হবে না। দুবেলা ফিল্‌ম্ এ্যাক্‌ট্রেসের আঁচল ধরে বেড়ানোতে দোষ নেই, যত দোষ তোমার ওই একটা ছাঁপোষা কেরাণী গরীব ভগ্নিপতির জন্যে একটু তদ্‌বির করতে! ছি, ছি—আমার মরণ হল না কেন। দাদা, তুমি শেষে এত ছোটো হয়ে গেলে! আমাদের পর মনে ক'রেও ত কিছু উপকার করতে পারো?

প্রভঞ্জনের মুখের হাসি একেবারে মিলিয়ে যায় নি, একটু একটু ক'রে ম্লান হ'য়ে আস্‌ছে। সে বল্‌লে—পরকে আপন করা খুব সহজ, কিন্তু আপনকে ভুল্‌তে ক'জন পারে? এই ধর না, তুই কি আমাকে পর ভেবে নিয়ে এই অন্যায়ের জন্যে অনুরোধ করার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিস? ওই জন্যেই ত পরের চেয়ে ঘরের লোক সহজে বিপদে ফেল্‌তে পারে।

পার্বতী কান্নায় গুমরে উঠ্‌ল। পরমুহূর্তে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল—প্রভঞ্জন ক্ষিপ্রতাসহকারে ওকে ধরে ফেল্‌ল, তারপর পার্বতীর সংজ্ঞাহীন দেহটা আস্তে আস্তে মাটির ওপর শুইয়ে দিয়ে, পাখা খুলে দিল। মা ব্যস্ত হয়ে নিজের ঘর থেকে একখানা হাতপাখা আর বালিশ নিয়ে এলেন।

প্রভঞ্জন বই পড়বার চশমাটা চোখ থেকে খুলে খাপে রাখতে রাখতে

মায়ের দিকে চেয়ে বল্‌ল—হিষ্টিরিয়া হয়েচে ওর এতদিন বলো নি ত মা! একবার নিধুকে চেম্বারে পাঠিয়ে দিও—ওষুধ দিয়ে দেবো। আপাততঃ মাথায় জল দিয়ে ধুইয়ে দাও, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

মেয়ের মাথায় বাতাস করতে করতে আর্দ্র দৃষ্টিতে প্রভঞ্জনের পানে তাকিয়ে মা বল্‌লেন—তুই কি এখুনি বেরোচ্ছিস?

—বল্‌ছি ত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এখন জোর করে ওর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনাটাই খারাপ। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি একবার চেম্বারে যাই, ওর ওষুধেরও ব্যবস্থা করতে হবে ত।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে চমৎকারিণী কি যেন বুঝতে চেষ্টা করেন। অবশেষে আর মনোগত ইচ্ছাটা দমন করতে না পেরে তিনি সহসা বল্‌লেন—জীবনে তোমাকে কোনো কিছুর জন্যে জুলুম করব না এ সংকল্প বুঝি আর রাখতে পারি নে প্রভঞ্জন!

এক মুহূর্তে প্রভঞ্জনের সহজ সপ্রতিভ মুখের চেহারা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ঢেকে গেল, সে বল্‌লে—কিন্তু এ যে অন্যায়কে মাথায় তুলে দেওয়ার কথা!

—তুই দেখ্‌চিস একটা অন্যায়, কিন্তু তার জন্যে পার্বতী, তার তিনটে ছেলেমেয়ে—একটা পরিবার যে শাস্তি ভোগ করবে সেটা কি অবিচার নয়? তোমার মুখের একটা কথায় এতগুলো প্রাণী যদি বাঁচে তবে সেটাই আমার মতে বড় সুবিচার করা হবে।—তাতে ওইটুকু অন্যায়—

মায়ের কথার মাঝ পথেই প্রভঞ্জন বাধা দিয়ে বলে—ওইটুকু অন্যায় কাকে বল্‌ছ মা? দেশের স্বার্থকে ছোট ক'রে দেখতে পারো কি করে! জয়ন্ত যে অন্যায় করেছে আমাদের পরিবারের ওপর—তার সেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছ পারুর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে। সেটা সহ্য করেছি। তারপর কত দফায় যে আমাদের অপমান করেছে, মুখ হাসিয়েছে জয়ন্ত—সেকথাও বাদ দিলাম। কিন্তু আজ তার অন্যায় এতদূর স্পর্দ্ধা পেয়েছে যে, সে আমাকে পর্যন্ত যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়! সে বেশ ভালো ক'রেই জানে যে, পার্বতীর খাতিরে তাকে বাঁচাতে আমি বাধ্য। কিন্তু তার সে প্যাঁচালো শয়তানী আমি এবার বরদাস্ত করব না। তাতে আমার যত বড় ক্ষতিই

হোক না কেন হ'তে দেবো। তুমি আমতুমি আর এখন উঠো না, এখানেই
পারুর সেবা করো। আমি এখন সরে করো।
দেখলে সককথা মনে পড়ে গেলে হয়ত আবা চমৎকারিণী মনে মনে বিচলিত

প্রভঞ্জন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। স্বস্ত!

তার পিছু পিছু চমৎকারিণীও যন্ত্রচালিতের মৎমা আমায় আর অনুরোধ
তারপর আবার ফিরে এসে বসলেন মেয়ের পাশে। ইল। এখানে জলগ্রহণ
রিক্ততা। শূন্য ঘরখানায় পাখা চলার শন্ শন্ শব্দ বিষণ্ণতা ...
আরও একটি দীর্ঘশ্বাস চমৎকারিণীর ফুসফুসের হাওয়া সব শে ভাই
দিল যেন। নে

জয়ন্ত। তার চোখেমুখে বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি। কি সে এত অন্যায় করল! পার্বতীর কথায় যতটুকু জেনেছেন তিনি, তাতে মনে হয় উপরওয়ালাদের চক্রান্তেই জয়ন্তর নামে নানা কুৎসা রটেছে। কিন্তু প্রভঞ্জন যে রকম ভাবে জয়ন্তর পক্ষ অসমর্থন করলে তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, জয়ন্ত গুরুতর একটা কিছু অন্যায় করেছে।

চমৎকারিণী এই সমস্যার কোনো সীমান্ত দেখ্‌তে পান না। ক্রমে তাঁর হাতপাখা চলা বন্ধ হয়—চিন্তার গভীরতায় তিনি মগ্ন হয়ে যান।

সহসা নীলাম্বরের গগনভেদী উল্লাস ধ্বনিতে বাড়িখানা চমকে উঠ্‌ল—বাবা, বাবা এসেছে। দিদিভাই দেখ্‌বে এসো বাবা এসেছে।

কে? জয়ন্ত এসেছে! চমৎকারিণী উঠ্‌তে গিয়ে আবার বসে পড়লেন। তাঁর মাথাটা ঘুরে গেল।

শচীন, নীলাম্বর, নীলিমা সবাই পিতাকে সঙ্গে নিয়ে কলরব করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল।

চমৎকারিণী ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—তোমরা চুপ করো। মায়ের অসুখ হয়েছে আস্তে কথা বলো।

জয়ন্ত শাশুড়ীকে প্রণাম করে মাটিতেই বসল। তারপর ঝুঁকে পড়ে পার্বতীকে একবার দেখে নিয়ে বল্‌লে—ও সেই পুরনো ফিটের ব্যামোটা! এক কাজ করুন মা, নাকের কাছে শুক্‌নো লঙ্কা পোড়ার ধোঁয়া দিন, এক

র ডাক্তারের বাড়ি, নাহলে টোট্‌কা

মায়ের দিকে চেয়ে বল্‌ল—হিষ্টিরিয়া ? ষুধ।

একবার নিধুকে চেম্বারে পাঠিয়ে দি ন—প্রভঞ্জন বলেছে আপনিই সেরে যাবে।

জল দিয়ে ধুইয়ে দাও, ব্যস্ত হবার কাল হোক সব অসুখই সারে। 'তাই বলে

মেয়ের মাথায় বাতাস ন করে ?

তাকিয়ে মা বল্‌লেন—তুই স হেসে বল্‌লেন—কিন্তু সেও তো বাবা খুব বাজে

—বল্‌ছি ত ব্যস্ত কোনো উপায়ে এ ফিট্‌ সারানোর চেষ্টা করলে হয়ত বিপরীত

আনাটাই ঘট্‌তে পারে! নইলে সে—

যাই শাশুড়ীর কথা শেষ হবার আগেই জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—দাদা বুঝি বেরিয়ে গেছেন ? তা হ'লে যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।

চমৎকারিণী ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন—তারচেয়ে তুমি দুদণ্ড পারুর কাছে বস বাবা। আমি যাই একটু ঠাকুর দেবতার কাছে ছুটি নিয়ে আসি। আমি না ফেরা পর্যন্ত একটু থাকো, কেমন!

এক মুহূর্তেই চমৎকারিণী অন্তর্হিত হলেন।

ঠিক এই অবস্থায় জয়ন্ত যদি প্রভঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে তাহলে চিরদিনের মত একটা বিবাদ পাকাপাকি হয়ে যাবে—চমৎকারিণীর বুকের মধ্যটা এই আশঙ্কায় ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল বলেই তিনি ঠাকুর দেবতার শরণাপন্ন হয়ে জয়ন্তকে আপাততঃ আট্‌কে ফেল্‌লেন। এতে করে মাত্র বিপদের আসন্নতা কমল কিন্তু সম্ভাবনা অনিবার্যই রইল।

ঘণ্টাখানেক পরে চমৎকারিণী একটি রেকাবে কিছু ফলমূল এবং সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকে বল্‌লেন—বড্ড দেরী হয়ে গেল বাবা, আট্‌কে রেখে তোমায় কষ্ট দিলাম।

বলে তিনি চেয়ে দেখলেন জয়ন্তর মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। পার্বতী তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে উঠে বসল।

চমৎকারিণী মেয়েকে প্রশ্ন করলেন—কেমন আছো মা!

ঘাড় কাৎ করে পার্বতী বল্‌লে—ভালো।

জামাইকে বল্‌লেন চমৎকারিণী—যাও বাবা, হাতমুখ ধুয়ে এসে ঠাকুরের

এই প্রসাদটুকু মুখে দাও। আর পারু, তুমি আর এখন উঠো না, এখানেই একটু গরম দুধ এনে দিচ্ছি, খেয়ে বিশ্রাম করো।

জয়ন্তকে নিশ্চলভাবে বসে থাকতে দেখে চমৎকারিণী মনে মনে বিচলিত হয়ে পড়েন—যাও, মুখ হাত ধুয়ে এসো বাবা জয়ন্ত!

মাথা না তুলেই জয়ন্ত জবাব দেয়—কিন্তু মা আমায় আর অনুরোধ করবেন না। ঠাকুরের প্রসাদ আমার মাথায় রইল। এখানে জলগ্রহণ করবার উপায় নেই আমার।

জোর করে হাসি টেনে এনে চমৎকারিণী বলেন—কী হলো বাবা! ভাই বোনে এখনো খুনসুটি করবে ওরা, তা ব'লে ওই পাগলীর কথা তুমি কানে তুলো না বাবা! আমি ত এখনো এ বাড়িতে রয়েছি।

—আপনি বুড়ো হয়েছেন মা, আপনার মনে কষ্ট দিতে চাই নে। নইলে আজ এ বাড়িতে আর এক তিলও দাঁড়াতাম না। আমাদের বংশটা ছোটো নয়, আমাদেরও কিছু মানমর্যাদা আছে। আজ না হয় কপালের ফেরে আমি ব্যাঙের লাথি সহ্য করছি—তাই বলে কি বংশগৌরব ভুলতে পারা যায়!

চমৎকারিণী অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের কণ্ঠ সংযত করে বলেন—জয়ন্ত, তুমি বুদ্ধিমান, তোমার ওপর একটা সংসারের দায়িত্ব—এখন ত তোমার ছেলেমানুষী করা সাজে না বাবা! মিথ্যে মাথা গরম ক'রে কিছু লাভ আছে কি? তার চেয়ে আমি বলি কি, একটু সুস্থির হও, আর আমিও ভেবে দেখি কিছু উপায় বার করতে পারা যায় কি না।

—না, মা। আমি এমনিতে আর জলগ্রহণ করব না এই আমার সংকল্প। তার আগে একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—এত বেলায় বাসিমুখে গেলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে বাবা!

—আদ্র কণ্ঠে জয়ন্ত বললে—না, মা তা হতে দেবো না। আমার সর্বনাশ হতে বসেছে ব'লে যে আপনাদের অমঙ্গল হবে সে আমি সহ্য করতে পারব না। প্রাসাদটুকুই আজকের শেষ আহার আমার। এই প্রসাদ ছাড়া আর কিছু খাবো না। আপনি জানেন না মা এদের কথা ভেবে ভেবে আমার শরীরের রক্ত শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। এই ধরুন না, আসবার

কথা ছিল শনিবার, কিন্তু কাল সারারাত বসে কাটল, ঘুম হল না। তাই ভোর বেলায় গাড়ি ধরে চলে এলাম। আপিসকাছারী কিছুতেই আর মন বসল না।

—অত ভেবো না বাবা, আমি বেঁচে থাকতে ওরা না খেয়ে মরবে না। আর প্রভঞ্জনও ত অমানুষ নয়।

—আপনি কেবল খাওয়াপরার কথাটাই দেখলেন। মানুষের মনটা কিছু নয়? ওদের মনে যে কী কষ্ট তা কে বুঝবে! আর এমন শিক্ষা ওদের দিই নি যে, মনের কষ্ট মুখ ফুটে বলবে কারুর কাছে। আমার সঙ্গে ওদের এমন একটা অন্তরের যোগ যে আমি ঠিক বুঝতে পারি ওদের কথা—যত দূরেই থাক না কেন।

চমৎকারিণী বিস্মিত না হয়ে পারেন না।

জয়ন্ত উৎসাহিত ভাবে প্রসাদের উপর ষোল আনা সুবিচার করে এক গ্লাস জল নিঃশেষে পান করে স্বগতোক্তি করল—চা।

পার্বতী চায়ের ব্যবস্থার জন্যে উঠতে যাচ্ছে দেখে চমৎকারিণী বললেন—তুই দু'দণ্ড থির হয়ে বস, আমি দেখছি।

জয়ন্ত হেসে উঠল।

—এখানে তবু এতক্ষণ পাথরের মত বসে থাকতে দেখছি। আর আমাদের গোয়াড়ীতে হলে কখন হেঁসেলের কাজে লেগে যেত! এসব ব্যারাম ধরলে আমাদের গেরস্থালী চলত না মা! যাক্ [illegible] একটু চা করে আনুক।

পার্বতী চলে যেতেই জয়ন্ত চমৎকারিণীর দুটি পা জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—মা, আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আপনার কাছে অস্বীকার করব না, চুরি আমি করেছি। ও রকম চুরি ত কত লোকেই করে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ—ধরা পড়ে গেলাম। যারা বড় বড় রুই কাৎলা তারা ত টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করল। কিন্তু আমাদের মত টিকটিকি আরশোলাদের নিয়ে টানাটানি না করলে যে আবার ওপরওয়ালাদের কাজ দেখানো হয় না! আমাদের ধনেপ্রাণে মারবার ব্যবস্থা করছে তারা। দাদার

পক্ষে একাজ করা শক্ত, বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার বাঁচবার অন্য কোনো পথ নেই। এখন আপনি দাদাকে দিয়ে ধরপাকড় করালে যদি আমি বাঁচি, তাহলে এই শেষ শিক্ষা, আর কোনো দিন এ পথে হাঁটব না। দোহাই মা বাঁচান আমাকে।

চমৎকারিণীর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে অশ্রুধারায়। পা সরিয়ে নিয়ে তিনি জয়ন্তর ওষ্ঠপ্রান্তে ডান হাত স্পর্শ করে, হাতখানি চুম্বন ক'রে বললেন—একদিন ত বাবা তোমাকে সোনার চাঁদ ছেলে বলে ঘরে তুলেছি, আজও কি আর তোমার দুঃখ দেখতে পারব চুপ ক'রে। কিন্তু আমার মত অক্ষম মানুষের ওপর এত ভরসা ক'র না বাবা! প্রভঞ্জনকে আবার বলব, চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না বাবা। অন্তরালে থেকে যিনি সব মানুষের ভাগ্য চালাচ্ছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তোমার ভালো করুন তিনি।

পরক্ষণে জয়ন্ত সোজা হয়ে বসল। চমৎকারিণী আঁচলে চোখ মুছে বললেন—তুমি চা খাও, আমি একটু ওদিকে যাই। পারু এসে অবধি এক রকম নিশ্চিন্দি কাটছিল—আজ হঠাৎ ওর শরীরটাও খারাপ হ'ল। এমন দিনে তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে—আমি নিশ্চিন্দি হয়ে ওদিকে থাকতে পারব।

ডাক্তারখানায় বসে রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তার সরকারের মনটা আজ কেমন একটা শূন্যতার অব্যক্ত বেদনায় অবশ হয়ে পড়ছে। সকাল বেলায় যে দিনের সূচনা হয়েছে আজ তাকে শুভারম্ভ বলা যায় না। অথচ এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ ছিল না। একটা যুদ্ধের ধাক্কায় জাতির, সমাজের দিকে দিকে যে ভাঙন ধরেছে তাকে নির্বিরোধে প্রশ্রয় দিলে একদিন মানুষ কোথায় তলিয়ে যাবে। ভবিষ্যতের ফলাফল জেনেশুনে একে মেনে নিতে পারবে না প্রভঞ্জন। এরা সবাই চলেছে অনিয়মের এক অন্ধ পথ দিয়ে, কোন্ দিকে? এরা কি চায়! এদের লক্ষ্যহীন চলার অসংযমে কি তচনচ হয়ে যাবে এতদিনের গড়া মানুষের দর্শন, সভ্যতার সংজ্ঞা! একদল চলেছে আর্থিক ঐশ্বর্যের দিকে ধেয়ে—সোজা পথ দিয়ে যে পয়সা

আসে তাতে এরা খুশি নয়; এদের চাই অজস্র অর্থ, যা প্রয়োজন নেই তাও চাই। এদের এই পাষাণের মত নিষ্ঠুর সংকল্প পৃথিবীর মানুষের সমস্ত রস শোষণ ক'রে যে সোনার পাহাড় গড়ে তুল্‌তে চায় তাতে মাথা ঠুকে মরবে কারা? আর একদল চলেছে—তাদের ক্ষুধাও অতি স্থূল ক্ষুধা। এখানেও সেই অধীর অদম্য লোলুপতার নগ্ন রূপ। অথচ সমাজ বিবর্তনের নিয়মে এই রূপটাও অনিবার্য। প্রভঞ্জন তা জানে বটে কিন্তু তার বিবেকের কোনোখানে একে সমর্থন করার এতটুকু যুক্তি ত নেই। তার শিক্ষার স্বরূপের সঙ্গে এই বিবর্তনবাদের কোনো সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে না।

এমনি ক'রে অনেক কথাই ডাক্তারের মনকে নাড়া দিতে থাকে। এক সময়ে সে বুঝতে পারল, এই সব চিন্তার স্রোতে তার মন এতই হারিয়ে গেছে যে, রোগীদের দেখা এবং তাদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই, যন্ত্রবৎ এই কাজগুলো সে করে যাচ্ছে। নিজের এই অন্যমনস্কতায় সে বিরক্ত হয়ে উঠল—এ কী!. এমন করে ফাঁকি দিয়ে সে অমর্যাদা করছে এতবড় একটা বিজ্ঞানের!

ডাক্তার সরকার হঠাৎ উঠে পড়ল স্টেথোটা হাতে নিয়ে। কম্পাউণ্ডার ব্যস্তভাবে পিছু পিছু এসে জানাল—এখনও পাঁচ ছ'জন বাকি রয়েছে স্যার! সব দেখলেন না ত!

প্রভঞ্জনের প্রশস্ত ললাটে কতকগুলি সমান্তরাল কুঞ্চনরেখা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে—শরীরটা তেমন ভালো নেই।

একজন মধ্যবয়সী লোক কুণ্ঠিতভাবে জানালো—আমি স্যার, ইয়ে মানে চাঁদপাড়া থেকে এসেছি। যদি একটু দয়া করে—

সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে ডাক্তার বল্লে—ও, আপনি সেই কোথাকার যেন এয়ারফিল্ডের ঠিকেদারী করেছিলেন, না?

—আজ্ঞে সে আর বলবেন না, চিনির বলদ আমরা, শালা সায়েবদের মদের খরচ জোগাতে জোগাতেই ফতুর, তার ওপর এখন উল্টো ধাক্কা খাচ্ছি। তবে হ্যাঁ ওই পেছনে লাথি খেয়ে যা ক্ষুদকুঁড়ো পেয়েছি তাতে একটা জীবন কাটবে কোনো রকমে, মানে ভালো ভাবেই।

—আপনি কাল আসুন। আজ আর সময় হচ্ছে কই—

প্রভঞ্জন দৃঢ়পদক্ষেপে চলে গেল।

পরিবর্তন বৈঠকখানায় বসেছিলেন। প্রভঞ্জনকে দেখে খুশি হয়ে সরবে আহ্বান করলেন—এই যে ডাক্তারবাবু আসুন! তারপর আপনার শরীর ভালো আছে ত বেশ!

প্রত্যভিবাদন করে প্রভঞ্জন প্রশ্ন করে—আপনি ভালো তো!

—আমার কথা বাদ দিন। সান্ত্বনার আজ চার পাঁচ দিন জ্বর—শুয়ে আছে ও-ঘরে। যদি বলি একবার আপনাকে খবর দেবার কথা, তাহলে বলে, তার দরকার নেই, উনি সুস্থ হলে নিজেই আসবেন। আর যদি বলি আর কাউকে ডাকার কথা ত রেগেই অস্থির। মেয়েকে নিয়ে বুড়ো বয়সে আমার দুর্ভাবনার শেষ নেই। যাক আপনি এলেন এ ভালো হলো একরকম।

প্রভঞ্জনকে ঘরে ঢুকতে দেখে রমিতা বিছানার ওপর উঠে বসবার চেষ্টা করতেই পরিবর্তন ব্যস্ত হয়ে বললেন—তোমার ওই বড় দোষ, সান্ত্ব, ডাক্তার বাবু এমন কোনো বাইরের লোক নন। চুপ করে শুয়ে থাকো।

রমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। অবাধ্য রুক্ষ চূর্ণকুন্তল কপালের ওপর এসে পড়েছে। উঠে বসে বলল,—ও আপনিও কি বাবার দলে? একটু কিছু হয়েছে অমনি প্রভঞ্জনকে খবর দিই!…তারপর এখন বেশ ভালো আছেন ত? ও কী, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে! এইখানে বসুন—ব'লে শয্যাপ্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করল রমিতা।

প্রভঞ্জন এগিয়ে এসে বলল—খুব অন্যায় করেছেন খবর না দিয়ে। আজ ক'দিন হল?

—সেই যে আপনার বাড়ি থেকে ফিরলাম, সে রাত্রে অনেক ঘোরাঘুরি করে প্রায় রাত একটার সময় ফিরেছি। আর সারারাত ঘুম এলো না। পরদিন থেকেই শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করছে—তারপর, জ্বর সামান্যই।

—দেখি।

রমিতা হাত বাড়িয়ে দিলে। ওর শুভ্র সুডৌল হাতে সরু দু'গাছি চুড়ি চিক্

চিক্ করছে। কয়েকটি আঙ্গুলের মধ্যে প্রভঞ্জন অনুভব করে রমিতার দেহে রক্তের গতিকে। দীর্ঘদিনের চিকিৎসার অভিজ্ঞতায় এ রকম একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তার কখনও হয় নি। আজ যেন রোগীর অবস্থা বোঝবার মত স্বাভাবিক মন নেই। পার্বতীর বাঁকা ইঙ্গিতটুকু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—পার্বতীর চোখের সেই অগ্নিবর্ষী জলন্ত দৃষ্টি ভাস্বর হয়ে উঠল, প্রভঞ্জনের আঙুলগুলো কেমন যেন শিথিল হয়ে এলো সে কথা চিন্তা করে। অবশেষে নিজের অজ্ঞাতেই সে রমিতার মণিবন্ধ দৃঢ়ভাবে ধরল। দৃষ্টি তার অন্তদিকে নিবদ্ধ ছিল, নইলে দেখতে পেত রমিতার চোখের আবেশ আর বিস্ময়।

হাতখানা ছেড়ে দিয়ে প্রভঞ্জন উঠে দাঁড়াল। ওর মনের মধ্যে যে প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠেছে তার কোনো চিহ্ন বাইরে প্রকাশ পেল না।

রমিতা বল্‌ল—এখনই চলে যাবেন না যেন।

পরিবর্তন সরবে জানাল—একটু কিছু খাবার করে দিতে বলি আপনাকে—। মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে বড্ড। সাস্তু তোমার ত বার্লির সময় হল।

• পরিবর্তন ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল।

প্রভঞ্জন চশমা খুলে কাচ পরিষ্কার করতে করতে বল্‌লে—একটু পুষ্টিকর ফলের রস খান। জ্বর—

তারপর নিজের ডান হাতখানা নিরীক্ষণ করতে করতে বল্‌ল—হ্যাঁ জ্বর ঠিক নয়। দুর্বলতা। এখন কিছুদিন বিশ্রাম চাই।

.—আপনি ত আমায় ঘরে বন্দী রাখতে পারলেই খুশি। কিন্তু একা একা মন হাঁপিয়ে ওঠে। কিছুতেই পারি না—একা থাকলে মাথাটা কিরকম ভারি হয়ে ওঠে। নিজেকে বড় ভয় করে যে। মনে হয়, বুঝি বা পাগল হয়ে যাবো। এই যে ক'দিন শুয়ে আছি—শুয়ে শুয়ে সিঁড়ির দিকে কান পেতে রেখেছি, যদি কেউ আসে তবে দুটো কথা কয়ে বাঁচি। কিন্তু তা হবার উপায় নেই, বাবা ঠায় বাইরের ঘরে পাহারা দিচ্ছেন, কেউ এলেই হাঁকিয়ে দিচ্ছেন। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে দেখতে আসবেন তা ভাবতেও

পারি নি। আচ্ছা, কোনোদিন যদি আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় তাহলে আপনি চিকিৎসা করবেন?

প্রভঞ্জন এবারে রমিতার দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকায়। তার এ চাহনি অসঙ্কোচ নয়।

—ওসব আজগুবি গল্প বাদ দিয়ে অন্য কথা বলুন। এইভাবে ত অনেক দিন বইয়ে দিলেন। সুখী হতে পেরেছেন কি?

—সুখ ত চাইনি। চেয়েছি পরের মনে বেদনা দিয়ে তাকে শিকার করতে। আমার জীবনে যে ব্যর্থতা পেয়েছি সেই বিষ চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি, এই টুকুই আমার বড় সান্ত্বনা— !

—তাতে কি লাভ হল?

—যুদ্ধে যে জয়ী হয় তার কতখানি লাভ হয় বলতে পারেন? তবু মানুষের মন যুদ্ধ চায়। আমারও জয়লাভ হয়েছে।

রমিতার দিকে জিজ্ঞাসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কি যেন আবিষ্কারের চেষ্টা করে প্রভঞ্জন।

রমিতার শীর্ণ মুখখানা হাসির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ও বল্‌লে—আমার একটা অনুরোধ আছে। অনুমতি না চেয়েই বল্‌ছি।

প্রভঞ্জনের স্বভাব-গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে। সে নীরবে দৃষ্টিপাত করল, এ দৃষ্টি সেই পুরাতন দৃষ্টি—বলুন।

—সেই গোড়া থেকেই আপনি আমায় বিশ্রাম নিতে বল্‌ছেন বার বার। আমারও ধারণা হয়েছে, বিশ্রামটা দরকার। সেদিকের অসুবিধেগুলোও আপনার অজানা নয়। যদি এমন কোন মানুষের কাছাকাছি থাকতে পারি যার ওপর ভরসা করা চলে—সময়ে অসময়ে যার সঙ্গে সব কিছু নিয়েই আলাপ-আলোচনা করতে অসুবিধে হয় না, তাহলে আমি বাইরে গিয়ে কিছুদিন কাটাতে পারি।

নির্লিপ্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রভঞ্জন জবাব দেয়—হ্যাঁ, তা পারেন ত খুব ভালো কথা। সে ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। আপনার মানসিক বিশ্রামই বেশি প্রয়োজন।

—আপনি রাজি হলেই সব ব্যবস্থা করতে পারি।

—এতে আমার অমত থাকতে পারে না, অনেকদিন ধরেই ত বল্‌ছি বাইরে যান।

—জানি আপনি আপত্তি করবেন না। তা হলে আজ সন্ধ্যেবেলা একবার আসুন, পাসপোর্টের ব্যাপারটা জেনেশুনে নিই—আর কি কি নিতে হবে সঙ্গে, কোন্ জাহাজে আপনি যাবেন, সেইমতই সব ব্যবস্থা করা যাবে।

—পাস্‌পোর্ট নিয়ে কি করবেন ?

—কেন, বাইরে যাবো। আমার ইচ্ছে আমেরিকা পর্যন্ত যাই—হলিউড!

—রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন ?

—আপনার সঙ্গে দুনিয়া ছেড়ে যেতেও আমি রাজি।

কথা শেষ করে রমিতা হাসতে হাসতে বালিশের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ওর কটাক্ষে ঝরছিল তরল মায়ার মদিরা।

প্রভঞ্জন গাম্ভীর্যের বর্মটা যেন কঠিন করে তুল্‌তে চায়।

স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে সে বল্‌লে—আপাতত বিশ্রাম করুন। আমি এখন যাই।

চৈত্রের উন্মত্ত বাতাস হঠাৎ কি কারণে স্তব্ধ হয়ে যায় যেমন, তেমনি রমিতার উচ্ছলতা অন্তর্হিত হল। ওর কণ্ঠে ব্যাকুলতা বেজে উঠ্‌ল।—না, না, এখনই যাবেন না।—আপনার খাবার আনতে গেছেন যে বাবা।

—আর বসতে পারব না, কাজ আছে।

কি এক রহস্যময় তাড়নায় প্রভঞ্জন আর এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারছে না। এমনিতেই আজ সকাল থেকে তার মন দোলাচল। পার্বতীর একটি ছোট আঘাতে তার ভাবস্থিতিতে দুর্যোগ লেগেছে। পার্বতীর কথাটা সে এক নিমেষেই উড়িয়ে দিয়েছিল বালুকণার মত—কিন্তু এখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে পার্বতীর কথার যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

রমিতার উচ্ছল হাসির রেশে শাদা ঘরখানার দেওয়াল রিণ্-রিণ্ করছে এখনও, অথচ ওর মুখে-চোখে বিষণ্ণতা। রমিতা প্রশ্ন করে—ও বেলায় আসছেন ত ? সন্ধ্যেটা—না থাক, কাজ ক্ষতি করে আসতে বল্‌ব না।

প্রভঞ্জন আপনার সংশয়কম্পিত চিত্তকে গভীর দৃষ্টিতে সংকেত করে মনে মনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল—এ হাসি প্রশান্তির স্নিগ্ধতায় মনোরম।

—অভিমানের জাল দিয়ে আমাকে টানবার চেষ্টা করবেন না। আমি আসব—তবে, আসবই একথা বলতে পারছি না।

—অভিমান পর্যন্ত ধরতে পারেন, দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

রমিতার কণ্ঠে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা সুস্পষ্ট।

—তা পারি, তবে অভিমানে গলে যাবার মত নিবু দ্ধিতা আমার নেই।

—পাথরে গড়া যে মানুষ সে বিরাট হতে পারে, বুদ্ধিমান হতে পারে কিন্তু দরদ হচ্ছে সোনা, সে সোনা এমনিতে যেমন শক্ত তেমনি মনের আগুনে গলে টল্‌টল্‌ করে—আপনি সেই পাথর দিয়ে গড়া বিরাটত্বের মানুষ কাঠামো। আমি ভুল ক'রে সোণার খোঁজ ক'রেছি।

রমিতার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

প্রভঞ্জন সপ্রতিভভাবেই জবাব দেয়—পাথর হ'তে আপত্তি কী! হীরেও ত পাথর!

—হীরে? না, আপনি কষ্টিপাথর। এই পাথরে মন যাচাই হয়। আপনার কাজ হিসেবের নির্ভুল মান রক্ষা করা।

—এটা কিন্তু ডাক্তারের পক্ষে বড় সার্টিফিকেট।

এ কথার জবাবে রমিতা তখনই কিছু বল্‌তে পারল না, রমিতার কানের ইয়ারিং দুটো যেন একটু রক্তিম হয়ে উঠেছে। অস্তসূর্যের রক্তরাগে সূর্যমুখী ফুলের হলদে রঙে যেমন লালের আভা লাগে এ ঠিক তেমনি আভা!

রমিতার বক্রগ্রীবায় যেন প্রতিবাদের বাঁকা ভঙ্গি ব্যক্ত হয়—বুদ্ধির শুষ্ক দম্ভই মানুষের আসল মনুষ্যত্বকে লুপ্ত করেছে; বুদ্ধিই তার সবচেয়ে বড় বাধা, তা জানেন!

প্রভঞ্জন ভারী গলায় আস্তে আস্তে সে কথার জবাব দেয়—এ ত আপনি বুদ্ধি-বিকারের কথা বলছেন। বুদ্ধি না থাকলে মানুষ থাকত?

—না তা থাকত না। তবে কি জানেন, অন্তর হচ্ছে কাঁচা সোনা, আর

বুদ্ধি হচ্ছে পালিশ—এই অন্তর আর বুদ্ধির সামঞ্জস্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য—এই সামঞ্জস্যের অভাবে মানুষ অমানুষ হয়।

—অমানুষ আর না-মানুষ কিন্তু এক কথা নয়।

—তা ত বটেই, বৈজ্ঞানিকও অমানুষ হতে পারে আবার জংলী অসভ্যও অমানুষ হতে পারে। তবে বৈজ্ঞানিকের অন্তরকে কুরে কুরে ফাঁকা করে বুদ্ধি ভরাট করার চেষ্টা হয়েছে, আর অসভ্য জংলীর মধ্যে বুদ্ধির পালিশ তেমন পড়েনি। অসভ্য মানুষ নিজের সরল অন্তর দিয়ে যেটুকু দেখতে পায় তা ছোট হলেও সম্পূর্ণ। কিন্তু বিজ্ঞানীর বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সে যা দেখে তারপরে আরও বেশি দেখবার জিজ্ঞাসা থাকে। একটা অতৃপ্তি অস্থির করে রাখে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিকে।

—এই অতৃপ্তি আর জিজ্ঞাসা না থাকলে বিজ্ঞান আজ অত বড় হতে পারত না। ধ্বংসবুদ্ধি আর শুভবুদ্ধি ত এক নয়! তবে মনের দৃষ্টি যখন নিরপেক্ষ হয় তখন সে শুভাশুভের বোধকে অতিক্রম করে perfection-কেই বড় করে ভাখে।

—এ কথা কি করে বললেন? এ ত প্রলয়ের ইঙ্গিত। তবে কেন আজ—

—আমি তা বলিনি, সভ্যতার গতি বিশ্লেষণ করলে এ-ই পাই।

—ডাক্তারবাবু দোহাই আপনার, একটু অন্তর দিয়ে বিচার করুন। মানুষকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান বড় নয়।

হঠাৎ একটা কঠিন কথা প্রভঞ্জনের ঠোঁটের ডগায় এসে গেল। সে ইচ্ছা করেই এ কথাটা বলবার স্পৃহা দমন করল না। বলল—আমাকে বলবার আগে নিজের জীবনকে বিশ্লেষণ করে দেখুন, আপনি কি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দিয়ে মানুষকে ঠকান নি? অন্তর সেখানে ছিল কি?

রমিতা অবিচলিত ভাবেই উত্তর দিল—ঠিক বলেছেন, বুদ্ধি দিয়ে অনেককে নাচিয়েছি সেটা ত অন্তরের অপমানে জলেপুড়ে তার প্রতিশোধ নেবার জন্যই। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে ভালোবাসলে আজ আমার এই একক জীবন হত না। এতদিন ধরে এই জেনেছি যে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায়

কিন্তু ভালোবাসতে গেলে অন্তর দিয়েই মানুষ ভালোবাসে। সেখানে বিচারবুদ্ধি অন্ধ। আপনি আজ আমার অভিমানকে সন্দেহ করে থাকতে পারেন। কিন্তু তাতে যদি আঘাত পেয়ে থাকি সে আঘাতটাও আমার কাছে বড় কম পাওয়া নয়!

বিচলিতভাবে প্রভঞ্জন বল্‌লে—রমিতা দেবী যদি কোনো অশিষ্ট আচরণে আপনাকে অসম্মান করে থাকি তবে মাপ চাইছি। এখনকার মত চলি।

প্রভঞ্জন লক্ষ্য করে নি পরিবর্তন এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে থামতে দেখে বলল—ও ঘরে যাবেন? না এ ঘরেই খাবার আনাব!

রমিতা বলল—বাবা, রোগীর ঘরে ভালো ভালো খাবার এনো না। আমার নজর লাগতে পারে।

সবাই হেসে উঠল।

প্রভঞ্জনকে শুনিয়ে রমিতা বল্‌লে—বাবা ওঁকে একটু ভালো করে বলো যেন আজ সন্ধ্যের দিকে আর একবার আসেন। ফি না হয় ডবলই নেবেন। আর হ্যাঁ, আমার বেড়ানো বলো স্বাস্থ্য সঞ্চয়ই বলো আর ফিল্‌মের কাজ শেখাই বলো—সব দিক দিয়ে সমুদ্রযাত্রাই প্রশস্ত, বুঝলে বাবা!

ডাক্তার সরকার হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। এরই মধ্যে এত বেলা কি ক'রে হ'ল। সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। পার্বতীর শরীর খারাপ, মা শুকিয়ে বসে থাকবেন! এত বেলা অবধি এখানে সময় নষ্ট করার কোনো সঙ্গতি খুঁজে না পেয়ে সে নিজের ওপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। সিঁড়ি দিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সে নীচে নেমে এলো এবং গাড়িতে ষ্টার্ট দিল, গাড়িখানা ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করল। সেই মুহূর্তে যদি প্রভঞ্জন উপর দিকে তাকাত তাহলে দেখত জানালায় সপ্রশংস চোখে অপলক দৃষ্টিতে কে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তার মন এখন মায়ের জন্য চঞ্চল—পার্বতীর অসুস্থতাও ত কম উদ্বেগের কারণ নয় প্রভঞ্জনের কাছে। বিশেষ করে সকালে বাড়ীতে একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়া দেখে সে বেরিয়ে এসেছে। অনেক আগেই বাড়ী ফেরা উচিত ছিল।

চমৎকারিণী সোজাসুজিই ছেলেকে বললেন—আমার এ কথাটা কিন্তু তুই ঠেলতে পারবি না। হোক অন্যায়, তবু একবার আমার মুখ চেয়ে এ অন্যায়টা তোর গায়ে মাখা চলবে না প্রভু।

—কী বলছ মা? এ ত শুধুই একটা অন্যায় নয়—অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া যে বড় পাপ! তুমি জানো, জয়ন্তের কাণ্ড?

—জানি না, জানতে চাইও না আমি! শুধু এটা জানি যে এ যাত্রা ওকে রক্ষা করতেই হবে—আর তোমার হাতেই আছে তার উপায়।

—যদি সব জানতে তাহলে তুমি আমায় এ কাজ করতে বারণ করতে মা। তবে শোনো—

—কিন্তু তার আগে তুই কথা দে, ব্যবস্থা করবি। আমি অতশত বুঝিনে বাপু—!

—আমার কথাটাই আগে শেষ করি। গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে জালিয়াতী করে ওদের একটা দল প্রায় দু'কোটি টাকা সরিয়েছে। এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি তার কারণ এর মধ্যে অনেক বড় বড় রুইকাৎলা জড়িত। আসল ব্যাপারটা বাইরে প্রকাশ পেলে ত দুর্নাম রটবে, সেই-জন্যেই খবরটা চাপা আছে। শুধু এই একটাই ব্যাপার নয়। এই ক' বছরের যুদ্ধে আরও কতই যে কাণ্ড হয়েছে! ধরো না তোমার ওই এস্-কে ঘোষের মামলাটা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চমৎকারিণী স্তিমিত কণ্ঠে বললেন—থাক বাবা! ওই দুঃখে আজকাল কাগজ পড়া ছেড়েছি। কাগজ খুললে চোখ ঝাপ্সা হয়ে যায়। সবই বুঝলাম, দেশময় যখন এই রকম অনাচার চলেছে তখন তুই কি একাই ঠেকিয়ে রাখতে পারবি? মাঝখান থেকে বেচারী জয়ন্তের দুঃখে পারুটার যদি শক্ত কিছু অসুখ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আমি ত চোখে দেখতে পারব না বাবা!

—মা!

ব'লে প্রভঞ্জন আবেগ কম্পিত কণ্ঠে চমৎকারিণীর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকায়। চমৎকারিণী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করেই বলেন—বুড়ো বয়সে

আমার ভীমরতি হ'য়েছে রে! নইলে তোকেইবা এমন কথা বলতে যাবো কেন! কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি বাবা!

—কাকে, কি কথা দিয়েছ মা!

—জয়ন্ত যখন আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল তখন নিজেকে শক্ত রাখতে পারলাম কই।

—কিন্তু মা, আমার কথাটা তুমি একবারও ভাবছ না!

—এ কথা কি তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস?

—যদি সত্যি আমার কথা ভাবতে তাহলে ওদের দলে আমায় ঠেলে দিতে পারতে না! তুমি ত জানো মা ডরোথীকে যেদিন শেষ বিদায় দিয়েছি সেদিন আমার অন্তরকে হত্যা করেছি। তুমিই ত বলেছিলে ধর্ম বড়—আজ তবে কেন সে কথাটা ভুল বলছ! সেদিন আমি বলেছিলাম, 'মা আমার মনটা নয় তোমার পায়ে উৎসর্গ করলাম কিন্তু আর একটি অন্তর যে আমার জন্যে নিজের সমাজ স্বদেশ স্বজন সব কিছুই বিসর্জন দিতে ব্যগ্র —তার কি হবে?' তুমি তখন ওই ছবির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলে— 'তোমার পিতৃপুরুষের মুখচেয়ে তাকে ত্যাগ করতেই হবে। ধর্ম তোমায় রক্ষা করবেন।'···আর আজ মেয়ে জামাই-এর স্বার্থে ধর্ম নেই? তোমার ধর্ম এত স্বার্থপর কেন?

চমৎকারিণীর চোখের অশ্রু আর নেই। তাঁর মুখে একটা শুষ্ক আদেশের কৃত্রিমতা ফুটে ওঠে; তিনি বললেন—তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না বাবা। যা বলেছি মেনে নিতে পারবে কিনা শুধু সেইটুকু জানতে পারলেই আমি আমার ভবিষ্যত ব্যবস্থা করব।

—ভয় দেখিয়ো না মা! যেটা আমার কাছে অন্যায় মনে হবে সেটা তোমার ধমকেও অন্যায়ই থাকবে। আর অন্যায় করা ব্যক্তিগত কারণে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তোমার জামাই কেন, তোমার মুখ চেয়েও আমি পারব না।

—তবে এ সংসারে আমার অন্ন উঠল আজ থেকে।

—সংসার কার? বরং বলো, আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও।

অকস্মাৎ চমৎকারিণী ছেলের হাত চেপে ধরলেন।

—খোকা, তুই অমন করে আঘাত দিস নে মায়ের প্রাণে! কথা ফিরিয়ে নে, ফিরিয়ে নে কথা, শেষ জীবনটা শান্তিতে মরতে দে খোকা! তোকে ব্যথা দিয়ে আমি কি সুখে আছি! মায়া বড় কঠিন রে, একবারটি মায়ের দুর্বলতাকে ক্ষমা করে নে। তুই কত বড় গর্ব আমার এমনি করে মাড়িয়ে দিস্‌নে। এভাবে আমাকে ছোট করলে মুখ দেখাবো কি করে?

প্রভঞ্জন মায়ের দিকে তাকাতে পারে না, অন্য দিকে চেয়ে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু তার হাতের তালুতে পড়ল। তার স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন গভীর রাত্রের বেহাগ সুর ধ্বনিত করে বল্‌ল —বেশ তোমারই ইচ্ছেমত কাজ হবে! কিন্তু মা, এরপর আমারও নিজেকে সংযত রাখা শক্ত হবে—তখন কিন্তু দোষ দিও না।

এই কয়েক মুহূর্তে প্রভঞ্জের মনোজগতে যে ওলট পালট ঘটে গেল, তাকে যুগান্তর বল্‌লে ছোট করা হয়—এ যেন তার ব্যক্তিত্বের রূপান্তর।

•

দিবানিদ্রার পরে বৈকালিক চায়ের কাপ হাতে করে প্রভঞ্জনের ঘরে ঢুকে জয়ন্ত জানালার ওপর কাপটা রেখে যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তখন প্রভঞ্জনের কপালে দীর্ঘ কয়েকটি কুঞ্চনরেখা প্রকট হয়ে উঠেছিল। কোনো কথা বলে নি. একটা কঠিন হাসি হেসে সে পুনরায় বই-এর মধ্যে ডুবিয়ে দিল নিজেকে।

জয়ন্ত বলল—আপনার শরীর ভালো আছে ত দাদা! চেহারাটা কেমন ধ্বসে গিয়েছে মনে হয়।

—হুঁ, আমাদের ত জন্মগত রক্ষাকবচ নেই, বিধাতা বোধ হয় সবাইকে ভালো রাখতে পারেন না, কি বলো?

টেবলের ওপর বইখানা রেখে প্রভঞ্জন ফিরে তাকিয়ে বলল।

জয়ন্ত একটু অপ্রতিভ হয়ে যায়—অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সে বলে—দাদা, আপনি যেন বিধাতারও ভুল ধরছেন। আজকাল বুঝি মনঃসমীক্ষণ শক্তি খুব এগিয়ে গিয়েছে।

—তাতে আর সন্দেহ কি! তবে এ শাস্ত্রে ডাক্তারদের চেয়েও বড় বড় বিজ্ঞানী দল এগিয়ে গেছে—তাদের মানসিক সংজ্ঞা জুয়াচোর, জালিয়াৎ এবং সামাজিক পরিচয় ভগ্নিপতি, জামাই—মানে পরমআত্মীয়!

এতখানি ধাক্কা সামলানো যে কোনো মানুষের পক্ষেই শক্ত—বিশেষ করে জয়ন্তর মত লোকের চায়ের কাপ হাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় আরও অসম্ভব। তাই আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে সে স্বভাবসঙ্গতভাবে জবাব দিল—খবরদার, মুখ সামলে—!

—বাঃ, চমৎকার! এরপর কি গলায় হাত দিয়ে বাকী শিক্ষাটুকু দেবে?

—আপনি আমায় আপমান করছেন তা জানেন?

—তাই নাকি? সে আবার কি জিনিস!

—তার মানে? জানেন এভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারেন না আমায়!

—চুরি করবার সময় মনে থাকে না?

—চুরি? চুরি কাকে বলেন! আমার টাকার প্রয়োজন; সংসারে চলতে গেলে টাকার দরকার হয়ই—সেই দরকারের জন্যে যদি টাকা রোজগার করি তবে সেটা চুরি হতে পারে না। আমি যদি চোর হই আপনি তাহলে দুশ্চরিত্র।

হঠাৎ প্রভঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তোমার কাছ থেকে চরিত্রের সার্টিফিকেট কেউ চায় নি। তোমার এ বিষদাঁত ভাঙবার ওষুধ আমার হাতে আছে। কিন্তু সে যাক—আপাততঃ এভাবে চটিয়ে দিলে তোমারই ক্ষতির সম্ভাবনা!

পরমুহূর্তে জয়ন্ত যেন নিভে গেল, সে নরমসুরে বলল—দাদা, আপনি অকারণে আমার ওপর রাগ করছেন। আপনার সাহায্য ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না তা নয়, তবে তাতে আপনারই নাম খারাপ হবে, আর তেমন ভাবে জেল খাটার হাত থেকে উদ্ধার হওয়ার চেয়ে জেল খেটে দেওয়াই ভালো। আমি ত আজ সকালেই মাকে বার বার বারণ করলাম, দাদার হাতে মানমর্যাদা নষ্ট হয় এমন কাজ তাঁকে দিয়ে করানো সত্যি উচিত হবে না।

কিন্তু মেয়েরা চিরকালই অবুঝ, বিশেষ ক'রে মেয়েরা যেখানে মা, সেখানে সন্তানের জন্যে মা পাগল—তিনি কিছুতেই কথা শুন্‌লেন না বরং আমায় উল্টে ধমকে দিলেন।

—চুপ করো!

গর্জন করে উঠ্‌ল প্রভঞ্জন।

জয়ন্ত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে যাবার সময় সে বেশ জোরেই বল্‌লে—Thank you!

উঃ, অসহ্য! এই একটা ধূর্ত শয়তানকে নিজের সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে বাঁচাতে হবে! এর চেয়ে আত্মহত্যা করাও যে অনেক বড় গৌরব।

বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে প্রবাহিত প্রভঞ্জনের রিক্ত মর্মবেদনা যেন ঘরখানার সীমাবদ্ধ বায়ুস্তর আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরবে। একটা অদৃশ্য আশঙ্কায় তার কেন্দ্রস্খলিত মর্মচৈতন্য আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল।

আজ আর পোশাক বদ্‌লাবার কথাও তার মনে হয় না। সে যে অবস্থায় ছিল সেইভাবেই বেরিয়ে পড়ল।

ডাক্তার খানায় গিয়েও সে স্থির হয়ে বসতে পারে না। অসহায় শূন্যতায় বিভ্রান্ত প্রভঞ্জন। এতদিন যেটাকে সত্য বলে আশ্রয় করেছিল সেটাও বিবর্তনের পাকচক্রে অবলুপ্ত হল? না, তা নয়, আজ তার স্বপ্ন শেষ।

ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বাজছে। প্রভঞ্জন আর কিছু শুনতে চায় না। তবু অভ্যাসবশে রিসিভার উঠিয়ে নিলে—হ্যালো, ডাক্তার সরকার কথা বলছি! আপনি?

—আমি পরিবর্তন মজুমদার! একবার এখুনি যদি আসেন! বিকেল বেলা সান্ত্বনার কেমন নেতিয়ে পড়া ভাব দেখে মনে হয়েছিল বুঝি ঘুমোচ্ছে, কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারছিনা কেন এমন হল। একবার যদি দয়া করে আসেন।

—আচ্ছা যাচ্ছি এখুনি।

প্রভঞ্জনের কণ্ঠের ব্যগ্রতা ওপারের মাউথপীসে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল।

চমৎকারিণী মেয়েকে নিজের ঘরে ডেকে জানিয়ে দিলেন জয়ন্ত যেন প্রভঞ্জনের সামনে বিশেষ না যায়। কথাটা শুনে পার্বতীর মুখ আঁধার হয়ে এল। এটা তার মা দেখেও যেন দেখতে পেলেন না। তাঁর এরকম অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অন্য কোন পন্থা খুঁজে না পেয়ে পার্বতীর বিষণ্ণতা চতুর্গুণ বেড়ে গেল। এবং ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই নীলিমাকে দেখতে পেয়ে তার পিঠে কয়েকটা চড় চাপড় বসিয়ে দিল পার্বতী। নীলিমা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে যথোচিত চীৎকারে বাড়ি মাথায় তুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

তবুও চমৎকারিণী একটি কথা বললেন না। পার্বতীর রোষবহ্নি আরও প্রধূমিত হতে লাগল।

জয়ন্ত খালি পেয়ালাটা রাখতে রাখতে পার্বতীকে বলল—তোমার দাদা ত একেবারে চেঙ্গিস খাঁ! তা তুমি তাঁর বহিন—অনুগ্রহ করে কি সিনেমায় যাবে আমার সঙ্গে?

—আমার ত রঙ লাগে নি!

জলন্ত দৃষ্টিতে পার্বতী জয়ন্তর দিকে তাকায়।

জয়ন্ত কিছুমাত্র দমেন না—তা যদি বলো তো লেগেছে! এই ত চোখ দুটো কেমন আগুন রঙে রঙীন!

—আগুন শুধু চোখে নয়, সর্বাঙ্গে! গা জালা করে তোমার কথা শুনলে! উঃ, তোমাকে নিয়ে জীবনে কি এতটুকু শান্তি পাবো না।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে জয়ন্ত জবাব দেয়—আমাকেই চেয়েছিলে, শান্তি ত চাও নি! আমি হচ্ছি জীবন, যেখানে গতি আছে, বৈচিত্র্য আছে, লাভ আর ক্ষতি আছে—কিন্তু শান্তি নেই! শান্তি মানেই ত মৃত্যু! এই তোমাদের বাড়ি—এখানে একটা দানবের অভিশাপ আছে, একে মৃত্যুর রাজ্য বলতে পারো। শান্তি এখানে থাকুক।

—উঃ তোমার এই জীবন—জীবন আর কত কাল শুনবো! অন্য কথা নেই কিছু! জানো তোমার জন্যে এখানে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই!

—সেই জন্মেই ত বলছি সিনেমাতে চল! That idiot of your brother নিজের দেমাক নিয়ে থাকুক, আমরা দুজনা ভেসে চলে যাই।

—আমি মাকে বলতে পারব না।

—What of that? আমি আছি তোমার রক্ষা করতে।

—আহা, তুমি বড় বোকা! দাদা তোমার জন্মে একে ওকে সুপারিশ করে বেড়াচ্ছে আর তুমি সেই সময়ে স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছো শুনলে মা খুব খুশি হবেন! কি বুদ্ধি?

—ওগো মহারাণী, তা কেন; মাকে বলবে এবার এসে অবধি একদিনও কালীঘাটের ঠাকরুণকে দেখতে যাও নি তাই সন্ধ্যের আরতি দেখতে যাবে।

—খবরদার, ও কথা শুনলে মা চটে যাবেন। জানো তো, উনি এইসব লোক দেখানো ভক্তির ঢঙ দুচোখে দেখতে পারেন না। ঢের হয়েছে, তোমার বুদ্ধির দৌড় বুঝতে আমার বাকী নেই। যা হয় আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি কেবল লিলিকে একটু তোয়াজ করো। শচীন, নীলাম্বরকে পয়সা দিলেই ওরা বাড়িতে থাকবে, কিন্তু লিলিকে শুধু শুধু মারলাম! ইস্।

অনুতাপ একটু হয় বই কি পার্বতীর! পার্বতী তার দাদাকে দেখ্‌ছে ছেলেবেলা থেকে—কিন্তু এরকম বিচলিত হ'তে কখন দেখে নি। প্রভঞ্জন গম্ভীর স্বল্পভাষী, আবার যখন হাসে প্রাণখুলে হাসে। সে যা সংকল্প করে তার নড়চড় হয় না—দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু ক'রে ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে তার কল্পনা এবং বাস্তব এক সূত্রে বাঁধা।…আজ সেই প্রভঞ্জনের অটল সংকল্প বিচলিত হতে দেখে পার্বতী বিজয়িনী হয়েও ষোলো আনা সুখী নয়। কোথায় যেন একটা বেদনার কাঁটা ফুটছে ওর মনে। তবু জয়ন্তকে অপ্রসন্ন করবার মত সাহস পার্বতীর হয় না। ঠিক সাহসের অভাবই কি? না, এবাড়ির এই থম্‌থমে আবহাওয়ায় ওর মনটাও হাঁফিয়ে উঠেছে তাই—তা ছাড়া দীর্ঘদিনের উদ্বেগের পর আজকের এই মুক্তির আভাসও যেন মধুর।…দাদার ধর্মভীতিকে পার্বতী শ্রদ্ধা করে—কিন্তু এক্ষেত্রে ওর মনে হয় যেন প্রভঞ্জন একটু বেশি বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। ও

আজ সকালে যে কথাটা বল্‌বে ঠিক ক'রে রেখেছিল এখন আবার সেই যুক্তি দিয়ে নিজের মনের বিষন্নতা কাটাল, ও বল্‌লে নিজেকে—দাদা ত আর নিজে হাতে কিছু করতে যাচ্ছে না। সে যা করবার অন্য লোকে করবে—দাদা ত অপরকে বলেই খালাস। যারা হাজারটা অন্যায় করছে তারা না হয় আরও একটা বেশি করবে,—দাদার তাতে কি এসে যাচ্ছে!... এই সহজ কথাটা কেন যে প্রভঞ্জন বুঝতে পারে না, কে জানে! পার্বতী এই সব সাত-পাঁচ ভেবে মনটা হাল্‌কা ক'রে নিল।

জয়ন্ত ডাকল—লিলি মা!

এতে লিলির কান্নার বেগ যেন আরও বেড়ে যায়।

পার্বতী লিলিকে কোলে নিয়ে এসে জয়ন্তর হাতে দিয়ে মায়ের কাছে গেল।

আজ ধর্মতলা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে প্রভঞ্জনের মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগের কথা। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ধর্মতলা এবং এস্‌প্লানেডের ট্রাম-বাসগুলো বেশ ফাঁকাই চলেছে। মানুষে মানুষে একটা অবিশ্বাসের বেড়া তুলে দিয়েছে—তার ফলে দিনে দিনেই যে যার কাজ সেরে নিজের নিরাপদ নীড় আশ্রয় করে। এরা সবাই নিজের মনগড়া চিহ্ন দিয়ে রেখেছে মানুষের গায়ে—ধুতি আর লুঙ্গী! আশ্চর্য, দীর্ঘকাল একই আকাশের নীচে পাশাপাশি বসবাস করেও এই পার্থক্য! অথচ যারা সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে এলো, যারা তোমার আমার কেউ নয় তাদের তুমি আমি কিছু বলি না, তারা নিরাপদে তোমার আমার পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়—চোখ রাঙায়। ১৯৪২-এর কথা বাদ দাও, সেই সময়ে কিছুদিন ওদের একটু বিপদে পড়তে হয়েছিল। অবশ্য তার ফলেই ত ওদের ভাঁওতায় পড়ে তুমি আর আমি আলাদা হয়ে গেলাম। তুমি থাকো পার্কসার্কাসে আর আমি শ্যামবাজারে।...ঘন ঘন সান্ধ্যআইনের বহরে দিনরাত্রি সন্ত্রস্ত। ছোরা, বোমা, গুলী ব্রেনগান স্টেনগান, এ্যাসিড, গ্রেপ্তার...শহরের বুকে প্রতি মুহূর্তে ঝড় বইছে। আর্মাড কার চলে, খাকী পোশাকে ফৌজ ঘুরে বেড়ায় বন্দুক

বাগিয়ে—পথে লোক নেই! কর্পোরেশনের বাতিগুলো নির্জন রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ এ গলি থেকে একটা ছায়া মূর্তি বেরিয়ে চুপি চুপি ও গলিতে ঢুকে পড়ল—এমন সময় কোথা থেকে পেট্রল পুলিশের গাড়ি এসে ছায়ামূর্তিকে ধরল। হয়ত থানা পর্যন্ত আসামীকে নিয়ে গেল না ওরা—যদি আসামীর পকেটে কিছু পয়সা কড়ি পেয়ে গেল, নতুবা আসামীকে হাজতে পুরে দিল। পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখা গেল, কোন এলাকায় কতগুলি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, ক'জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে, কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে, আর সান্ধ্যআইনের আমলে কতগুলির কি সাজা হয়েছে। এরা কারুর নাম নয়, এদের কোন ব্যক্তিত্ব নেই—হিসেবের অঙ্ক হয়ে এরা রোজ সকাল বেলায় চায়ের সঙ্গে খবর সরবরাহের একটা অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।...

কতদিন এই সব কারফিউ এলাকা দিয়ে প্রভঞ্জন একলা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এসেছে। তখন পথ ছিল নির্জন। আজ আর সেই অনাস্থা অবিশ্বাসের ভাব নেই কারণ ১৯৪৭ সালের অগাষ্ট মাস পেরিয়ে গেছে। এখন একদল লোক বল্‌ছে আমরা স্বাধীন হয়েছি, আর সকলে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাদের এ দৃষ্টিকে ভাষায় রূপান্তরিত করলে শুনতে পাওয়া —তোমরা কেমন স্বাধীনতা পেয়েছো একবার দেখাও না ভাই! স্বাধীনতার স্বাদটা কেমন একবার জেনে নিই।

চৌরঙ্গী আর পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে এসে গাড়ি আটকে [illegible]ল বেশ কিছুক্ষণ। নিয়ন্ ল্যাম্পের আলোয় সজ্জিত ফুটপাথ ধরে চলেছে সান্ধ্যবিলাসীর দল মাঝে মাঝে দু'একটি পথিক দৈনন্দিন কর্মক্লান্ত দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রভঞ্জন সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—সারি দিয়ে প্রতীক্ষ্যমান গাড়িগুলোর ইঞ্জিনের মিলিত স্পন্দনের শব্দ, ওপাশের চলমান গাড়িগুলির মসৃণ গতিধ্বনি—সবটা জড়িয়ে এ একটা আলাদা জগৎ! সবাই চলেছে। উত্তর হতে দক্ষিণে চলেছে, চলেছে পূর্ব হতে পশ্চিমে, নতুন ঝক্‌ঝকে ক্রাইস্‌লার গাড়ি চলেছে, ডেব্‌লার, ডি সটোর তরল গতিপ্রবাহের পাশে সেকেলে ক্রাহাম গাড়িও রয়েছে একটা। সহসা মনে পড়ল রঞ্জিতার কথা আর

তার পাশে পার্বতীর চেহারাটা সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদিকে পথের মধ্যে পাহারার মত দাঁড়ানো পথ নির্দেশক দণ্ডের গায়ে হলুদে আলো জলে উঠল। সেই মুহূর্তে আইনে-আবদ্ধ সবগুলো গাড়ি গর্জন করে উঠল। সবুজ আলো জলতেই সারি দেওয়া গাড়িগুলো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ছুটতে শুরু করল। চলতে চলতে মাঝপথে বাধা পাওয়া যেন এদের সবারই কাছে এক বিড়ম্বনা বিশেষ। মানুষেরই প্রয়োজনে মানুষ কতকগুলো আইনকানুন দিয়ে নিজের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করার অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছে। নিয়ম মেনে চলার অভ্যাসে তারা ভুলে গেছে—এ নিয়ম তারই গড়া। যারা এ নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে যায় তারা শৃঙ্খলার পথে বিঘ্ন এনে নিজেকে এবং অপরকে বিপন্ন করে, আর তার জন্য শাস্তি তাকে পেতে হয়। ...এতক্ষণ ধ'রে এইভাবে এত অসংলগ্ন খণ্ডচিন্তায় নিজের মন ব্যাপৃত ছিল প্রভঞ্জনের সে খেয়াল হয়নি, যে মুহূর্তে বদ্ধগতি মুক্তি পেল সেই মুহূর্তেই সে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে নিজের মনের গতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

প্রভঞ্জনকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পরিবর্তন—আসুন, আসুন। আপনি যে আসতে পারবেন আশাই করি নি, তাই ডক্টর দেবকে একবার ডেকে ছিলাম, তিনি দেখেশুনে বলে গেলেন—খুব সাবধানে থাকতে হবে! ইয়ে—

—আমি আসতে পারব না ভেবেছিলেন, না আমার চিকিৎসা সম্পর্কেই আপনার আস্থার অভাব? অবিশ্যি দরকার বোধ করলে আমিই জানাবো যে, আপনি অন্যের সাহায্য গ্রহণ করুন। সে যাক, এখন তাহলে কি আমি ফিরে যেতে পারি?

প্রভঞ্জনের কণ্ঠস্বর একটু বক্র শোনায়।

পরিবর্তন দিশাহারা হয়ে বলে—না, না সে কী কথা! সান্ত্বনার কাছে ত একদফা ধমক খেয়েছি—এর ওপর আপনি যদি ফিরে যান তবে আর রক্ষে নেই। চলুন, ওঘরে চলুন!

—এমন কি বাড়াবাড়ি হ'ল আবার?

প্রভঞ্জনের কথা শেষ হওয়ার আগেই পরিবর্তন জবাব দেয়—মানে,

বুঝছেন ত বুড়ো হয়েছি। আর দেববাবু সেকালের ধন্বন্তরী। ভাবলাম আপনি যদি ঠিক সময়ে না পৌঁছোন, তাই—

—আপনি ত আমাকে খবর দিয়েছেন আধঘণ্টার বেশি হবে না।

—হ্যাঁ, তার আগেই উনি দেখে গেছেন। আপনি যেন সান্ত্বনাকে বলে বসবেন না, আধঘণ্টা আগে আপনাকে খবর পাঠিয়েছি। এমন ত হতে পারে যে এর আগে টেলিফোন থেকে আপনাকে ডেকে দেয় নি। মোট কথা দেববাবুও ভালো চিকিৎসক! হ্যাঁ, আপনি খুব বড় ডাক্তার— এই অল্প বয়সে এত যশ প্রতিপত্তি ক'জনের হয়। বয়সের তুলনায় সত্যিই—

ব'লে পরিবর্তন ডাক্তার সরকারের একটা হাত চেপে ধরে বলল ফিস্ ফিস্ করে—আপনি যেন আসতে সময় পাবেন না বলেছিলেন, এটা ওকে বুঝিয়ে দেবেন! বুঝলেন—

অন্ধকার ঘরে জানালা দিয়ে যেটুকু রাত্রির আলো এসে পড়েছে তাতে একপাশের টেবলে পাতা শুভ্র একখণ্ড কাপড় ফর্সা দেখাচ্ছে, ঘরের আর সব কেমন আবছা অস্পষ্ট মনে হয়। পরিবর্তন মৃদু কণ্ঠে বলে—সান্ত, ডাক্তারবাবু এসেছেন। বাতিটা জ্বালব?

—না, না, চোখে বড় লাগে। আলোর দিকে চাইলে আমার মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যাবে।

এ ঘরের পরিবেশে প্রভঞ্জনের দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে গেল। এখন অন্তত রমিতার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিছানার রঙীন চাদরটা কেমন সাদাটে দেখায়। প্রভঞ্জন প্রশ্ন করে, কেমন আছেন?

রমিতা ক্ষীণকণ্ঠে বলে—সময় ছিল না আপনার তবু জোর করে ডেকে এনেছি, বিরক্ত হয়েছেন ত! কি করব বলুন, আর কোনো ডাক্তারের চিকিৎসা আমার ভালো লাগে না। বাবা সেকথা যে কেন বোঝেন না! আর সত্যি বলতে কি, আপনার ওপর ওঁর তেমন ভরসা নেই—আপনি কম কথা বলেন; আশ্বাস দেন না, আশ্চর্য হন না, অথচ আপনি ডাক্তার, এটাই উনি আপনার অক্ষমতা বলে ধরে নিয়েছেন। তা ছাড়া অভিজ্ঞতার চিহ্ন হচ্ছে শাদা চুল, তাও আপনার নেই।

এ রকম অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন অস্বস্তি বোধ করে। পাশের ঘরে তার অনেক কাজ আছে, অতএব উত্তর প্রত্যুত্তরের অবতারণা না-করেই পরিবর্তন অন্তর্হিত হ'ল।

প্রভঞ্জন রমিতার কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বলে—সবই ত শুনলাম। কিন্তু কেমন আছেন সেটা—!

—এখন বেশ ভালো লাগছে।

—তা বুঝতে পারছি, কপালে ঘামও ত হচ্ছে না। হঠাৎ senseless হয়ে গেলেন, তার আগে কোনোরকম অস্বস্তি হয় নি? মানে, কি রকম মনে হচ্ছিল?

কপালের ওপর প্রভঞ্জনের হাতখানা তখনও ছিল। রমিতার পেলবস্পর্শ হাত ওর বলিষ্ঠ কঠিন হাতের কয়েকটি অঙ্গুলিকে স্পর্শ করে যেন সম্মোহিত করে রেখেছিল। ঠাণ্ডা নরম ধব্‌ধবে ওর মুঠোর ঘামে প্রভঞ্জনের বন্দী হাতখানা ভিজে উঠেছে! দীর্ঘকাল পরে যুগান্ত পারের কবরের তলা থেকে একটা জীবন-কঙ্কাল যেন এগিয়ে আসছে আব্‌ছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। প্রভঞ্জন চম্‌কে উঠ্‌ল তাকে দেখে। যাকে সে দেখেছিল, বেশ মনে পড়েছে—এমনি একটা রাত্রির স্তব্ধতায়, একটি আরও নমনীয় মোহময় স্পর্শে কাতর হয়ে গুমরে উঠেছিল যে প্রাণ, এ তারই ছায়া-কঙ্কাল। সচেতন হয়ে হাতখানা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে সে। বন্ধন যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠ্‌ল। নীরব আয়ত চোখের মুখর অভিব্যক্তি অন্ধকারের পটভূমিকায় শাদা বকের মতই শুভ্রসমুজ্জল হয়ে ধরা দিল। প্রভঞ্জন ব্যাকুল আর্ত কণ্ঠে বল্‌ল—না, না, আপনি আমায় ছেড়ে দিন! ছাড়ুন। উঃ, একি ভুল করছেন রমিতা দেবী!

—পারব না। আমি একলা থাকতে পারব না আর। তুমি ত জানো প্রতি পলে আমার কি দুঃসহ জ্বালা! নিজের সঙ্গে আর লড়াই করতে পারছি না—আপনাকে ভুলে যাওয়া যে এত কঠিন তা ত ভাবতে পারি নি।

একটু চাপ দিয়েই প্রভঞ্জন হাতখানা মুক্ত করে নিল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ল সে—একা কে নয় বলো! পথ ত একারই জন্য—

—কিন্তু পথ থেকে ঘরে যাবার জন্তে যে আমার মন পাগল।

—ঘর ত জনহীন! পথে তবু আর পাঁচজনের দেখা পাবার আশা থাকে। কিন্তু ঘর থেকে যে আর সবাইকেই দূরে রাখা হয়।···আমিও একদিন এই ভুল করতে বসেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের তাড়নায় পথের পাঁচজনের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ হল—ঘরটা হল নির্বাসিত। সে যুগে খুব কষ্ট হত, ঘর ছাড়া জীবন অবলম্বনহীন, নিরর্থক মনে হয়েছিল! কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের সুখদুঃখ আর জীবনমরণের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে ফেল্‌লাম। বুঝলাম জীবন দর্শনই জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন।

রমিতা সোজা হয়ে উঠে বসে বল্‌ল—মহারাজ, তোমার কাছে সান্ত্বনা ভিক্ষে করিনি। ওতে আর মন ওঠে না। একদিন তুমিই ত বলেছিলে, আমার এ মনকে গৃহস্থ করতে হবে—তবে আজ কেন পিছিয়ে যাচ্ছ! যদি তখন ভরসা না দিতে তাহলে এ দাবির দুঃসাহস হত না আমার। অবলম্বন কে চেয়েছে? আশ্রয়ও চাই নে—জীবনকে অনুভূতির নিবিড়তায় বাঁধতে চাই।

অনেক রুক্ষ কঠিন কথাই বলতে পারত প্রভঞ্জন, কিন্তু আজ যেন এইসব শক্ত কথার ঘা দিয়ে এ পরিবেশটুকু নষ্ট করতে সাহস হয় না। প্রভঞ্জন শুধু বললে—আমরা চিকিৎসক। আমাদের আধিব্যাধি বিশ্লেষণের অধিকার আছে। এর বেশি ত কিছু—

—আছে, আছে অনেক বেশি অধিকার তোমার আছে। তুমি অমন মুখোশ পরে থেকো না, দোহাই! আমি ত তোমায় কেড়ে নিতে চাই না, বন্দী করতেও চাই না—শুধু চাই ধরা দাও, শুধু দেখতে চাই মুখোশ খুললে তোমার স্বাভাবিক মানুষের রূপটা কি! ওগো এমনি ভাবে মানুষের মনকে হত্যা ক'রো না নিজের হাতে।

—তুমি অতটা বিচলিত হয়ো না, শরীর আরও খারাপ হবে যে।

—হোক। আমি মরে গেলে তাতেই বা তোমার কি এসে যায়! উঃ তুমি কি পাষাণ! না, না তোমার ত দোষ নয়—আমিই যে অন্তঃসারশূন্য। নইলে একটি পুরুষের বুকে তুফান তুলতে পারি আজ এমন সম্পদ আমার নেই!

—আমি আর মানুষ নেই রমিতা—কতকগুলো শিরাউপশিরা আর শ্বেতকণিকা, লোহিতকণিকার সমষ্টি, পেশী আর হাড়ের অসম্বদ্ধ কাঠামো ছাড়া আর কিছু নই আমি! মানুষটাকে কয়েক বছর আগে পথের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।—এখন ডাক্তার।

—বুঝলাম তোমার চোখে মানুষের পরিচয় কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তবু আমি যে ভুলতে পারছি না, তোমার এই দুটো চোখেই একটা পিপাসার্ত দৃষ্টি জেগেছিল। সে কী ভুল হতে পারে? না, না! বলো ভুল নয়। উঃ, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। বাতাস নেই, নিশ্বাস কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে! আমায় ধরো—!

বলতে বলতে রমিতা প্রভঞ্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। প্রভঞ্জনও বুঝতে পেরেছিল রমিতার ফিট্ হয়েছে। সে চট্ করে ধরে ওকে শুইয়ে দিল। তারপর আলোটা জ্বালিয়ে ডাকল—পরিবর্তন বাবু, পরিবর্তন বাবু!

পরিবর্ত্তন চশমাটা কপালে তুলে সাড়া দিল—এই যে যাই!

প্রভঞ্জন কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় বিশেষ কিছু করতে গেলে রোগীর কষ্টই বাড়ে। তবু প্রভঞ্জন ভাব্‌বার চেষ্টা করে, কি ভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে রমিতার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা যায়। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হয় তার। পরিবর্তনের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে প্রভঞ্জন। পরিবর্তন বলল—ঠিক এই রকম ভাবেই পড়েছিল বিকেল থেকে। বলেন ত ডাক্তার দেবকে একবার ডাকি—তিনি ত একজন বিশেষজ্ঞ, হাজার হলেও বহুদর্শী মানুষ ত!

আহত আত্মাভিমানে দৃপ্তকণ্ঠে প্রভঞ্জন জবাব দেয়—তার দরকার নেই।

হতাশার নিরুপায় ভঙ্গিতে পরিবর্তন বলে—ভালো! কিন্তু প্রভঞ্জন বাবু আপনার ওপর একটু আস্থা ছিল এই যে, দুরবস্থার সুযোগটা অন্তত আপনি নেবেন না—এখন দেখছি সবাই সমান। The world is to much with us.

—What do you mean ?

—না, কিছু নয়।

তারপর পরিবর্তনের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক কোমল হয়ে আসে—সত্যি জানেন না আপনারা, সান্ত আমার কি মিষ্টি মেয়েই ছিল। ওর চোখে ছিল মায়া, মনে মাধুর্য! ও আমার এমন মেয়ে ছিল না—তাই ত বড় কষ্টেও ওকে দুনিয়ার ছাইগাদায় ফেলে দিতে পারিনি। না হলে আমার এই বুড়ো বয়সে এর মধ্যে পড়ে থাকতে কি দায় পড়েছে। এখনও ও কাঁদে—কাঁদে বলেই ভরসা হয় আবার একদিন এই ভুলের পালা শেষ ক'রে ফিরে আসবে ঘরে। শঙ্কর, শঙ্কর—! নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যম্। শক্তির মহিমা আছে।

প্রভঞ্জন স্টেথোস্কোপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর তার দৃষ্টি রয়েছে রমিতার আড়ষ্ট স্থির মুখের ওপর নিবদ্ধ।

রমিতার দেহ যখন ঈষৎ নড়ে উঠল তখন সে সম্বিত ফিরে পেল। প্রভঞ্জন দেখল পরিবর্তন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল অবস্থায় দণ্ডয়মান।

কি এক অব্যক্ত নমনীয়তায় প্রভঞ্জনের মনটা কোমল হয়ে গেল। সে রমিতার কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রমিতা চোখ মেলে তাকাল, ওর চাহনি কেমন অপরিচিত। কিন্তু পরমুহূর্তে প্রভঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ওর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি খেলে গেল।

রমিতা বললে—ডাক্তার বাবু! আপনি খুব কষ্ট করছেন আমার জন্যে—

এ যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ—এ যেন অভিনেত্রী রমিতা মজুমদার। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অন্ধকারে যে নারী আপনার আকুল অন্তরবেদনাকে উৎসারিত করেছিল সে যেন অন্য কেউ! একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে প্রভঞ্জন বলে—না, কষ্ট আর কি!

—ক'টা বাজলো?

এ প্রশ্ন প্রভঞ্জনেরও প্রশ্নের প্রতিধ্বনি! সেও অলক্ষ্যে বললে—ক'টা বাজলো? তারপর ঘড়ি দেখে বললে—দশটা সাঁইত্রিশ!

—তাহলে আর আপনাকে আটকে রাখা ঠিক নয়। এতক্ষণ সময় মিথ্যে নষ্ট হল আপনার।

তারপর পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে রমিতা বললে—বাবা! ওঁর প্রণামীটা

আমার হয়ে তুমিই দিয়ে দাও—একশ' টাকাই দিও। কত কাজের ক্ষতি করে এসেছেন—!

কথাগুলো নিতান্তই সাধারণ অথচ আজ এগুলো যেন প্রভঞ্জনকে মর্মান্তিক আঘাত করে। তার সমগ্র সত্তা প্রতিবাদ করে। অথচ মুখে যে কেন কথা সরছে না! প্রভঞ্জন আড়ষ্ট ভাবে দু'হাত তুলে নমস্কার করে বেরিয়ে যাবার সময় পরিবর্তনকে বললে—আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, কয়েকটা ওষুধ দিতে হবে রাত্রের জন্যে।

—আমিই যাচ্ছি!

—না, না, তাহলে বাড়িতে থাকবে কে?

—আর কে-ই বা যাবে? কেউ ত নেই আমার।

—আচ্ছা তাহলে আমিই পাঠাবো লোক দিয়ে। আপনি ব্যস্ত হবেন না পরিবর্তন বাবু।

শেষের এই অযাচিত উপকারটুকু করবার সুযোগ পেয়ে প্রভঞ্জন নিজেকে কিছুটা উপকৃত বলেই মনে করে। এইটুকু কাজের মধ্যে দিয়ে যেন অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুশিতে ভরে উঠল প্রভঞ্জন। ভারগ্রস্ত মনটা তার হাল্কা হল। তবুও একটা আলোড়ন অনুভব করে সে। তার বুকের মধ্যে হাতুড়ির প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে কঠিন একটা কিছু ভাঙতে চেষ্টা করছে কে!

আগামী কাল ক্লার্জিম্যান হলে ডাক্তার সরকারকে অভিনন্দন জানানো হবে। উদ্যমে উৎসাহে একদল ছাত্র সারা শহর চষে ফেলছে—শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের সমাবেশ সাধনই তাদের সংকল্প। তারা জানে, ডাক্তার সরকার অসাধারণ মণীষার অধিকারী এবং তিনি একজন সত্যকার সমাজসেবাব্রতী! ক্লার্জিম্যান হল্ তেমন প্রশস্তপরিসর নয়—হয়ত শেষ পর্যন্ত তারা অভ্যাগতদের সকলকে বসবার জায়গা দিতে পারবে না, কিন্তু সেকথা এখন ভাববার সময় তাদের কই!

প্রভঞ্জনকে একটা অভিভাষণ পাঠ করতে হবে। এটাই তার তরফের একমাত্র কর্তব্য। সে সম্পর্কেও ছেলেরা বার কয়েক আনগোনা করেছে, তারা বলেছে অভিভাষণের অগ্রিম কয়েকটা নকল সব কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে যাতে ডাক্তার সরকারের অমূল্য বাণীর সবটাই দেশবাসীর সমক্ষে প্রচারিত হয়—তাদের বিশ্বাস, নতুবা দেশবাসীর অন্ধকার মন আলো পাবে না। তরুণ মনের এই অদম্য আগ্রহের উজ্জলতা যেন প্রভঞ্জন সরকারের মনকেও নূতন করে উজ্জীবিত করেছে। এদের চোখের রঙীন স্বপ্ন, এদের মনের নবীন অভিব্যক্তি পৃথিবীকে দেখবার নতুন দৃষ্টি এনে দেয়। আশার আলোক বর্তিকায় এদের দৃষ্টি নিঃসঙ্কোচ।

যে সময়টা প্রভঞ্জন রমিতার চিকিৎসা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে অন্ততঃ বার চারেক তার চেম্বার, ল্যাবরেটরী আর বাড়িতে ছেলেরা ছুটোছুটি করেছে, হাসপাতালে টেলিফোন করেছে। অবশেষে হতাশ হয়ে তারা জানিয়ে গেছে যে, হয়ত রাত সাড়ে এগারটার সময় তারা আসবে ডাক্তার সরকারের অভিভাষণ লিপি নিতে। কাল সকালের মধ্যে ছাপার কাজ শুরু না হলে যথাসময়ে অভিভাষণ-লিপি বিতরণ করা যাবে না। খবরের কাগজওয়ালাদের তরফ থেকে যে সব রিপোর্টার আসবে তারা কেবল চা আর খাবার খেয়ে গোটা কয়েক কথার ভুল অর্থ বুঝে যা খুশি তাই লিখে নিয়ে যাবে, সেটা ছাত্ররা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। খবরের কাগজের ওই সবজান্তা মনোভাবওয়ালাদের হাত থেকে ডাক্তার সরকারকে ছাত্ররা বাঁচাতে চায়। তাই তারা নিজেদের তরফ থেকে পাকা ব্যবস্থা রাখতে তৎপর। সম্পাদক মহাশয়দের আনানোর আয়োজনও হয়েছে সভাতে। মোটকথা, প্রভঞ্জনের অজ্ঞাতে তাকে নিয়ে একটা তুমুল হৈচৈ করবার উদ্যোগ চলেছে।

বাড়ি ফিরে আনুপূর্বিক খবর পেয়ে প্রভঞ্জনের চক্ষুস্থির হয়ে গেল। তার ধারণা ছিল যেমন আর পাঁচজন ডাক্তার গবেষণার্থে সরকারী অথবা বেসরকারী অর্থসাহায্য পেয়ে বিদেশ যাত্রার সময় একটা ঘরোয়া অভিনন্দন পেয়ে থাকেন, তার বেলাও সেই রকমই একটা কিছু হবে। কিন্তু আজ আর

বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে, ডাক্তার পি, সরকারকে ছাত্ররা অল্পে রেহাই দেবে না। প্রভঞ্জনের একটা সুনাম হয়েছে একথা সে জানে, আজ বুঝল যে সে জনপ্রিয়ও বটে। তার এ জনপ্রিয়তা কবে হ'ল এবং কেন এতখানি হল, তা সে বুঝতে পারে নি।

সারাদিন তার উপর দিয়ে প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছে, এর পর এই সমস্যাটা যেন আরও ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। এখন বসে বসে বিনীত ভদ্র ভাষায় সর্বসাধারণের মনোহরণকারী ফাঁকা কথা সাজাতে যেন আর ভালো লাগছে না। তবু এর মধ্যে একটা নূতন আশ্রয়ের সঙ্কেত লুকানো আছে কি না কে বল্‌তে পারে! সকালে পার্বতীর বিষাক্ত ইঙ্গিত দিয়ে যে দিনের সূচনা হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি এতটা বিস্ময়কর এবং অভাবনীয় হবে তা কে জান্‌ত! পার্বতীর কণ্ঠের সেই তিক্ততা, মায়ের কঠিন নির্দেশ, জয়ন্তর অপমানকর উক্তি, রমিতার অপ্রত্যাশিত আবেগময় আচরণ—তারপর এখন এই অভিভাষণ লেখার তাগিদ!···অন্ততঃ আর সবকিছু থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাওয়া যাবে, এটা কম সান্ত্বনা নয় প্রভঞ্জনের বাত্যাবিক্ষুব্ধ মনের কাছে।

খুব সংক্ষেপে সে আহারাদি সমাপ্ত করে কাগজ. কলম নিয়ে নতুন করে লিখতে বসল—এর আগে সকালবেলা যা একটু লেখা হয়েছিল সেটুকু ছিঁড়ে ফেল্‌ল টুক্‌রো টুক্‌রো করে।

অল্প কথায় নিজের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে শেষ করাই তার মতে বিবেচকের কাজ। সে যা লিখলে তা মোটামুটি এই :

"আজ আপনাদের তরফ থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হচ্ছে বিদেশে—বিশেষ একটি শ্রেণীর রোগ সম্বন্ধে যে সর্বনূতন তথ্য আবিষ্কার হয়েছে এবং তাকে দেশ ছাড়া করবার জন্য যে সব বিধি-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে সেগুলো জেনে আসবার জন্য। আমি যৌনব্যাধির কথা বল্‌ছি। আজ আর একথা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই যে, যৌনব্যাধি একটা সমস্যা হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে। অবশ্য পৃথিবীর সর্বাধিক সভ্য-সমাজেও এ সমস্যা নিতান্ত সামান্য নয়। তাই বলে আমাদের দেশে এর

গুরুত্ব উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের সমাজের বড় সমস্যা, রোগ গোপন করার অভ্যাস।

"বিদেশে না গিয়েও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, এদেশের অসুখের চিকিৎসার সঙ্গে এইসব রোগের চিকিৎসাকে আরও প্রচুর পরিমাণে সম্প্রসারিত করা দরকার। অর্থাৎ যাতে খুব সহজে হাতের কাছে এইসব বিশ্রী ধরণের অসুখের চিকিৎসার সুযোগ আমাদের দেশের লোকে পায়, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেকেরই দরকার।

"আমাদের এদেশে বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের রক্ত পরীক্ষার কোনো প্রথা নেই। অথচ আজকাল এই অযত্নের ফলে অনেক পরিবারে জটিল সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। পারিবারিক জীবনের অশান্তি বড় সাংঘাতিক সমস্যা।

"আমাদের দেশের লোকে এদিকে একটু সজাগ হচ্ছে, এটা আশার কথা। কিন্তু এখনও এইসব অবাঞ্ছিত ব্যাধির বিরুদ্ধে তেমন ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়ার রেওয়াজ দেখছি না এটা ভুললে চলবে না। হয়ত একদিন আমরা এইসব রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাবো। যদি ঠিক মতো মানুষের মধ্যে এই ধারণা আসে যে নানারকম অসংযত যৌনাচারের কুফল স্বরূপ এগুলি জাতির ভবিষ্যত জীবনকে পঙ্গু করতে বসেছে তাহলে, এবং প্রত্যেক রোগী যদি যথাযথ চিকিৎসায় নিজেকে রোগমুক্ত করবার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলেই বাঁচোয়া। ব্যাধিকে শুধুই ব্যাধি ব'লে মনে করতে হবে—অপরাধ বালে ধ'রে নিলে নিজেদেরই ক্ষতি, কারণ মানুষ অপরাধকে গোপন করতেই চায়।

"বাংলা দেশের একটা আনুপূর্বিক যৌনব্যাধির তালিকা দিলে আপনার আমাদের দুরবস্থার খানিকটা অন্ততঃ বুঝতে পারবেন। খানিকটা বলছি, তার কারণ আমার বিশ্বাস, এই শ্রেণীর রোগাক্রান্তের শতকরা ষাটজনের ওপর লোক বিনা চিকিৎসায় অথবা বাজে টোটকা কিম্বা সস্তার "অতিগোপনীয় রোগের অব্যর্থ ঔষধ: বিফলে মূল্য ফেরৎ" মার্কা ক্ষতিকর চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করে। পশ্চিম বাংলায় মোট তেরোটি এই রোগের সরকারী

চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। তার মধ্যে দশটি কলকাতায় এবং বাকী তিনটি ২৪ পরগণা, দার্জিলিং এবং হুগলী জেলায়। ১৯৪৮ সালে মোট ২,২৫,৯৪৪ জন রোগী এই সব কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। ১৯৪৭ সালে ১,৭৬,০৪৩ জন রোগী এসেছিল চিকিৎসার ব্যবস্থার আশায়। ১৯৪৮ সালের রোগীদের মধ্যে নূতন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৩৫, ৩৮১ জন, বাকী সব পুরনো রোগী। নতুন যারা চিকিৎসার জন্য এসেছেন তাদের মধ্যে সাড়ে ন'হাজার হচ্ছেন মেয়ে। এই সব মেয়েদের মধ্যে ৬৩৯৩ জন গৃহস্থ, ১৪৪৪ জন বেশ্যা, ৬৬৩ জন ঝি, ৫২৩ জন কামীন্, ১৫৮ জন ভিখারিণী, ১৪২ জন ছাত্রী এবং ৯১ জন টেলিফোনে অথবা অন্যত্র চাকরী করেন। পুরুষদের মধ্যে ৯৯০১ জন শ্রমিক, ৪৪১০ জন ব্যবসায়ী, ৩৮৫৫ জন কেরাণী এবং দোকান কর্ম্মচারী, ৩৫৬২ জন চাকর, ১২৪৬ জন ছাত্র।

"আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজের সব স্তরেই এই যৌনব্যাধির কিছু না কিছু পদচিহ্ন পড়েছে। বিজ্ঞানের তরফ থেকে একটা কথা অস্বীকার করা চলে না—এই যে রোগের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে তার মূল কারণ অনুসন্ধান আর এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করা। তার মানে এ নয় যে, প্রতিষেধক উপায় আবিষ্কার করলে অবাধে নরনারীর যৌন সম্মেলনের সুবিধা হবে। সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি অতিসাধারণ নিয়ম মেনে চল্‌বার কথা, সেই নিয়মকে গোপনেই হোক আর প্রকাশ্যেই হোক লঙ্ঘন করলে তাকে তার মূল্য দিতেই হয়। আমি এখানে নীতিপ্রচারের সংকল্প নিয়ে কথা বল্‌ছি না—সমাজ সংরক্ষণের জন্য যা করা দরকার সেটা আপনারা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

একদিকে খাদ্যাভাবে, ক্ষয়রোগে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ লোক মরছে আর পঁচিশ লক্ষ লোক ওই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তার ওপর এই যৌনব্যাধির সমস্যা। আরো একটি সমস্যা যা সমাজ জীবনকে উৎপীড়ন করছে—তা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ। মানুষ নানা উপায়ে আর নিজেদের দায়িত্বের বোঝা ভারী করতে প্রস্তুত নয়। যারা শিক্ষিত তারা বৈজ্ঞানিক উপায় গ্রহণের দিকে ঝুঁকেছে, আর যারা অশিক্ষিত তারাও চেষ্টা করছে জন্মনিয়ন্ত্রণের।

"এতে করে বোঝা যাচ্ছে যে, দেশের সমাজদেহে একটা আমূল পরিবর্তন চলেছে। এই সময়ে প্রত্যেকটি মানুষের এগিয়ে আসা দরকার নতুন পথকে সহজ, সুন্দর এবং বিজ্ঞানসম্মত করার কাজে সহায়তার জন্য। এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহকে যদি শিক্ষিত সমাজ দিক দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তবেই জাতির ভবিষ্যৎ সুন্দর এবং স্বচ্ছন্দ হবে!

"আমার আশা হয় আগামী সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন এই পরিবর্তনের আলোড়ন মিলিয়ে গিয়ে সমাজের নূতন রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

"আপনারা আমার এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলে গ্রহণ করলেই আনন্দিত হবো।"

লিখতে লিখতে প্রভঞ্জনের মাথা ঝিম্‌ঝিম করতে লাগল। লেখা শেষ করে তাকিয়ে দেখল ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই সাড়ে দশটা বেজে আর তারপর একটুও এগোয় নি।—আজ সকালে দম দেওয়া হয় নি। সারাদিনের মধ্যে সে কথাটা মনেই পড়েনি!

আলোটা নিভিয়ে শ্রান্ত দেহে বিছানার আশ্রয় নিয়ে মনে হল—দীর্ঘকাল পরে সে বাড়ি ফিরেছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারের দিকে জাগ্রত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। ঘুম নেই—চোখে ঘুম নেই, পৃথিবীর বুক থেকে কে যেন ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে! কোথায় দূরের কোন্ ঘড়িতে একটা আধঘণ্টার সঙ্কেত ধ্বনিত হল।……কাল সকালে উঠেই জয়ন্তর জন্য তদ্‌বির করতে যেতে হবে। ছাত্ররা কই রাত্রে আর এলো না।……ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তারা ত ফোন করেছিল, লিখতে লিখতে উঠে গিয়ে প্রভঞ্জন নিজেই ত তাদের আসতে বারণ করে দিয়েছে। কাল ভোরবেলা তারা আসবে। তা আসুক, প্রভঞ্জন মোটামুটি তার বক্তব্যগুলো একরকম গুছিয়ে লিখতে পেরেছে বলেই তার বিশ্বাস। কিন্তু এতেও মনে কোনো তৃপ্তি নেই। নিজেকে কেন এত তুচ্ছ, এত ক্ষুদ্র, এত অজ্ঞ মনে হচ্ছে প্রভঞ্জনের! তার ধারণা হচ্ছে, সে কিছুই জানে না, যে জানার অধিকার নিয়ে একজন মানুষ আর পাঁচজনকে পরিচালিত করতে পারে সে জ্ঞান তার কই! এই ক' বছরে সে অনেক রোগীর চিকিৎসা করেছে, আরোগ্যও হয়েছে বহু লোক

তার হাতে—অভিজ্ঞতাও অল্প হয়নি। তবু এটা ঠিক, যে বিজ্ঞানের সহায়তায় সে চিকিৎসক খ্যাতি লাভ করেছে তা আজও নিভুল বা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে নি। চিকিৎসা-বিজ্ঞান অগ্রগতির পথে চলেছে, সাধনা করছেন অনেক মনস্বী, আবিষ্কার হচ্ছে অনেক নতুন তত্ত্ব এবং তথ্য—প্রভঞ্জন যথাসাধ্য আধুনিকতম বিজ্ঞানসমিতির সংগে সংশ্লিষ্ট। তবু আজ এ অজ্ঞতাবোধ, এ অসহায় মূঢ়তা তাকে পেয়ে বসেছে। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার মনের সামনে জেগে ওঠে অতৃপ্তি আত্মা—ফাউষ্টের একটা রহস্যময় ছবি, তার ওষ্ঠে তীব্র আত্ম-অবজ্ঞার অভিব্যক্তি।

"Philosophy have I digested,
The whole of law and Medicine,
From each its secrets I have wrested,
Theology, alas, thrown in.
Poor fool, with all this sweated love,
I stand no wiser than I was before.
Master and Doctor are my titles,
For ten years now, without repose,
I have held mp erudite recitals
And led my pupils by the nose.
And round we go, on crooked ways or straight,
And well I know that ignorance is our fate,
And this I hate."

বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে আনন্দ আর উৎসাহের পরিবর্তে এ কী দুঃখ বেদনার যন্ত্রণা তাকে পেয়ে বসল! এই যে নিজেকে ছোট করে দেখা, এতে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা মুছে যায়, বেঁচে থাকাটাও কি শেষকালে তার কাছে নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে? নিজের কাছে এ প্রশ্ন বার বার করেও প্রভঞ্জন কোনো জবাব পায় না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান কিছুই কি মানুষকে অজ্ঞানতিমির থেকে জ্যোতির আলোক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না!

…নিজের মধ্যে কে যেন কথা কয়ে উঠল—হ্যাঁ পারে বই কি! আদি মানবের মনেও এ জিজ্ঞাসা ছিল। তবে সে জিজ্ঞাসার রূপ ছিল অন্য সেখানে মানুষ কল্পনা করে নিতে পেরেছিল পরাশক্তিসম্পন্ন এক বিধাতাকে, তার দিকে আকুল অন্তর সমর্পণ করে বলেছিল—আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চলো, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়! সেই থেকে মানুষ আলোর দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করছে। এ চলার শেষে হবে তখনই যখন সমাজ অবসান ঘটবে—কে জানে এর শেষ আছে কি না! হয়ত এই প্রশ্নই মানুষের অন্তরের জিজ্ঞাসাকে জ্বালিয়ে রাখবার বীজমন্ত্র! জিজ্ঞাসাই ত মানুষের মনুষ্যত্ব।

এই সব ছাড়াও অন্য প্রশ্ন তার মনকে নাড়া দিতে চেষ্টা করে—কিন্তু প্রভঞ্জন দৃঢভাবে নিজেকে সে দিক থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। অবশেষে বার বার ব্যর্থ হয়ে সে বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর অন্ধকারেই কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খানিকটা খেয়ে বাকীটা চোখেমুখে আর কানের পাশে ছিটিয়ে দিল। সে যখন পুনরায় বিছানায় এসে বসল তখন তার কাঁধের পাশ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছে। চীৎকার করে হেঁকে উঠল প্রভঞ্জন :

"This step I take in cheerful resolution.

Risk more than death, yea, dare my dissolution."

তবু একটি বিশেষ ছায়ামূর্তি তার মন থেকে অন্তর্হিত হল না। তার রহস্য গভীর অন্ধকারে আতঙ্ক সঞ্চার করে—ছায়াটা যেন মন থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে ওই জানালার সামনে, যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেইখানে। প্রভঞ্জন ইচ্ছে করেই সেদিকে তাকায় না। ও ছায়া ত তার অপরিচিত নয়। না দেখেও সে বুঝতে পারে একটা দৃষ্টি স্পর্শ করেছে তাকে! কে, ডরোথী? না রমিতা!

ডাক্তারকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পরিবর্তন মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বল্লে—সান্ত—একটা কথা বলব মা।

ক্লান্ত দৃষ্টিতে রমিতা পিতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পরিবর্তন বলে—তুই একটু ঘুমো। এখন থাক পরেই বলব।

—না, বাবা! তুমি কি বলছিলে বলো, আমার এখন ঘুম হবে না। আর ওষুধটা এলে একেবারে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শোবো।

যে কথাটা পূর্ব মুহূর্তে বলবার জন্য পরিবর্তন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে কথাটা যেন এখন তার পক্ষে বলতে পারা খুব শক্ত! সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—ডাক্তার সরকার খুব চমৎকার মানুষ!

—এই কথা!

—না, ঠিক এ কথা নয়—লোকটি মহৎ!

—আমার কাছে অন্তত তার মহত্ত্বের বিজ্ঞাপন দরকার হচ্ছে না।

—মানে, ওরকম লোকের মনে আঘাত দেওয়া কারুরই উচিত নয়

—আঘাত আবার কে দিল ওঁর মনে?

—ঠিক আঘাত নয়—মানে—

—বুঝলাম।

পরিবর্তন এবার উঠে পায়চারী করতে করতে বল্লে: আসল কথাটা তবে বলি, শোনো মা সান্ত্বনা! তোমার খেলার নেশাটা আর ওই নিরীহ সদাশিব মানুষটির ওপর চালান দিয়ো না।

যে কৌতূহলটা রমিতাকে চঞ্চল করে তুলেছিল এ কয়টি কথায় সেটুকু নিবৃত্ত হবার নয়। কিন্তু একে ঠিক সাধারণ কথা হিসাবেও ধরা চলে না। দীর্ঘ দিন হ'ল পরিবর্তন মেয়েকে তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোনো কথা বলে না। আজ হঠাৎ এ রকম গুরুতর ব্যাপারে পরিবর্তন মতামত জারি করবে, এটা রমিতার কাছে আশাতীত।

অনেকক্ষণ পরে পরিবর্তন আবার বল্লেন: আমি হয়ত অসঙ্গত আলোচনায় এসে পড়লাম—তবু বলি যে, প্রভঞ্জনকে তুমি এভাবে আকর্ষণ করো না! ওর মধ্যে যে মেরুদণ্ডযুক্ত মানুষ আছে, তাকে বাঁধতে গেলে যে নিষ্ঠার প্রয়োজন তা তোমার নেই। মা অনেক ত দেখালে, দেখলেও ঢের—কিন্তু কি পেয়েছ বল তো?

—বাবা, আমার শরীর খুব খারাপ, তা হোক তুমি বলে যাও! আমারও স্বপক্ষে বলবার কথা আছে, সেটা শুনবে শেষে!

—আমি আর কিছুই বল্‌তে চাই না! বল্‌ছি যে প্রভঞ্জনকে বাঁধতে চেষ্টা করো না।

—যদি এমন হয় যে, আমিই বাঁধা পড়ে গিয়েছি।

—সান্ত্বনা তুমি আমার মেয়ে। তোমাকে আমি চিনি।

—তোমার মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম, কিন্তু এখন আমার নিজের একটা সত্তা গড়ে উঠেছে। তাকে অস্বীকার করবে কে! বাবা, আমি যে দিন মিহিরের জুতোসুদ্ধ লাথির চিহ্ন বুকে নিয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন তুমি ত সংকল্প করেছিলে আমার কোনো কাজেই বাধা দেবে না! তুমিই আমায় স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিলে। তবে আজ কেন বাধা দিতে চাও। আমি আর পথে পথে বাঁদর নাচ দেখে বেড়াতে পারছি না। তোমায় ছুটি দিচ্ছি, কাশী চলে যাও! আমি প্রভঞ্জনের সঙ্গে ভেসে বেড়াব।

—উঃ, কী অভিশাপ। আমি তোমার স্বাধীনতাকে সম্মান দিতে আজও প্রস্তুত আছি কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করিনি, করতে পারব না। তবুও—

—অভিশাপ কেন বাবা! মুক্তি নাও।

—মুক্তিই ত অভিশাপ রে! যদি পারতাম তবে কি চোখের ওপর এত সয়েও এখানে থাকতাম? পারি না, তোকে একলা রেখে শান্তিতে থাকতে পারি না। তার প্রতিশোধ কি এমন করে সুদে-আসলে দিবি

—না এবারে বাইরের পাট চুকিয়ে দিয়ে বাসা বাঁধবো বাব! আর নয়।

—কিন্তু সে কি পাবে? যাকে তুমি খাঁচায় পুরবে—তার কি দানাপানি!

—কেন, আমার মন! মন ত আমার আর কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

—কেউ নয়?

—না, কেউ নয়!

—মন ছাড়া আর কি দিবি তাকে?

—সব। কিন্তু বাবা, আমায় তুমি আটকে রেখো না, আমি ওর সঙ্গে সমুদ্রে ভাসব।

পরিবর্তনের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল—শঙ্কর, শঙ্কর।

অসহায় প্রতিধ্বনি দেওয়ালের চারদিকে ব্যর্থবিস্তারে ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল।

পরিবর্তন বলে—কিন্তু সে যদি তোমাকে না নেয়? সে চিরকুমার। তার চোখেমুখে বলিষ্ঠ ব্রহ্মচারীর রুক্ষতা দেখেছ! সে স্বীকার করবে কেন বশ্যতা।

মুখ ফুটে বলতে পারল না রমিতা, মনে মনে যে কথাটা বার কয়েক বলল—সেটাই ত আমায় পাগল করেছে। অপরাজিত পৌরুষ আমার ধ্রুবতারা!

কলিংবেলটা বেজে উঠল বাস্তব জীবনের ইঙ্গিতের মত। পরিবর্তন ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল এবং মিনিট তিনেক পরে একটা ওষুধের শিশি এবং একটি মোড়ক হাতে করে ফিরল।

টেব্‌লের ওপর সেগুলি রেখে মোড়ক থেকে একটি পুরিয়া বার করে, গ্লাসে জল ঢেলে নিয়ে মেয়ের মুখের কাছে ধ'রে বল্লে—হাঁ করো।

রমিতা প্রশ্ন করে—এটাও তেতো নাকি?

—কি করে বলবো? এইমাত্র ত প্রভঞ্জন লোক দিয়ে পাঠিয়েছেন, নতুন ওষুধ।

ওষুধ এবং জল নিঃশেষ করে বিকৃত মুখখানা যতদূর সম্ভব প্রশান্ত করে রমিতা বলে—দেখলে ত এবার বিশ্বাস হচ্ছে!

বিস্মিত দৃষ্টিতে পরিবর্তন বলে—কি।

—উনি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তা বুঝতে পারছ!

—কেন?

—বাঃ, এই যে ওষুধ পাঠিয়েছেন।

পরিবর্তন অবজ্ঞাভরে ওষুধের শূন্য পুরিয়াটাকে আঙুলের চাপ দিয়ে ছোট্ট করে পাকাতে পাকাতে বল্লে—এটা ডাক্তারের কর্তব্য করেছে সে!

এর মধ্যে অন্য কোনো ইঙ্গিত থাকতে পারে না। তোমরা যা বহুদর্শী, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে যাওয়াই ভুল!

পরিবর্তনের এ অভিমান ইচ্ছাকৃত নয়—নিজের ওপরই কেন যে তার একটা অনাস্থা হয়েছে এবং তার মনে হল রমিতা বুঝি তাকে কটাক্ষ করেছে, তাই আর সহ্য করতে পারল না সে।

রমিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরল। শ্রান্তি আর অবসাদে ওর শরীরের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখের পাতাও কেমন আপনিই বুজে এলো নিমেষের মধ্যে। হয়ত ঘুমের ওষুধই দিয়েছে—ওর মনে হয়।

বেরিয়ে যাবার সময় পরিবর্তন ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে রমিতার ঘুম নেমে আসা ওষ্ঠের সীমান্তে যে তৃপ্তির হাসি ভেসে উঠেছিল—তা দেখবার জন্য কেউ ছিল না তার কাছে। অনেক দিন আগে বোধহয় এমন হাসি সর্বক্ষণ লেগে থাকত ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখে। আজ এ হাসি দুর্লভ।

জাহাজ চলেছে! সেখানে কেবল অচেনা মুখের মেলা। একটিই পরিচিত—অতি পরিচিত মানুষ। তা হোক, বিশ্বময় আর সব কিছু যেমন খুশি তেমনই থাক না কেন, রমিতার তাতে কিছু এসে যায় না। এখন ওরা জাহাজে যাচ্ছে, কই, লোকেরা যে গল্প করে জাহাজে উঠলেই বমি হয়, শরীর খারাপ করে, রমিতার ত সে সব কিছু হচ্ছে না! একটু অবাক হয়ে রমিতা প্রশ্ন করে, তার জবাবে প্রভঞ্জন বলে—ভয় নেই, আর কিছু হবে না, আজ চারদিন ত কেটে গেল।

রমিতা বলে—বাঃ বেশ ত! আর কোনো ভাবনা নেই! একবার আমেরিকায় যাবো। হলিউড! তুমি কিন্তু আপত্তি করতে পারবে না।

—আমায় আগে যেতে হবে লণ্ডনে বেকার স্ট্রীটে ডাঃ রিসের ক্লিনিকে। তোমরা যে যতই বলো টেভিষ্টক ক্লিনিকে তোমার একটা মানসিক চিকিৎসা করিয়ে নেওয়া ভালো।

সে কথায় রমিতা হেসে উঠল।…

ঘুম ভেঙে গেল। এ কী, বালিসটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। ঘুমজড়ানো চোখে চারিদিকে তাকিয়ে রমিতার মনে হয় সকাল হতে আর দেরি নেই। মনে পড়ল স্বপ্নের কথা—হ্যাঁ টেভিষ্টক ক্লিনিকের কথা প্রভঞ্জন গল্প করেছিল একদিন। সেখানে মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই সব কিছু চিকিৎসা হয়। স্বপ্ন দেখছিল রমিতা!

সামনের কয়েকটা দিন রমিতা সাবধানে থেকে শরীরটা সুস্থ করে নেবে। তারপর আর কোনো ভাবনা নেই। কোনো সংশয়ের ছায়াকে ও আমল দিতে চায় না। একটা আশা ও আশ্বাসের প্রবাহে সব সন্দেহের পরিসমাপ্তি করতে চায় রমিতার তৃষাদগ্ধ মন। গুন্ গুন্ করে ও গেয়ে উঠল:

"জ্বালো নবজীবনের
নির্মল দীপিকা,
মর্তের চোখে ধরো
স্বর্গের লিপিকা!"

শহর জেগেছে অনেক সকালে, কিন্তু আপিস পাড়ার হানাবাড়িগুলো এখনও তেমন মুখর হয়ে ওঠে নি কেরাণীর জুতাঘর্ষণে। কলকাতা শহরের বড় বড় রাজপথগুলো গাড়িঘোড়া এবং মানুষের ভিড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সারি সারি দোকানপত্র নতুন দিনের প্রথম উদ্যমে চঞ্চল। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ-এর সম্মুখে দীর্ঘ একটি অবিচ্ছিন্ন মানুষের সারি। তাদের মধ্যে শুভ্র-মলিন বেশবাসের বৈচিত্র্য আর অবোধ্য গুঞ্জন। পদাতিক যাত্রীরা হাতে রুমাল বাঁধা কৌটায় যথাসম্ভব আহার্য সঞ্চয় নিয়ে আপিসের দিকে ক্ষিপ্রবেগে চলমান। বেলা নটা।

সাহেবপাড়া—না, ঠিক সাহেবপাড়া না-বলে এ অঞ্চলকে মিশ্র আফিস অঞ্চলই বলা উচিত। ললিতার মা সাত সকালে উঠে ডাক্তার দাদাকে বাড়ীতে পাবার আশায় ছুটেছিল, কিন্তু প্রভঞ্জন নাকি ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতেই বাড়ি হ'তে বেরিয়েছে। অগত্যা অপ্রসন্ন মনে বাসিপাট সেরে দিয়ে, মোটামুটি বাসনপত্র মেজে অবশেষে নিধুকে বাজার ক'টা কুটে

দেবার কথা ব'লে ললিতার মা যখন প্রভঞ্জনের ডাক্তারখানায় এসে পৌঁছলো —বেলা তখন প্রায় নটা। তার হাতে একটি মাত্র টাকা সম্বল : চমৎকারিণীর কাছে প্রচুর ধার নেওয়া হয়ে গেছে, অন্যত্রও আর কেউ ধার দিতে চায় না। এখন একমাত্র ভরসা প্রভঞ্জন। প্রভঞ্জনের কাছে মুখ ফুটে চাইতে মন সায় দেয় না—তার কারণ, ললিতার মা বেশ ভালো [illegible] জানে যে, এই মানুষটির ঋণ পরিশোধ করবার কোন পথ নেই, বিনা [illegible] ব্যয়ে প্রভঞ্জন সময়ে অসময়ে পাঁচ-দশ টাকা ললিতার মা চাইবামাত্রই দিয়ে থাকে। এমনিতে ললিতার মা মানুষকে ঠকিয়ে, কাজে ফাঁকি দিয়ে আপন স্বার্থটুকু বজায় রেখে চলতে খুবই পটু—কিন্তু যে মানুষকে ফাঁকি দেবার সুযোগ নেই, যার বিন্দুমাত্র উপকারে সে আসতে পারবে না, যাকে ঠকাবার কোনো অছিলাই মিলবে না—তার কাছে হাত পাততে ওর কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। ও হচ্ছে সেই ধরণের মানুষ যারা নিজের যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে জগৎকে নিজের মত করে বোঝবার চেষ্টা করে। ললিতার মায়ের নিজস্ব একটা দার্শনিক দৃষ্টি আছে। ওর ধারণা, মানুষকে মানুষ ঠকায়, তাতে বুদ্ধির খেলা আছে—আদানপ্রদানের বিনিময় যেখানে চলে সেখানে প্রতিপক্ষকে বঞ্চিত করায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভের অধিকার আছে। যেখানে বুদ্ধির খেলাটাই বড় কথা সেখানে পাপ-পুণ্যের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু একটি মানুষের ভালোমানুষীর সুযোগে নিজেদের দিনযাত্রা নিরঙ্কুশ রাখার প্রতিদানে কণামাত্রও প্রত্যর্পণ করার সুযোগ মিলছে না, এটা কম সমস্যার কথা নয়। ললিতার মায়ের শাস্ত্রে বলে, 'এ জীবনে যার ঋণ শুধতে পারলি না, তার ধার শোধ করবার জন্যে আবার তোকে জন্ম নিতে হবে।' অবশ্য পাপ ত জীবনে ও কম করে নি, পুনর্জন্ম না চাইলেও ওকে আবার ফিরে আসতে হবে পাপক্ষয় করবার জন্যে। কিন্তু তাই বলে ডাক্তার দাদাকেও আর এক জন্ম টেনে আনবে এই ধার শোধ নেবার জন্যে? সেটা ঠিক সঙ্গত বলে মনে হয় না ওর। কারণ ও জানে ডাক্তার দাদা মানুষের দেহে দেবতা বিশেষ। তবু, এই বিপদের সময়ে আর কোনো উপায় ছিল না, তাই ললিতার মা এই আপিসপাড়ায় ডাক্তার দাদার আপিসে দেখা করতে এসেছে।

অনেক লোক বসে আছে। পুরুষ এবং মেয়েদের ঘরে এতটুকু বসবার জায়গা নেই। আর থাকলেও ললিতার মায়ের বসতে বাধবাধ ঠেকে—ওইসব ফর্সা ছিম্‌ছাম সাজগোজ করা মেয়েদের পাশে বসতে বুঝি ভরসা হয় না তার। অবশ্য অনেক সময় ওদের ওই নাকমুখ কুঞ্চিত করে তাকানো দেখে জব্দ করবার জন্তেই বাসের সীটে ভদ্রমেয়েদের পাশে বসে ললিতার মা। মনে মনে বলে—'ইস্, না হয় ভাগ্যের দৌলতে চক্‌চকে শাড়ীই পরছ। তা বলে মেয়েছেলে ছাড়া ত আর কিছু নও বাছা! অত কেন।' ওর সেই সব বক্রমুহূর্তগুলি ক্ষেত্রবিশেষে অস্বাভাবিক রকম ভদ্রতায় রূপান্তরিত হয়। প্রভঞ্জনের ডাক্তারখানায় এলে ললিতার মা নিজের হাতে ঘর ক'খানি ঝাঁটপাট দিয়ে গুছিয়ে তোলে, এক কথায় শ্রী ফিরিয়ে দেয়, আর আপন মনেই বলে—'হাজার হোক পুরুষমানুষের কাজ ত ঘরগেরস্থালী নয়, চাকর বেয়ারা যতই করুক না কেন একটু অগোছাল হবেই।' আজও যথারীতি আলমারীর তলা থেকে জঞ্জালের সঙ্গে অনেকগুলি দেশী এবং বিলেতী কোম্পানীর ওষুধের বিজ্ঞাপনের বই বার করে সেগুলি ঝেড়ে মুছে কম্পাউণ্ডারের ঘরে জমা দিয়ে ললিতার মা মিষ্টভাবে বল্‌লে—'দোহাই দাদা, একবারটি অনুমতি করো দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করি।' মুখের কথা শেষ হতে না হতে কম্পাউণ্ডারের অনুমতির অপেক্ষা না করে ললিতার মা ডাক্তারের Consultation-room-এ ঢুকে পড়ল।

ঘরে আর কেউ ছিল না, ডাক্তার সরকার টেলিফোনে কথা বল্‌ছে। ফোনের ধাতবযন্ত্রে ধাক্কা খেয়ে তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর শোনাচ্ছে। ললিতার মা চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল।

—"না, না তুমি সেখানেই দেখা করো। তুমি হচ্ছ ওর অনেক কালের বন্ধু! আমি ত তার চিকিৎসক মাত্র। ...এঁ্যা, কি বল্‌লে? ছাখো পরমেশ, আমি ছেলেমানুষ নই, আর সেও তেমন মেয়ে নয়, তবে অন্য ক্ষেত্রে কি হত তা বল্‌তে পারি না।...তোমার ধৈর্য এবং সহনশীলতাকে শুধু প্রশংসা করতে চাই না। হ্যাঁ, আমি বলি কি, তুমি রোজ রোজ আমার কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে খুশি থাকতে পারো না, তার চেয়ে আগে যেমন

রমিতার বাড়ি যাওয়া আসা করতে তেমনি করো।…এঁ্যা, পরীক্ষা? তোমার ও পরীক্ষা দেওয়াটা একটা খেলার মত অবলম্বন মাত্র, পাশ করতে চাও? Seriously! যদি বলো তবে আমি গিয়ে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারি, অবশ্য তার দরকার নেই! আমি জানি সব।…কি? জানি না বলছ! আমি যদি বলি যে, সাধারণ যে কোন ডাক্তারের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নও তুমি, তাহলে ভুল হবে না। যাক, ওসব কথা, আমায় বলো দেখি—তুমি রমিতার জন্য দূর থেকে এত কৌতূহলী কেন?… এঁ্যা, কি বললে, Because she does not like you. Hallo, Hallo—পরমেশ! পরমেশ—।" রিসিভারটা নামিয়ে রেখে প্রভঞ্জন নিজের মনেই বলে—'কেটে দিল? না, পরমেশ ছেড়ে দিল। অদ্ভুত ছেলে!'

ললিতার মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল প্রভঞ্জন. পরমুহূর্তে স্মিতহাস্য সহকারে বললে—বলো, তোমার আবার কি ফরমাস।

পায়ের ধুলো নিয়ে জিভ্ কেটে প্রৌঢ়া বিপন্নভাবে উত্তর দিল—দোহাই দাদা, এমনিতেই পাপে তলিয়ে আছি, তার ওপর তুমি ওসব বলে অপরাধী কর না।

—বেশ, তাড়াতাড়ি কথা শেষ করো। বাইরে অনেক লোক বসে রয়েছে, এখনো কাউকে দেখিনি।

—দাদা তোমার দয়া জীবনে ভুল্‌তে পারব না, প্রাণ দিয়েও শুধ্‌তে পারব না।

প্রভঞ্জন ধমক দিয়ে উঠল—ওসব পুরনো গৎ বাদ দিয়ে কাজের কথা শেষ করো, তোমার ত সেই মেয়ের প্রসব হবার কথা ছিল না? হ্যাঁ সে কেমন আছে? তার কি হল?

ললিতার মা সংক্ষেপে সমস্ত কথাই বলল।

প্রভঞ্জন বিচলিতভাবে চোখের চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল—সবাই বিধাতা-পুরুষ! তখন বারণ করলাম ওসব কাজে যেয়ো না, পরে ফল ভোগ করতে হবে, তা শুনলে না তোমরা। এখন আমার

কাছে কি জন্যে এসেছ শুনি? গাছগাছড়া শেকড়-বাকর দিয়ে ত মেয়েটার শরীর ঝর্ঝরে করেছ।

—কি করব দাদা, গরীবের আর উপায় কি! বুঝি ত সবই! বত্রিশ নাড়ীর যোগ, তাকে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলতে কারই বা সাধ যায়! তবে কি জানো, পোড়া পেটের জন্যে পরের দোরে মেগে বেড়াচ্ছি এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত, তার ওপর আবার মেয়েটারও সেই হাল করব এই কাঁচা বয়েসে!

প্রভঞ্জন মাটিতে পা ঠুকে বলে—ননসেন্স!

করুণ হাসিতে প্রৌঢ়ার মুখখানা ভরে গেল—দাদা, বিধাতার মার—কথায় বলে, ভগবান সাপ সৃষ্টি করেছেন, তার ফণাও দিয়েছেন, তারপর সে যদি ছোবল মারে তবে সে দোষ কি তার? তেমনি নিয়ম মানুষের বেলাও দাদা! তুমি আমি কি করতে পারি বলো? বয়সের ধর্ম একটা আছে ত!

একথার কোনো সদুত্তর হঠাৎ প্রভঞ্জনও দিতে পারে না। তবু চুপ করে থাকা খারাপ দেখায়, তাই সে বলল—কিন্তু এমন ভাবে নিজেদের সর্বনাশ আর কত করবে শুনি! এখন না হয় ওষুধ দিলাম, তাতে আপাতত কিছুটা ফল ফলল, কিন্তু ললিতার মা তুমি বুঝছ না, মেয়েটা দেহ ত জখম হয়ে গেল চিরকালের মত।

—সব বুঝি দাদা, কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না। আমাদের বাবাঠাকুর-তলার বস্তীতে সাড়ে পাঁচশ মাথা। এইত সেদিনও দেখেছি, একজন আনত দশজন খেত। সে কাল আর নেই এখন, একজনের জায়গায় দশজনই খেটে পয়সা আনছে তবুও পুরোপেট কেউ খেতে পায় না। এ অবস্থায় কি উপায় বলো? ভদ্রঘরের অন্য ব্যবস্থা, আর আমাদের গরীবের সেই শেকড়বাকড় আর দেবতার কাছে মানত করা, ধন্না দেওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই ডাক্তার দাদা!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রভঞ্জন অসহায় ভাবে বলে—এখনও অনেক দেরি! মানুষের মন সুস্থ স্বাভাবিক পথে ফিরতে অনেক দেরি! যে দেশের

পঞ্চাশ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের অভাবের খেসারৎ দিতে হয় বিদেশের কাছে একশ তেত্রিশ কোটি ডলার, সে দেশের মানুষ সহজভাবে বাঁচবে কি করে।

…একথাটা প্রভঞ্জন বলল সম্পূর্ণ স্বগতভাবে। পরমুহূর্তে ললিতার মায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলে—তুমি এতদিন মেয়েটাকে এভাবে ফেলে রেখে খুব অন্যায় করেছ। আমাকে আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল। চলো যাচ্ছি, একবার তাকে দেখা দরকার।

—অনেক দিন আগে তোমাকে বলেছিনু ত দাদা, তা তখন খুব রাগ করেছিলে। আমার ছোটলোকের মরণ, ভাবনু দাদাকে না-আনালেই হ'ল! কিন্তু এখন আর দিশে পাচ্ছিনে, তাই এনুম তোমার চরণাশ্রয়ে। তুমি আর সেখানে যেতে চেয়ো না দাদাবাবু। তাকে শা'নগরে এক জায়গায় রেখেছি। এমনি আমার না হয় ওষুধ কিছু দাও।

—না, না, সে হয় না। তোমার ইচ্ছে মত সব কাজ চলে না। ঠিকানা দিয়ে যাও, আমাকে যেতে হবে।

এর পর আর ললিতার মায়ের কোন আপত্তিই টিকবে না—সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি তার আছে। কিন্তু ওর যে কাজে এখানে আসা সেটাই এখনও বলা হয় নি। একটু ইতস্তত করে মাথা চুলকে বলল—ডাক্তার দাদা, গোটা কতক টাকা যে বড্ড দরকার!

—কত?

—যা হয়—দশ, পনেরো! একটু বেশি পেলে অবিশ্যি ভালো হত।

—হুঁ!

কুড়িটি টাকা আঁচলে বেঁধে পুনরায় প্রভঞ্জনের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে যাবার সময় ললিতার মা বললে—দাদা, তোমার আর সে নরক দর্শনে কাজ নেই। এই বয়েস পর্যন্ত ত অনেক পার করলুম। আর কিছু নয়, নাড়িতে টান পড়েছে, সব টাটিয়ে রয়েছে। সেইটুকু শুকোবার ওষুধ যদি দাও! তুমি দেবতা, তোমার আর ওখেনে গিয়ে কাজ নেই। যদি রাগ না করো তো বলি, আমাদের টোটকাও কিছু মন্দ নয়!

প্রভঞ্জন উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল—হয়েছে, তুমি খুব ডাক্তার! আমি

কিন্তু আজই যে কোনো সময়ে তোমার মেয়েকে দেখতে যাবো। ডাক্তারীটা তোমাদের কাছেই নতুন করে শিখতে হবে দেখ্‌ছি।

এ কথার পর ললিতার মা নিরুপায় হয়ে পুনরায় প্রভঞ্জনের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—অপরাধ নিয়ো না দাদা! মুখ্‌খুর মরণ দশা, কি বল্‌তে কি বলিছি!

প্রভঞ্জনের ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ললিতার মা অসহায়ভাবে ট্রাম-বাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। উঃ, কী শাস্তি! ওই সব সাজগোজ করা "বাবু-বাবু" চেহারা নিয়ে বাছারা কী কষ্টে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে আহা বাছাদের কী কষ্ট! আহা যদি একটা গাড়ির সঙ্গে আর একটার ধাক্কা লাগে? কথাটা মনে হতেই ললিতার মায়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কী অলুক্ষণে কথা, কেন মনে হয়—ছি-ছি! মাথার ওপরে রোদ লাগছে, খুব চড়া রোদ! ললিতার মা নিরুপায় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওই ভিড়ের মধ্যে কোথায় উঠবে ললিতার মা, কেমন করে যাবে! এমন সময় একখানা দোতলা বাস ওর সামনে এসে দাঁড়াল। কণ্ডাকটর তার যান্ত্রিক কণ্ঠে হাঁক্‌লে—আইয়ে মাইজী! কালীঘাট!—বাবু জেরা যানে দিজিয়ে! বাঁয়া তরফ লেডি সীট ছোড়িয়ে!—অদ্ভুত উপায়ে ললিতার মা বাসের মধ্যে প্রবেশ করল এবং আশ্চর্য ভাবে বসবার জায়গা পেল। বসতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল বটে, তার আশপাশে বাবু-ভদ্দর লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে দেখে কেমন একটু লজ্জা লাগে ললিতার মায়ের! উঃ কী ভিড়! ঠিক ওর পাশে বসেছিল একটি অল্পবয়সী মেয়ে, তার বাম বাহুর মধ্য দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগের বন্ধনীটা শাদা কাপড়ের ওপর পারিপাট্য সহকারে লতিয়ে পড়েছে। আড়চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিচার করতে করতে ললিতার মা নিজের ভাগ্যের উপর প্রসন্ন না হয়ে পারে না। সত্যি আমার ললিতার চেহারার দিকে দু'দণ্ড চেয়ে থাকলে চোখ দুটো আরাম পায়। এই ত সব বিবিদের চেহারার ছিরি—এদের পাশে ললিতাকে রাজরাণী মনে হয়।

এই আপাতপ্রসন্নতার পরেই মেয়ের রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখখানি ভেসে উঠল ললিতার মায়ের চোখের সাম্‌নে। মেয়েটা শুকিয়ে একটুকু হয়ে গেছে,

কিছু খেতে পারে না। আর কেমন একটা আঘাত পাওয়া পাখীর মত করুণ দেখায় ওর চোখ দুটি! তবু ললিতার মা নিজের ওপর রাগ করতে পারে না।

বাস থেকে নেমে আদি গঙ্গার ধার দিয়ে ললিতার মা ব্যস্তভাবে মেয়েকে দেখতে চলল। কেওড়াতলার ঘাট ডান হাতে ফেলে একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকের গলি। গলিতে প্রবেশ করবার আগে ও রোজই একবার গঙ্গার ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কাটায়। মাঝিরা রান্না করছে নৌকোর ওপর, ওপারের এক বাড়ির ছাদে কোন বৌ কাপড় মেলছে। শ্মশানের উৎকট পোড়া গন্ধটা এখন আর তেমন বিশ্রী বোধ হয় না। ললিতার মা সংকীর্ণ জলরেখার কোলে অন্যমনস্কভাবে নেমে এল। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ে ডান হাতে করে জল ছিটিয়ে দিল নিজের মাথায়। আপন মনেই বলল—মা, তোর চরণে আশ্রয় দিস মা।

ওর দু'চোখ ভরে উঠল শান্তির স্নিগ্ধ অশ্রুতে।

আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল ললিতার মা, মনটা তার অনেক হাল্কা হয়েছে।

গলির মুখে দেখা হয়ে গেল শ্রীপতির সঙ্গে। শ্রীপতিকে দেখেই তার মায়ের বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মুখভাব যথাসম্ভব সহজ রেখে তার মা প্রশ্ন করে—হ্যাঁরে এখানে কি করছিস।

শ্রীপতিও মায়ের সামনাসামনি পড়ে গিয়ে বেকুবের মত চুপ করেছিল।

আবার তার মা জিজ্ঞাসা করল—এখানে কোথায় এসেছিলি?

শ্রীপতি মাথা উঁচু করে জবাব দিল—দিদির কাছে! বেশ করেছি—তুই আমাকে মিথ্যে বলেছিলি কেন?

অন্য সময় হলে ললিতার মা ছেলেকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট চীৎকার করে এবং যথাসম্ভব প্রহার করে তবে নিরস্ত হত, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে কেন যেন গোলমাল হাঙ্গামা আর ভালো লাগছে না।

মায়ের এবম্বিধ নীরবতায় শ্রীপতির বিস্ময়ের সীমা রইল না। সকল রকম বিপদকে প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই শ্রীপতি বীরত্বসহকারে কে-

সত্য কথাটা মায়ের কাছে ঘোষণা করল, সেটা এত সহজে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় সে একটু ক্ষুণ্ণ হল বই কি। তার মায়ের এ আচরণ শুধু বিস্ময়করই নয়, নৈরাশ্যজনকও বটে।

অতএব শ্রীপতি মায়ের দিকে দ্বিপ্রহরের রোদের মত নিঃসঙ্কোচে তাকিয়ে আরও গোটাকয়েক কথা না বলে পারলে না। সে বললে—তোর মতলবে এতদিন চলে আমাদের কারুর কিছু ভালো হয়নি। দিদিকে তুই মেরে ফেলবার মতলব করেছিস—আর আমাকে ত বিড়িওয়ালা বানিয়ে তুলেছিস।

ললিতার মা শান্ত কণ্ঠে বলে—মাঝ পথে দাঁড়িয়ে অমন 'লেকচার' ঝাড়চিস কেন?

ললিতার মায়ের কণ্ঠস্বর শান্ত বটে কিন্তু দৃষ্টি প্রখর, তার সন্দেহ হচ্ছে শ্রীপতি সকাল বেলাতেই 'নেশাটেশা' করেছে।

শ্রীপতি মায়ের কথা কানে তুলবে না মনে মনে সংকল্প করেছে। তার ইচ্ছে ছিল দিদির সঙ্গে গোপনে পরামর্শ ক'রে অতিসত্বর নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা চরম নিষ্পত্তি করা—কিন্তু ললিতার শারীরিক দুর্বলতার জন্যই একটু অসুবিধা হচ্ছে।

ললিতার মা বলল—আজকাল বুঝি রোজগারপাতি ছেড়ে দিয়ে এই সব হচ্ছে? বলি, ডানহাত মুখে তুলতে হয় রোজ তিন বেলা, তা মনে আছে ত? অত মেজাজ কাকে দেখাচ্ছিস! হুঁঃ, আমি বলি ভালো—কিন্তু এ হচ্ছে সেই, তেঁতুলের হাড় টক, মাস টক, পাতা টক, হাওয়াটাও টক! তোমরা হচ্ছ বাছা সেই টকের ঝাড়; নিজের হাড়মাস কালি করে তোদের মানুষ করেছি এখন আমি চোর। তা, চোর ত চোর বাবা, এখন এ নিয়ে আর ত্রিভুবন জজিয়ে বেড়াস না, চুপ করে থাক, ঘরের কথা বাইরে বার করিস না!

—কেন? আমাকে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে চলো যেমন, তেমনি এখন আমি রটিয়ে দিই।

তারপর নিজের বাহাদুরীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীপতি বলে—না, সে সব কিছু না! নফরদাদার কাছে সব খবর পেয়ে একদিন তার সঙ্গেই ত—

—এঁ্যা, নফরও এসব জানে নাকি? সর্বনাশ—! আতঙ্কে হতাশায় ললিতার মায়ের হাত-পা শিথিল হয়ে এল।

শ্রীপতি মায়ের হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে বলে—নফরদা ত এখানে প্রায়ই আসে। চল্‌ মা, দিদির ওখানে গিয়ে সব কথা হবে। একটা পরামর্শ আছে।

ললিতার মায়ের যে সখী তাঁর সহায়তা করেছে, তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছে আজ। সখীর এই বিষণ্ণতার হেতু ললিতার মায়ের অবিদিত নয়। সে শ্রীপতিকে বল্‌ল—ঘরে গিয়ে বস্‌, আমি সইকে ছুটো কথা বলে যাচ্ছি।

সখীর হাতে দশ টাকার একখানি নোট গুঁজে দিতে সে যেন একটু খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু অবশিষ্ট নোটখানার দিকে দৃষ্টি পড়তে তার চোখ ছুটো পুনরায় বক্র হয়ে মুখের হাসিও মিলিয়ে গেল।

ললিতার মা সখীকে আজ নতুন দেখ্‌ছে না। সে আপন মনেই বলে—ইচ্ছে ত ছিল ফটিক্‌জল সবটাই তোমাকে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই, কিন্তু ও বেলা যদি ডাক্তার আসে, তার পেছনে আবার এক কাঁড়ি খরচা।

পরুষ কণ্ঠে জবাব এল—কেন আবার মরতে ডাক্তার কেন? কবরেজ-বদ্দি বুঝি সব মরে উজোড় হয়েছে। তোমাদের আবার সব হালফ্যাসানের চাল দেখে গা কেমন করে। তা ভাই ডাক্তার ম্যাজিষ্টার বড়মানুষী যা করবে করো, আমার মত গরীবের দিকে একটু নজর রেখো। তুমি বলে তাই ফটিক্‌জল, নইলে আমি ত নগদ ছাড়া এক-পা চলি না জানো। আর ভাই, আমার কি সাধ যায় না তোমার মেয়ের জন্তে কিছু করতে? কিন্তু ভগবান মেরে রেখেছেন। তেমন তেমন বয়সে মেয়েমানুষে সব রকমেই রোজগার করে, আমার ত জানো সবই, সেই যে তিনি সগ্‌গে গেলেন আমার সুখও গেল সেই সঙ্গে। পরপুরুষের দিকে মুখ তুলে তাকাই নি—কোনো ড্যাক্‌রাকে ছায়া মাড়াতে দিই নি। পরকালের হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় মিলিয়ে দিতে পারব, হ্যাঁ তা খুব পারব।

তারপর স্বর্গতঃ পতিদেবতার উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করে চোখের জল মুছে সখী বল্‌ল—এখন তুমিই বলো ফটিকজল, ব্যবসা করিনি,

অধর্ম করি নি, পয়সাটা হবে কেমন করে; এই যা দু' পাঁচজন আসে যায়, ঘরভাড়া বলে হাত তুলে দেয়, তাই গোবিন্দের চরণ ছুঁইয়ে পোড়া পেটে দিই! তা ভাই আজকালের মধ্যে তুমি বাকীটা শোধ করে দিও, নইলে এশন তুলতে পারব না।

দীর্ঘনিশ্বাস এবং হাসি গোপন করে ললিতার মা মেয়ের কাছে এসে বস্‌ল। পরমুহূর্তে শ্রীপতি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বল্‌ল—শোন মা, আগে থেকে বলে দিচ্ছি তুমি আপত্তি করো না। আর আপত্তি করলেও আমাদের যা করবার তাই করব।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ললিতার মা ছেলের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে।

শ্রীপতি একটা বিড়ি ধরিয়ে বল্‌ল—এই ত্যাখো। দিদির শরীরটা একটু সারলে, দিদিকে ফিলিমের প্লেতে নামিয়ে দেবো।

—সে আবার কি রে?

—সিনেমা জানো তো? ওই যে টকি গো!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব জানি, ছবিতে হাত-পা নেড়ে কথা বলে গান করে। সেই যে চণ্ডীদাস হয়েছিল—একটা ধোপানীর সঙ্গে পূজোরীর ইয়ে। তারপর কেষ্টসুদামা হয়েছিল, আর খুব নাচগান ফূর্তির ছবি কি রে—লায়লা মজনু! আমাকে আর সিনেমা শেখাতে হবে না—তুই ত দেড়দিনের বোষ্টম রে বাপু! হ্যাঁ সিনেমাতে কি হল!

—জানো আমি আজকাল বিড়ি বাঁধা ছেড়ে দিয়েছি। ওসব ছোটলোকের কাজ। টালিগঞ্জের সব বড় বড় বাড়িতে সেইসব ছবি ওঠে—সেখানে গেলেই কাজ—আর কাজ মানেই নগদ পাঁচটাকা। মনে কর আমাকে যা বল্‌তে শিখিয়ে দিল তাই বলেছিলাম, কিম্বা একদল লোক যাচ্ছে তাদের সঙ্গে চীৎকার করতে করতে চল্‌তে হবে চল্লাম—ব্যস্‌, পাচ টাকা! এর মধ্যে চার পাঁচ দিন সেই কাজ করেছি মা।

ললিতার মা সন্দিগ্ধভাবে বলে—সত্যি নাকি রে! তা সেসব টাকা কি হল?

শ্রীপতি সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল—মানে প্রথম প্রথম দালালগুলোকে ঘুষ দিতে হয়। নইলে কাজের মধ্যে ঢুকতেই দেয় না। দালালী দেয়

শালারা তিন টাকা। আর ছ'টাকার মধ্যে এদিক-ওদিক বাদ দিয়ে যা ছিল তোমাকে দিয়েছি। তুমি জানোনা মা, প্রথমে তিন টাকা, তারপর ছটাকা দালালী—শেষে ভেতরের লোকের সঙ্গে জমিয়ে নিলে সবটাই আমার—দালাল শালাকে কলা দেখাতে দেরি নেই আর। এর মধ্যেই ভেতরের মাতব্বর মনিববাবুর কাছে দিদির কথা বলেছি। তিনি বলেছেন একদিন দিদিকে নিয়ে যাবার কথা। উঃ, সিনেমায় নামলে কি খাতির, আর কী নাম! যেমন পয়সা তেমনি মজা। আমি যখন এদিকে মাথা দিয়েছি মা, তখন তুমি আর ভেবো না—দিদির সেই রকম রম্‌লির মত গাড়ি হবে বাড়ি হবে—আর হাকিম দারোগারা সব খাতির যা করবে!

ললিতার মা ছেলের কথায় যেন আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় ধরতে পেরেছে এমনই খুশি হয়ে উঠল। সত্যি!…কিন্তু পরক্ষণে মেয়ের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। শ্রীপতির চোখে মুখে যে আশার স্বপ্ন ফুটেছে সেটা যে কত অবাস্তব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে ললিতার মা।

শ্রীপতি থামতেই চায় না, মাকে যে এত সহজে বিশ্বাস করানো যাবে না তা সে জানে, তাই প্রলুব্ধ করবার জন্যে বলে চল্‌ল—জানো, শহরময় দিদির ছবি সেঁটে দেবে, দেওয়ালের গায়ে। এই ত যাক না আর ক'টা দিন, আমি যে ছবিতে নেমেছি সেখানা দেখতেই পাবে। আর দিদির ত চেহারা আছে, বড় বড় ছবি দেবে—এই যে রম্‌লির ছবি কত দেখতে চাও।

—ওরকম রম্‌লি রম্‌লি করছিস, তুই তাকে চিনিস বুঝি? সে কোন্ বস্তীর মেয়ে? ললিতার মা ছেলেকে পরখ করবার জন্য জিজ্ঞাসা করে, সত্যিই কি কোন বস্তীর মেয়ের ভাগ্যে এত সুখ হওয়া কি সম্ভব?

শ্রীপতি টে বল্‌ল—অবিশ্যি রম্‌লি তার নাম নয়—নাম হচ্ছে রমিতা দেবী। আর সে খুব উঁচু ঘরের মেয়ে! আমি তাকে একবার দেখেচি!

—কি বল্‌লি, রমিতা! সে আবার কেমনতরো নাম রে! এম্‌নি সব আজকাল হয়েছে নামের ছিরি। ডাক্তার দাদার এক রুগী আছে তার নামও এই—খুব সোন্দর দেখতে মেয়েটা। ডাক্তার দাদার সঙ্গে খুব ইয়েও!

বিজ্ঞ ভাবে ঘাড় নেড়ে শ্রীপতি বল্লে—কত দাদার সঙ্গে যে, ওঁর হয়ে তার ঠিক আছে? সারা শহর মাতিয়ে রেখেছেন উনি। আরে এই ত ভাখো উপায় হয়ে গেল।

তারপর ললিতার হাত দু'খানা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে শ্রীপতি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—দিদি, যাব্ দিয়া, রমিতা দেবীর কাছে একবার ওই ডাক্তার দাদার 'থুরু'তে গেলে তোর আখের জমাট! উঃ, কী কাণ্ড হবে ... ভাবতে পারিস।

তার মা ধমক দিয়ে উঠ্‌ল—থাম পাগল ছেলে।

মায়ের ওষ্ঠপ্রান্তে কিন্তু হাসি আর বাধা মানে না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নফরচন্দ্র এল শা'নগরের বাসায়। বাড়িওয়ালীর মুখে সারাদিনের কাহিনী শুনে সে একটু চিন্তান্বিত ভাবে বল্‌ল—ডাক্তারে কি বল্‌লে?

—আমি ত অতশত জানিনে, তোমার ইস্তিরি জানেন বাপু!

ঘরে ঢুকে প্রদীপটা উস্কে দিয়ে নফর ললিতার শিয়রে গিয়ে বসল।

নফরকে ললিতা প্রশ্ন করে, ক্ষীণ ওর কণ্ঠস্বর—কি এক ক্লান্তিকর দুশ্চিন্তায় ও যেন জর্জর: ও বল্‌ল—এত দেরী করলে যে?

নফর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে—না ত! ঠিক সময়েই এসেছি। ছোট দিনের বেলা কি না, তাই এমন রাত রাত মনে হচ্ছে। হ্যাঁ গো ডাক্তার এসেছিল?

ললিতা আস্তে আস্তে উঠে বসল। নফর একটু বিপন্নভাবেই বাধা দিতে চেষ্টা করে—আবার নড়াচড়া করছ কেন, বেশ ত শুয়েছিলে!

—আর শুয়ে থাকতে পারছি না। এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো।

—বাবা! তোমার মাকে বড্ড ভয় করে যে! নইলে আজ তোমার এ অবস্থা হত না। আর তুমিও পারো না আমার ওপর ষোলআনা ভরসা করতে—কবেই ত বলেছিলাম, চলো পালাই!

ললিতা হেসে উঠ্‌ল। হাসলে আজও ওর ওই পাণ্ডুর মুখে আশ্চর্য একটা মাধুর্য ফুটে ওঠে। কিন্তু ও দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই হাসির প্রান্তে

একটা অবসাদ লেগে থাকে। ললিতা বল্লে—বিয়ে-করা বৌকে নিয়ে পালানো! ব্যাপারটা নতুন বটে!

—তোমার ত ওই এক কথা!

ললিতা ব্যাকুল ভাবে স্বামীর একটি হাত নিজের মুঠোয় ধরে বল্ল—না, আর হাসি নয়। তুমি আমাকে আজই নিয়ে চলো। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

নফর অবাক হয়ে গেল। দীর্ঘকাল ধরে সহস্রবার অনুরোধ অনুনয় করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতেই সে অভ্যস্ত হঠাৎ এ কী হ'ল,- ললিতা নিজে হতে সেই প্রস্তাব করছে কেন। একটা কৌতূহল হয়, কিন্তু সে কৌতূহলের চেয়ে আশার সার্থকতার আনন্দে নফরের সরল মন ভরে উঠল।

ললিতা পুনরায় বল্লে—কি, চুপ করে আছ যে!

—নিয়ে যেতে ত কোনো আপত্তি হচ্ছে না! কিন্তু বাড়িউলি যে তোমার মায়ের ফটিক্ জল!

—সে ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি সারাদিন ধ'রে ডাইনীকে বুঝিয়েছি। তা ও এক রকম নিমরাজি, আসলে ও হচ্চে অর্থপিশাচ, তা ছাড়া,—না থাক।

—কি বলোই না!

—সে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুধু ওকে একটু ভাল করে বলো! কিছু টাকা ধরে দিলেই রাজি হবে ডাইনি।

যে কথাটা নফরের কাছে বল্‌তে গিয়েও ললিতা শেষ পর্যন্ত গোপন করল সেটা আর কিছুই নয়—আজ সকালে ওর মা এবং ভাইয়ের সিনেমা প্রসঙ্গ। শ্রীপতি অবশ্য কদিনই 'ফিলিম-ফিলিম' করে দিদিকে অনেক কথা বলছে। কিন্তু আজ যখন বিশদভাবে আলোচনাটা হল তখন ললিতার মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। কি জানি কেন, একটা অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করছে ললিতা ওই দিকে—ওই দিগন্তের রূপোলী মায়া যেন ওকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভীতিও সেই সঙ্গে ওকে পেয়ে বসেছে। অনেক ভেবেচিন্তে ললিতার মন বলল—শ্রীপতি আর

মায়ের কাছ থেকে দূরে না পালালে ও আর বাঁচতে পারবে না। ওর জীবনে কোনো আশার ফানুষ মনের আকাশে উড়ে বেড়ায় না। ও চায় শান্ত নিবিড় গৃহকোণ, নিজস্ব নীড়-রচনা! ওর নিজস্ব ছোট পৃথিবীটা মায়া দিয়ে ঘিরে রাখবার সাধ ওর অসহায় সত্তায় লতায়িত হয়ে উঠেছে কৈশোর থেকে, অথচ প্রতিপদে ভাঙনের ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ওর মায়ের বিপরীত গতির ধারামুখে।

নফর উৎসাহিত হয়ে উঠল—বেশ, কবে যাবে বলো!

—কবেটবে নয়, আজ।

—আজই? কিন্তু আমার সঙ্গে ত টাকা নেই, বুড়িকে কি দিই!

—আমার কানের ফুল দুটো ওকে দিয়ে যাবো, আর বল্‌বো পরে টাকা দিয়ে ওটা ফেরৎ নেবো!

—কিন্তু এখনই নড়াচড়া ঠিক হবে কি? আজ সবে ডাক্তারে দেখে গেল।

—তুমি থামো তো দেখি! আমার সব অসুখ সেরে যাবে তোমার কাছে থাকতে পেলেই।

বাড়িওয়ালী ললিতার যাওয়ার কথা বল্‌তেই দন্তবিহীন মুখে অদ্ভুত হাসি হেসে বললে—আমিও ত তাই বলি। তোমার ইস্ত্রী পরিবার তুমি নিয়ে যাবে—তাতে আর আমার বলার কি আছে। তবে হ্যাঁ, একটু সাবধানে রেখো। ইস্ত্রি হচ্ছে মাথার মণি, একটু সেবাযত্ন করো! আর নলিতের মতন বৌ পেয়েছ এ যে কতবড় ভাগ্যি! আমি ত অবাক, গোবরে পদ্মফুল একেই বলে, ওই মায়ের এই ছা কি করে হলো তাই ভাবি।...তা তুমি নিয়ে যাও সে ই ভালো—কথায় বলে, বৌকে কাছছাড়া করলে আর তার মর্যাদা থাকে না। একটা কথা বলি শোনো সে নফরবাবু—আর যেন এমন বেমক্কা কিছু না হয়। মা ষষ্ঠীকে নমস্কার ক'রে বলো, আর যেন তিনি আশীর্ব্বাদ না করেন। ইস্, মেয়েটার কি হালই হয়েছে!

সে কথার জবাব না দিয়ে নফরচন্দ্র বল্‌লে—আপনি এখনকার মত এই কানের ফুল দুটো রাখুন, পরে টাকা দিয়ে ওটা ফেরত নেবো।

ঈশ্বরের উদ্দেশে হাত তুলে, প্রণাম করে বৃদ্ধা বল্‌লে—আমরা মানুষ

চিনতে চিনতে বুড়ো হয়ে গেলাম বাছা! তুমি যখন মুখ ফুটে বলেছো পঞ্চাশ টাকা দেবে, তখন কি আর মার যাবে সে টাকা? আর এই ফুল দুটোর কতই বা দাম! হুঁ! তা যখন নেহাতই রাখতে চাও, রেখে যাও! আর হ্যাঁ তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যেয়ো! বুঝলে।

পরক্ষণে ললিতার মায়ের কথা মনে পড়তেই হেসে উঠল বুড়ি। আপন মনেই বলতে লাগল—কাল এসে ফটিকজল আমার নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়বে। আমিও ত সোজা বান্দা নই—ছ্যাচ্ছেড়িয়ে দেবো বেশ করে শুনিয়ে। অত কিসের! মেয়ের বিয়ে দিয়েছিস তাকে ঘর কন্না করতে দে। তা নয়! কী সব মতলব! বুড়ো হয়ে তিনকাল গিয়ে এককালের সুতোয় ঝুলছিস, কবে বলতে কবে টুক ক'রে খসে পড়বি এখনও রোগ গেল না! তোর দরকার কি, খোদার ওপর খোদকারীর! বিধেতার হাতে মানুষের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে মায়ের নাম করো, পরকালের কাজ করো। পাশের লোক কি করছে না করছে, আমি যেমন সে দিকে চোখ বুজে থাকি, তেমনি চোখ বুজে পারের কথা চিন্তে কর—তা নয়!

অল্পক্ষণের মধ্যেই ললিতাকে নিয়ে নফরচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করল। যাবার সময় ললিতা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বৃদ্ধা তার চিবুক স্পর্শ করে বলল— অনন্তেবতী থাকো মা! সোয়ামীর বাড়-বাড়ন্ত হোক। আর কি বলব, আগেকার কালে তেমন গোলাভরা ধান থাকলে বলতাম, বছর বছর ছেলে হোক: এখন সে কথা মনেও ঠাঁই দিতে ভরসা হয় না। নিজের ত কোনদিন খুঁটে খেতে একটিও হয় নি তাই দুনিয়ার লোকের সৌভাগ্য সইতে পারি নে বলে এইসব কুকাজে আমল দিই। তবে ভগমানের কাছে মনে মনে বলি, যেন আমার দোরে আর না আসতে হয় তোমাকে। আচ্ছা মা রাত হয়ে যাচ্ছে, এখন তাহ'লে এস! কাল তোমার মা আমার কপালে পিণ্ডি দেবে, তা দিক গে। তোমরা ত সুখে ঘর করো।

শূন্য বাড়িখানা বৃদ্ধার কাছে একান্ত অভ্যস্ত। আর কেউ যদি না থাকে তবে সে নিজের মনেই কল্পিত দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে কথা কয়। কাজেই নির্জনতায় তার কোনো অসুবিধে হয় না। ললিতারা চলে যাবার পরও সে

বার কয়েক আপন মনে বলল—তা এতে আমার আপত্তিই বা থাকবে কেন? সোয়ামী-ইস্ত্রীর মাঝখানে বেড়া তুলে দেওয়া মহাপাপ। বেশ করেছি।···আহা, সুখে থাক। সধবা থাকতে থাকতে ড্যাং-ডেঙিয়ে চলে যাক যমের বাড়ি! বেশ মেয়ে।···আচ্ছা, কানের ফুলটার কত ওজন? সোনার ত? আ মরণ আমার, বুড়ো বয়েসে ছোঁড়ার মুখের মিষ্টি কথায় শেষকালে ঠকলাম না ত?

আলোর সামনে অলঙ্কারটা এনে পরখ করতে বসল বুড়ি।

অপরাহ্ণের লম্বিত ছায়া দূরের পথকে অপূর্ব্ব মায়ালোকে রূপান্তরিত করেছে—সেই দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রমিতা। ওর শরীর আজ অনেকটা সুস্থ। ইচ্ছে করছে মাঠের দিকে একটু বেরুবার, কিন্তু ঠিক একা-একা যাবার মত উৎসাহ নেই। তাই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে অস্তাকাশের লালরঙের দিকে!···ওই দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায়, একদা পাহাড়ী বনের ওপারে রক্তিম সূর্যাস্ত দেখেছিল ও! কি যেন নাম—বুরুডিপাস্! কবে কারা পাথরের বুকে ডিনামাইটের বজ্রাঘাতে ধ্বসিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের অংশ, সে ব্যথা আজও বুঝি ভুলতে পারেনি প্রকৃতি। ঠিক সেই আহত দেহের ওপর পশ্চিম দিগন্তে নিম্নতর শৃঙ্গের মাথা ডিঙিয়ে যে ক্লান্ত রোদ এসে পড়েছিল তারও রং লাল। সে যে ঠিক কেমন লাল তা বলে বোঝানো যায় না। নীচের দিকে যে নদীর শীর্ণ ধারা দেখা যায়—অনেক নীচে সেই নদী বয়ে যাচ্ছে, তার বুকে পাহাড়ের ছায়া ঢলে পড়েছে। সেখানে যে সন্ধ্যা নেমেছে, তার গভীর রহস্য কালো জলের বুকে লুকানো আছে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শুধু তার কাজল রংটুকু মাত্র দেখতে পেয়েছিল রমিতা। সেদিনের সেই উচ্ছলা রমিতাকে বিস্মিত, স্তব্ধ করেছিল সেই আশ্চর্য পাহাড়ী কন্যা মেরী। মেরীকে দেখলে বৈশাখের কৃষ্ণচূড়া গাছের কথাই মনে পড়ে। মেরী! তাকে রমিতা ভুলতে পারে নি আজও। বাসাডেরা গ্রামের সাঁওতালী শিল্পী মেরীকে শহরের বদ্ধ হাওয়ায় এনে অনুকূল শুকিয়ে মারল। আজ যদি একবার

মেরীর দেখা পেত রমিতা তাহলে জেনে নিত কি যাদু জানত মেরী। যে যাদুমন্ত্রে জীবনের তীব্র তৃষ্ণার্ত মুহূর্তগুলি স্বপ্নের মায়াজাল বুনে কাটিয়ে দিতে পেরেছিল, যে যাদুর স্পর্শে অনুকূলের তরল মনেও গভীর রেখাপাত করে যেতে পেরেছে, সেই কুহকমন্ত্রটি রমিতাকে কি মেরী শিখিয়ে দিতে পারে না! অপরাহ্নের দীর্ঘ ছায়ায় রমিতা দেখতে পেয়েছে—শুধুই একটা মনগড়া প্রতিশোধের ফানুষ ফুলিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখা যায় না আর। ফাঁকা ঘরখানার অসীম শূন্যতাকে দূর করবার জন্য পূর্ণতর কিছু পাওয়া ওকে পেতেই হবে।...

টেলিফোন বেজে উঠল। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে রমিতা গিয়ে প্রশ্ন করল—হ্যাঁ, বলুন!

—হ্যালো! পি. কে...নম্বর?

—না! আপনার ভুল হয়েছে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে রমিতা জানালার কাছে ফিরে এল।

আবার ঠিক মিনিট দুই পরে 'ক্রি-রি-রি-রিং' বাজল ফোনটা। সেই কণ্ঠস্বর! রমিতার কণ্ঠে আজ বিরক্তি নেই, আছে ক্লান্তি! ও বললে—আপনার আবার ভুল হয়েছে।

অপর পার থেকে জবাব এল—আমার ভুল নয়। আমি ত ঠিকই চাইছি, দেখুন দেখি অন্তের ভুলের জন্যে আপনাকে মিছেমিছি কষ্ট দিচ্ছি। Kindly ছেড়ে দিন, আবার চেষ্টা করে দেখি!

রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে রমিতা শুনতে পেল, অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর। স্বগতভাবেই লোকটি বলছে—এরা সব করে কি? আধ ঘণ্টা ধরে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে যদি বা কানেক্সন পেলাম—তাও কোথা থেকে এক মেয়েকে জুটিয়ে দিল!

ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ফুটে উঠল রমিতার।...ভুল আমার নয়, আমি ত ঠিকই চাইছি।...এমনি কত ভুলই হয় ত ভুল নয়—শুধু যোগসূত্রের ভুলে পরিণতি পরিবর্তিত হয়। মিহিরের কথা মনে পড়ল। সেখানেও কি এমনি কোনো যোগসূত্রের ভুল ছিল? মিহিরের কথাটা ভুলতে চেষ্টা করে রমিতা।

মনের মধ্যে এঁকে তুলল প্রভঞ্জনের গম্ভীর মূর্তি। অনেক চেষ্টা করেও সেদিনের লজ্জায় দেখা প্রভঞ্জনের নমনীয় ছবিটা মনে আনতে পারল না রমিতা। প্রভঞ্জনের সেই দুর্লভ কস্তুরীসৌরভময় কান্তমূর্তিটা যেন স্বপ্নের মায়ার মত মুছে গেছে, কেবল রমনীয় স্মৃতিটুকুই রয়েছে।

পোস্ট আপিসের পোশাক পরা একটি লোক সাইকেল থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, রমিতার দিকে দৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও যেন সে ওকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পাচ্ছে না। অবশেষে সঙ্কোচ কাটিয়ে লোকটি জিগ্যেস করল—দেখুন!

হিন্দুস্তানী পিওন, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, কিন্তু বাংলা কথা বেশ ভালোই বলছে—এক্সপ্রেস চিঠি আছে।

—কি নাম?

রমিতারই চিঠি। একটা কাজ পেয়ে রমিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

খামখানা ছিঁড়ে চিঠি বার করতে করতে রমিতা যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠ্ছে তখন ব্যস্তভাবে পরিবর্তন নীচে নামছিল। মেয়েকে দেখে বল্ল—তুমি বড় অবাধ্য হয়ে উঠছ সান্ত! ডাক্তারে বার বার নিষেধ করেছে তবু দৌড়-ঝাঁপ করা কিছুতেই ছাড়বে না তুমি?

একটু হেসে রমিতা বল্লে—এটুকুতে কিচ্ছু হবে না বাবা! শেষে আমার জন্যে ভেবে ভেবে ব্লাডপ্রেসার ধরিয়ে বসবে দেখচি।

—আমাদের লোহার শরীর, রোজ গঙ্গাস্নান করলেও সর্দিটুকু পর্যন্ত হয় না ওইসব পাঁচ রকম বলে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করিস না রে—!

রমিতা আর কোনো কথা না ব'লে, সোজা ঘরে গিয়ে বসল

অনুকূল চিঠি লিখেছে। সুন্দর হাতের লেখা অনুকূলের।

'দিদি! তুমি আমার জন্যে কোনো চিন্তা করো না। সেদিন নিরুপায় হয়েই পালিয়ে এসেছি, তার জন্যে হয়ত আরও চটে গেছো তুমি। যাক সেসব কথা! আমি এখন বেশ আরামে আছি—ধানবাদের কাছাকাছি একটা কয়লার খাদের কাছে, সুন্দর জায়গা এটা। এখানকার কয়লার খাদে বিস্তর সাঁওতাল কুলী-কামীন কাজ করে। কামীন বলে মেয়ে-কুলীদের জানো।

এখনও এদের স্বাস্থ্য সুন্দর। ভয় নেই—স্বাস্থ্যের লোভে এখানে আসি নি। রীতিমত পয়লা উপায়ের ফন্দী নিয়ে বেরিয়েছি। গতকাল সেই উপার্জিত অর্থ থেকে পঁচাত্তর টাকা তোমায় পাঠিয়েছি—কালই হয়ত পাবে সে টাকা।

'আমার এই নতুন জীবনের কথা শুন্‌লে অনেকেরই হিংসে হতে পারে। জলহাওয়া ভালো। খাদের সাম্‌নে চটের ওপর লতাপাতা আঁকা তিনখানা পর্দা ঝুলিয়ে কুলীদের ছবি তোলা হচ্ছে। আমার দোকানের নাম দিয়েছি 'দি গ্র্যাণ্ড মেরী ষ্টুডিও', একজনের ছবি পাঁচ সিকে, দু'জনের ছবি একত্রে দুটাকা। সকালে ফটো তুলে গেলে বিকেল বেলা ছবি সরবরাহ করা হয়।

'বল্‌লে বিশ্বাস করবে না, বিনামূল্যে অনেক মেয়ের ফটো তুলে দিয়েছি, এবং তারা অন্যভাবে দাম মিটিয়ে দিতে চেয়েছে, তবু নিইনি। আমার সততা দেখে আর কেউ অবাক হোক-না-হোক আমি নিজে হচ্ছি।

'বেশ লাগছে এ জায়গাটা।

'তুমি মনে কর না যে, লোক ঠকানো ব্যবসা করছি। ওরা যে পয়সা দিয়ে মহুয়ার মদ কিম্বা পচাই খেতো সেই পয়সার খানিকটা এদিকে খরচ করছে। অনেক কেরাণীর চেয়ে আজকাল এদের অবস্থা ভালো হয়েছে। যেমন খাটতে পারে, তেমনি পয়সা হাতে পড়লে উড়িয়ে দিতেও এরা হর্ষবর্ধন।

'ম্যানেজার, ঠিকাদার, ডাক্তার, সর্দার সকলের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠেছে। ওরা সবাই আমাকে এখানে থাকতে বলছে। তাই মনে করছি শীগ্‌গিরই এখানকার শেকড় কাট্‌বো। পথে ঘাটে আত্মীয় পাতিয়ে পথকে ছোট করবার দুর্বুদ্ধি আর নেই। ইচ্ছে আছে বছর খানেকের মধ্যে তোমার কাছে টাকাটা পাঠিয়ে দেবো। তোমার ছবি বিক্রী করে যা পেয়েছিলাম—মানে যে টাকা দিয়ে মেরীর শেষ অবস্থায় চিকিৎসা করাতে পেরেছিলাম সেই টাকা। তুমি কিছু মনে করো না, মেরীর চিকিৎসার ঋণ রাখতে পারব না—সেই দুঃসময়ে তোমার অজ্ঞাতে তোমার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছিলাম তার পূর্ণ মূল্য দিতে পারি এমন সাধ্যি আমার নেই, তবে ভারবাণীর কাছ থেকে যে টাকাটা পেয়েছিলাম সেটা অন্ততঃ শোধ করবই। ভয় নেই, এর

প্রতিটি কপর্দক আমি ফটো বিক্রী ক'রে রোজগার করব। কোলিয়ারী আর কারখানার লোকেরা ছবির কদর বুঝতে শিখছে। এখন কিছুদিন এই অঞ্চলেই থাকব। প্রতি সপ্তাহেই কিছু কিছু টাকা পাঠাবো। বসন্ত কালে যাবো জামসেদপুর, সেখান থেকে ঘাটশীলা—আর একবার বাসাডেরা যেতে হবে। টাকাটা তুমি নিতে আপত্তি ক'র না। কৃতজ্ঞ হবার এটুকু সুযোগ মেরীর সম্মানে আমাকে দিও, মিনতি করে বল্‌ছি।'

নিবিষ্ট মনে রমিতা চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়ল।

অনুকূল চলে গেল সব ছেড়ে! অনুকূলের এই মানসিক পরিবর্তনের মূলে কী আছে! মেরীর নীরবতার প্রভাব ছাড়া আর একে কিছু বল্‌তে পারে না রমিতা! দি গ্র্যাণ্ড মেরী স্টুডিওতে অনুকূল সাঁওতাল কুলীদের ছবি তুলতে চটের উপর রং-করা পর্দ্দা ঝুলিয়ে দোকান খুলে বসেছে। রমিতা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রতি পদে যে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, সেই অনুকূল শুধু স্মৃতিকে এমন ভাবে সম্বল করতে পারে বলে মনে হয় না। হয়ত এ তার শ্মশানবৈরাগ্য। পরক্ষণে রমিতা নিজের সন্দিগ্ধতায় অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। অহেতুক মানুষের সততাকে ছোট করতে চাওয়া ত নিজের মনেরই সঙ্কীর্ণতা। কে জানে মেরীর যাদুমন্ত্র অন্তরীক্ষ থেকে অনুকূলের ভাগ্যকে আপন পথে পরিচালিত করছে কিনা।

চিঠিখানা টেবিলের ওপর রেখে রমিতা জানালার ধারে এসে দাঁড়াতেই পিছন থেকে ঝি খবর দিল—ডাক্তারবাবু এসেছেন।

বিস্মিতভাবে রমিতা প্রশ্ন করে—কখন এলেন? আমি ত এখানেই আছি। বলতে বলতে রমিতা লঘু ক্ষিপ্র গতিতে পাশের ঘরে গেল।

রমিতাকে দেখে প্রভঞ্জন চুরুটটা নেভাতে চেষ্টা করে।

রমিতা বলল—ওটা আবার কি হচ্ছে? না, আপনি চুরুট নিভিয়ে ফেললে ভালো হবে না কিন্তু।

প্রভঞ্জন ভারী গলায় কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল—মিছেমিছি আর কাউকে কষ্ট দিয়ে ধোঁয়া গিল্‌তে আরও কষ্ট হয়। সত্যি বল্‌ছি আপনার অনুরোধে চুরুট খেতে গেলে অস্বস্তি হবে।

—এতক্ষণ আসা হয়েছে অথচ খবর পাই নি কেন ?

—আমি ত ক্রেপ্স-এর ভারী জুতো পরেই এসেছি। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আর কারও ঘরে ঢুকে পড়া আমার অভ্যেস নয়।

—যেন আমারই স্বভাব পরের ঘরে চুপি চুপি হানা দেওয়া!

—তা জানি না। তবে অনেক প্রার্থীর আবেদন নিবেদন নিজের অবসরমত দেখেন এটা ত ঠিক।

—অর্থাৎ ?

রমিতা প্রভঞ্জনের দেশলাই থেকে একটা কাঠি বার করে জ্বালিয়ে সেই কাঠিটার দিকে তাকিয়েই একথা বলল। প্রভঞ্জনের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির স্পর্শ অনুভব করছে রমিতা, কিন্তু প্রভঞ্জনের মুখের দিকে সরাসরি চাইতে পারছে না। কাঠিটা পুড়তে পুড়তে রমিতার আঙুলের ডগায় আগুনের ঈষৎ উত্তাপ লাগে, ক্রমশঃ শিখাটা ওর নখের কাছে এসে জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে শেষে নিভে গেল। ইচ্ছে করে হাত পোড়ানোর জ্বালাটা মন্দ লাগ্‌ছে না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি! প্রভঞ্জন আঙুলের আঘাত দিয়ে পোড়া কাঠিটা রমিতার হাত থেকে ফেলে দিল।

এবারে প্রভঞ্জনের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রমিতা হেসে উঠ্‌ল—উঃ আপনার আঙুল নয় ত লোহা! একটা টোকা মারলেন নখের ওপর আর সারা শরীরটা ঝিন্‌ঝিনিয়ে উঠল।

প্রভঞ্জন বল্‌ল—আপনাদের ইলেকট্রিকের লাইন খারাপ হয়ে গেছে নাকি ? আলো জ্বল্‌ছে না যে!

রমিতা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল—আবার আলো কি হবে ? আমিই ত ঘর আলো করে বসে আছি।

—কুয়াশার চেয়ে অন্ধকারই ভালো—অন্ধকারকে স্বচ্ছন্দে অন্ধকার বলেই মনে করা যায়, কিন্তু কুয়াশাকে আলো বলে ভুল হয় অনেক ক্ষেত্রে। তাই নয় কি ? আপনার কি মনে হয়!

—আমার জীবনকে আপনি 'আলো আড়াল করা' সর্বনাশা কুয়াশার সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেল্‌লেন ? আমি কি এতই হাল্কা!

তবুও রমিতার আলো জ্বালবার উদ্যম দেখা গেল না। রমিতার কথাগুলি প্রভঞ্জনের কানে গেল বটে, কিন্তু মনে পৌঁছালো কি না বলা কঠিন। সে যেন অন্য কিছু ভাবছিল।

এই সময়ে সে চুরুট ধরিয়ে ফেল্‌ল—এটা বোধহয় তার চিন্তাচ্ছন্ন অন্যমনস্কতার পরিচয়।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রমিতা বলে—আপনার তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির মত কথাগুলো ভয়ঙ্কর, কিন্তু চুপ করে থাকাটা আরও বিপদজনক।

প্রভঞ্জন মন্থর ভঙ্গিতে বল্‌লে—আজ কদিনই পরমেশ আমার কাছে ফোন করছে।

—ও, তাই নাকি? পরীক্ষার পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত বুঝি সে! তা আপনাকে কি জন্যে ফোন করে সে!

—আপনার খবর জিগ্যেস করে।

—সেজন্যে আমাকে ডাকলেই ত পারে, আবার আপনাকে উত্যক্ত করা কেন! মাঝে মাঝে ওর এরকম একটা অভিমান যে কেন হয় বুঝি না।

—আপনি যেন আবার এসব কথা বল্‌তে যাবেন না তাকে। তার ধারণা হয়েছে যে, তার এ বাড়িতে আসাটা আপনি ঠিক চান না, সে যেন এই রকম একটা কিছু আঁচ করেছে—একটা development আর কি।

—দি আইডিয়া? সত্যি আমার বিপদে আপদে সে অনেক করেছে। আর তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও আজ নতুন নয়। সে আসছে না, পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত আছে, আমি এই জানি। এর মধ্যে আবার কি থাকতে পারে?

—আমার যা ধারণা সেটা শুনুন আগে, প্রতিবাদ করতে হয় পরে করবেন।

—আপনি যা বল্‌বেন তার খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছি, আচ্ছা, তবু শোনা যাক আপনার মুখ থেকেই।

—না, না, বেচারীকে আর কষ্ট দেওয়া আপনার উচিত নয়। আমি বলি কি, কাঙালের মত হাত পেতে কিছু চাইল না বলে তাকে চিরকাল বঞ্চিত রাখা বড় রকমের অবিচার।

—দেখুন, এখানে চাওয়া পাওয়ার কথা ওঠে না। মানুষ পথ দিয়ে চলে যায়, তাই বলে পথ তার বাসা নয়। চলবার জন্যই পথের প্রয়োজন—সেকথা পথও জানে পথিক ত জানেই। পরমেশ তেমনি আমার কাছে পথের মত বন্ধু কিন্তু সে আমার জীবনের লক্ষ্য কোনো দিনই নয়।

—কিন্তু কেন নয়, বলতে পারেন?

—নয় বলেই নয়—এখানে আর কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। আমি কেন আপনি নয়, আকাশ কেন বাতাস নয়—এ সব প্রশ্নের কেউ উত্তর দিতে পারে কি? আপনি আমায় এমন জেরা করবেন না।

একটু চুপ ক'রে থেকে রমিতা বল্‌ল—এমন একটা শান্ত ঝিম-ঝিমে ঘন সন্ধ্যায়, এত কাছাকাছি বসে কি আর কোনো ভালো কথা কইতে পারো না তুমি?

কার্পেটের ওপর প্রভঞ্জনের ভারী পা দুটো জুতোশুদ্ধ খস্‌-খস্‌ শব্দ করে থেমে গেল। চুরুটের রাঙা আগুনটা সহসা উজ্জল হয়ে উঠল প্রচণ্ড টানে।

—আমার ভালো কথা তোমার ভালো কথা হবে না! কারণ আমি তুমি নই।

—এ রকম অসহায় সম্বলহীন একটা আহত বিফল মনকে তুমি বার বার আঘাত দিয়ে কোন্‌ নতুন গানের লহর তুলতে চাও জানি না। আমাকে কি এই ভাবে একা-একাই চলতে হবে? তোমার কাছ থেকে আমি যে অনেক ভরসা চেয়ে এসেছি মনে মনে।

—দেখ রমিতা, আমাকে তুমি বাঁধতে চেষ্টা করো না, অনেক দুঃখ তাতে। আমার জগতটা কাজের চাপে, লোকের ভিড়ে, শত সমস্যার কণ্টকাকীর্ণ। তারই মধ্য থেকে তোমার জন্যে আজকের এই নির্জন সন্ধ্যাটি চুরি করে এনেছি—এর বেশী আমার সাধ্য নেই কিছু। আমার আর তোমার পথ এক নয়।

রমিতার নরম করতলের উত্তপ্ত স্পর্শে প্রভঞ্জনের আবেগের উৎস যেন স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়।

রমিতা বলল্‌—আমার আর কিছু চাই না—

প্রভঞ্জনের গম্ভীর কম্পিত কণ্ঠস্বরে আষাঢ়ের বর্ষণসম্ভারবিষাদের গভীরতা যেন মন্ত্রিত হয়ে উঠল—আমার কিছু বলবার আছে, তুমি শোনো—আগেই বাধা দিও না।

রমিতার আঙুলের হীরের আংটিটা অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল করছে—বাঁ হাত দিয়ে কাঁধের পাশের চুলগুলো পেছন দিকে সরিয়ে দেবার সময় চকিতে সেই হীরের দ্যুতি এসে প্রভঞ্জনের ব্যগ্র চাহনিকে ব্যগ্রতর করে ফুটিয়ে তুলল যেন। ও বল্‌ল—বলো আজ তুমি আমায় যে—

—আমার জীবনে তুমি এলে সঙ্কটের মত স্মরণীয় হয়ে, তা জানো?

কয়েকটি মুহূর্ত স্তব্ধ ভাবে পার হল। পাশের ঘরের দেওয়াল ঘড়িটায় অনেকগুলো বেজে যাওয়ার সঙ্কেত শোনা গেল।

রমিতা বল্‌লে—তুমি আমার ভাঙা মনকে প্লাবনের মুখ থেকে ছিনিয়ে আন্‌বার শক্তি দিয়েছ। কিন্তু আজ সেই থেমে যাওয়া নৌকার ভার তুমি ছাড়া আর কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি!

আলো নেই—প্রভঞ্জনের মুখের চুরুটের আভাটুকুও ছাইয়ে ঢাকা পড়েছে। প্রভঞ্জনের হাতখানা সরে গেল। রমিতার শিথিল মুষ্টি নিঃসঙ্গ-ভাবে টেব্‌লের ওপর পড়ে রইল।

প্রভঞ্জনের জীবনের একটা দিক এমনই অন্ধকার—এরাজ্যে ঘনপুঞ্জ অন্ধকার দীর্ঘ যুগের, এখানে কোনো গোপন অভিসারের ইতিহাস দাগ রেখে যায়নি। একদা আকাশে আকাশে যে পুষ্পসম্ভার নীল চোখের চকিত কটাক্ষে ফুটে উঠেছিল, তার কোনো রেণুরেশ, তার কোনো রঙিন ইশারা, তার সৌরভ অবশেষ, যেন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না আজ। তবু—তবু সে ডরোথীর অসম্মান করতে পারবে না। ডরোথীর কাছে কোথায় যেন অপরাধ সঞ্চিত হয়ে উঠছে, নিজের অর্ধচেতন মনের বোবা প্রতিবাদের যন্ত্রণা তার কর্ম-কোলাহলমুখর মুহূর্তগুলিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুল্‌ছে। এর হাত থেকে মুক্তি পেতেই হবে তাকে। প্রভঞ্জন আপন সঙ্কল্পের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের উদ্বেলিত অনুভূতি-প্রবণতাকে বিচার করতে চায়।

--ভাখো রমিতা, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, তুমি আমার জড় মনকে সঞ্জীবিত করেছো। আমার সে ঋণ—সে ঋণ আমি শোধ করতে পারব না! তোমার মনের পুঞ্জীভূত আগুনে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে আমার এই বৃদ্ধ মনে।

—কেন একথা বলছো?

আবছায়ার মত রমিতার মূর্তি যেন এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে দিনের আলোর চেয়েও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল—কণ্ঠের আকুতি দিয়ে আদি মানবী সকল বাস্তবকে অতিক্রম করে আপন স্বরূপে মূর্ত হয়ে উঠল।

—আমি আজ তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসি নি—তাতে আমার সংকীর্ণতার পরিচয়ই পাবে তুমি আজকে রমিতা।

—তুমি ছোট কি বড় তা আমি জানতে চাই নে। আমার নিজের মনে তোমার যে পরিচয় আছে তাই আমার সব। সত্য হয়ে ওঠো এইটুকু আমার পরম কামনা।

—বড় সাংঘাতিক সেই সত্যের স্বরূপ।

রমিতাকে বাধা দিয়ে বললে প্রভঞ্জন।

—তবে বলি শোনো, আমি অনেক ভেবেছি এ নিয়ে! জানি, তোমার জীবনে একটা অবলম্বন নিশ্চয়ই দরকার। তাই বলছি সে অবলম্বন হিসেবে তুমি পরমেশকে গ্রহণ করো—তার সমবেদনা, তার সহানুভূতি তোমার জীবনকে ছায়ার মত ঘিরে রেখেছে, তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু আমার বিশ্বাস পরমেশ তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

—না—না—না!

আর্তস্বরে রমিতা অস্বীকার করল—আমি ত অন্ধ নই!

প্রভঞ্জন অকম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকে—সে তোমাকে ছায়ার মত ঘিরে রেখেছে, তাই তুমি আজ তাকে বাদ দিয়ে অনায়াসেই দূরের রোদটাকে আরামে দেখতে পাও! আমার কথাটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করো না। আমাকেও একজন কয়েকটি মুহূর্তে 'ছায়ামূর্তি অনুচর' করে ঘিরে ছিল—তাকে যত দূর থেকে দেখছি, তত ঘন করে বুঝতে পারছি তার শক্তি, তার মায়া।

এতদিন অন্ধভাবে তাকে অনুভব করেছি কিন্তু বুঝতে পারি নি। তুমি আমার এই সচেতনতা এনে দিলে!

—না, না তুমি আমায় এভাবে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিও না।

রমিতার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো, ব্যাকুলভাবে ওর ডান হাতখানা প্রভঞ্জনের নাগাল পাবার জন্য অন্ধকার হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগল। প্রভঞ্জনের কঠিন লোমশ মণিবন্ধখানা রমিতার উত্তপ্ত স্পর্শের কোনো প্রতিবাদ করতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে প্রভঞ্জন বল্‌ল—আমি তোমার কাছে ধরাবাঁধার পথ দেখিয়ে দিচ্ছি না রমিতা, তবু ভালো ক'রে ভেবে দেখো। পরমেশ তোমাকে গভীর ভাবে ভালোবাসে। তার মত খাঁটি প্রেমিক হ'তে পারা সোজা কথা নয়।

চমৎকারিণী দেবী প্রভঞ্জনের খাবার সময় সাম্‌নেই বসেছিলেন। অন্যদিন এত রাত্তিরে প্রভঞ্জন বাড়ী ফিরলে তিনি হয়ত একটু অনুযোগ করতেন, আজ কোনো কথাই বলেন নি।

ঘাড় হেঁট করে খেতে খেতে প্রভঞ্জন বেশ বুঝতে পারে যে মায়ের দৃষ্টি তার ওপর ন্যস্ত। একটা কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে দু'চারটে কথা বলে এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাবার কথাই ভাবছিল সে, এমন সময় মা বল্‌লেন—তা, বিয়ে করবে ত করেই ফ্যালো না!

রুটির টুকরো মুখে গুঁজে দিয়ে বিস্মিতভাবে প্রভঞ্জন মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন—আমার জন্যে চক্ষুলজ্জার ত কোনো দরকার দেখি নে! আমায় ত জয়ন্ত নিয়ে যেতেই চায়। তবে, আর কোথাও এই বুড়োবয়েসে যাচ্ছি না, কাশী বিশ্বনাথের আশ্রয়ই চিরকাল হিন্দুঘরের বিধবাদের শেষ সম্বল, আমারও না হয় তা-ই হবে। শুধু শুধু পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, তার কি দরকার বাবা। একটু যা ভাবনা ছিল পার্বতীদের জন্যে, তোমার দয়ায় ত যাহোক তাদের একটা বিয়ে হয়ে গেল। এখন তোমার যা মনের অবস্থা তাতে ও মেয়েটিকে বিয়ে

করাই ভালো। পাঁচজনে পাঁচরকম বলে, সে সব শোনার চেয়ে একটা হেস্তনেস্ত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর আমিও বেশ বুঝতে পারছি ত!

—কি বুঝছ?

—তাও মুখের ওপর স্পষ্ট বলতে হবে? তবে শোনো: অল্পবয়সী একটা গাছের ওপর ঝড় লাগলে সে সামলাতে পারে, মাটির ভেতর শেকড়টা তার শক্ত হয়ে আটকে থাকে। কিন্তু আরো বেশি বয়সের গাছের শেকড়ে সে বাঁধনের জোর থাকে না বাবা। সেইজন্যেই হয়ত তেমন বিরাট ঝড় এলে বড় গাছ উল্টে পড়ে। এও ঠিক তেমনি—আমার মনের অনেক দূর পর্যন্ত তোমার শেকড় চলে গিয়েছে, কিন্তু তোমার আঁকড়ে ধরে থাকার তাগিদ আগের মত তেমনটি আর নেই বাবা—তাই বলছিলাম যে চোখ বুজে লুকিয়ে চলার চেয়ে তাকিয়ে চলো!

—তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি রমিতাকে ইঙ্গিত করছ।

—আমার মুখ দিয়ে ওই নামটা উচ্চারণ করতে চাও কেন! আমার দিন ফুরিয়েছে, ছুটি দাও।

—তাবেশ ত, আমি যেদিন জাহাজে উঠ্‌ব সেদিন তুমিও না হয় কাশী যেয়ো!

—ততদিন আর অপেক্ষা করতে হবে না। মা অন্নপূর্ণার ডাক শুনতে পাচ্ছি। এমনিতে ত মায়ার বাঁধন কাটতে পারছিলাম না, তাই তিনি কৃপা করে ছেলে-মেয়ে-জামাইদের কার্যকলাপের আঘাতে ছিঁড়ে দিতে চাচ্ছেন বাঁধনটা। চোখ খুলে গিয়েছে তাঁর কৃপায়।

পাছে মায়ের চোখের কোণ সিক্ত দেখে দুর্বল হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় প্রভঞ্জনও আর মাথা তুল্‌ল না। সে বল্‌লে—এতই যখন করলে, তখন হাতে করে বিয়েটা দিয়েই যেয়ো। শান্তি পাবে।

চমৎকারিণী উঠে চলে গেলেন।

পরক্ষণে প্রভঞ্জন নিজের এই নিষ্ঠুর রসিকতায় নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে অর্ধসমাপ্ত আহার্যগুলির দিকে দৃকপাত না করেই পিঁড়ি ছেড়ে উঠে পড়ল।

হাতমুখ ধোওয়ার সময়ই প্রভঞ্জনের মনটা নরম হয়ে এল। সত্যি এভাবে মাকে আঘাত করা তার সমীচীন হয় নি। অথচ এখন আর চমৎকারিণীর

কাছে গিয়ে কোনো কথা বল্‌তে ইচ্ছে করছে না প্রভঞ্জনের। সে জানে, সামান্য মাত্র ছোঁয়া পেলেই চমৎকারিণীর এই বাহ্যিক কঠিনতা ভেঙে পড়বে কান্নার বন্যায়। সারাদিনের বিশেষ করে সন্ধ্যার ঘাত-প্রতিঘাতে তার মন এত পরিশ্রান্ত যে এখন আর এতটুকু কথা বলা ত দূরের কথা ঘাড়ের ওপর মাথাটা সোজা রাখাই প্রভঞ্জনের পক্ষে শক্ত মনে হচ্ছে। দিনান্তের শেষ প্রণামটা করবার জন্য মায়ের ঘরের সাম্‌নে এসে যখন সে দেখল দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আর ডাকাডাকি না ক'রে সে নিঃশব্দে ফিরে এসে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিল। তার চোখের সামনে পৃথিবীটা ঘোলাটে ঝাপ্‌সা দেখাচ্চে। একটা বিরাট দ্বন্দ্ব তার মনকে বিকল করে দিচ্ছে কি?

চমৎকারিণী ছেলের নাক-ডাকার শব্দ পেয়ে আস্তে আস্তে যখন খাবার ঘরে ফিরে গিয়ে দেখলেন প্রভঞ্জন কিছুই খায় নি, তখন তাঁর অনুতাপ-পরিতাপের অবধি রইল না। আপন মনে বিড় বিড় করে বকতে লাগ্‌লেন —মা নই, ডাইনী—ডাইনী! উঃ এতদিন ধরে আমি একে স্নেহ বলে গর্ব করেছি! রাক্ষুসী, ছেলেটাকে খেতে দিলি না! আমার মরণ হয় না—! ছি, ছি এই স্নেহ! মুখে ছাই পড়ে না কেন আমার।···হিংসে করিস তুই—হিংসের জ্বালায় ছেলেটাকে সুখী হতে দিলি না? শান্তি পেতে দিলি না!

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় চমৎকারিণী শিউরে উঠলেন। তাঁর মনের মধ্যে থেকে এসব কথা যেন আর কেউ বল্‌ছে। একটা উজ্জল শান্ত দৃষ্টির মত আলো তাঁর মনের দিগন্তে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এইভাবে নির্মোহ হয়ে কখনও নিজেকে দেখতে পাননি চমৎকারিণী।···এই আমি মা? নিজের সকল ছোট-বড় ইচ্ছাকে ছেলের ভাগ্যে জড়িয়ে দিয়ে তার নিজের ইচ্ছে, আশা সব কিছুর পথ জোড়া করে রেখেছি! এই আমার মাতৃত্ব? না, এছাড়া আর কিছু নেই। আমার মাতৃত্ব শুধুই দাবীর বোঝা।··· সেই আলোকরেখার মধ্যে থেকে নিজেকে অন্ধকারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চমৎকারিণী প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নিজের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে তাকে দেখবার মত সাহস তাঁর নেই। না তিনি পারবেন না নিজেকে বিচার করতে।

রমিতা বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। রাত্রে ঘুম না হওয়া তার অভ্যেস দাঁড়িয়েছিল এক কালে—কিন্তু ইদানীং ও বেশ আরামেই ঘুমোতো, ঘুমিয়ে আরাম পেতো। আজ প্রভঞ্জন যখন জানিয়ে দিল যে রমিতার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে কিন্তু বাঁধা পড়তে পারবে না, তখন থেকেই মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। একদিকে ওর অসীম সান্ত্বনা—প্রভঞ্জনের বিরাট গভীরতায় রমিতা যে উদ্বেল তরঙ্গ তুলেছে—তুলতে পেরেছে, সেটা ওর কাছে সামান্য নয়। কিন্তু অন্য কথাটাও কম গুরুতর নয়,– সেটা প্রভঞ্জনের সংকল্প। প্রভঞ্জন বৈজ্ঞানিক। সে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে পরমেশকেই রমিতার জীবনের সঙ্গী হিসেবে ডেকে নেওয়া উচিত। যুক্তির দিক দিয়ে রমিতা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভঞ্জনের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারে নি। কিন্তু যুক্তির বাইরে যে মন সক্রিয়, সেখানে প্রভঞ্জনকে ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

নিজেরই মনে রমিতা প্রভঞ্জনকে সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে তর্ক জুড়ে দিল। তর্ক করতে করতে অবশেষে ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তন্দ্রাতুর মনে ও দেখতে পেল, বিহারের অসমতল প্রান্তরে একটি পথিক—অনুকূল। তার ছায়া পড়েছে পিছনে; মানুষটি চলেছে সম্মুখের উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে। শালবনের পরিচ্ছন্ন কাঁকরবহুল মাটির ওপর পড়েছে তার তির্যক ছায়া। অনুকূলের পিঠে 'ডিস্‌পোজাল' থেকে কেনা একটি ঝুলি। ঝুলির ওপর লেখা 'গ্র্যাণ্ড মেরী স্টুডিও'।...মেরী! মেরীর সেই শ্যামল স্বাস্থ্য-মাধুর্যে মুখর যৌবন, চোখের সরল চাহনি। সেই মেরীর জীবনে ত এলিয়াসের স্থান অধিকার করল অনুকূল।...সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাবলেশহীন মুখচ্ছবি এসে দাঁড়াল—সে পরমেশ।

রমিতা প্রশ্ন করে—পরমেশ, তুমি? তুমি কেন!

—আমাকে যে ডাকলে তুমি।

কথাটা শুনেই রমিতা প্রতিবাদ করল।—না, না, আমি তোমাকে ডাকিনি ত!

—'ও!' বলে সেই ভাবলেশহীন মুখখানা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

পরক্ষণে রমিতা চীৎকার করে ডাকল—পরমেশ, দাঁড়াও শোনো!

আবার সেই রকম ভাবেই এসে দাঁড়ালো পরমেশ, বলল—কি?

—আচ্ছা সত্যি বলো ত তুমি আমায় ভালোবাসো?

—তাতে তোমার কি এসে যায়!

—না, তবু এই এমনি জানতে ইচ্ছে করে।

পরমেশ জবাব দিল—ঘটা ক'রে জানাবার মত কিছু ত দেখতে পাচ্ছি নে।

রমিতা বললে—আমি ঠিক করে ফেলেছি।

পরমেশ বললে—কবে পাড়ি জমাচ্ছ?

—না, আর কোথাও যাবো না। এবারে একদিন সুইসাইড্ করব।

—তোমার যা প্রাণের মায়া, তুমি পারবে না। জীবনকে তুমি বড্ড ভালবাসো। অবিশ্যি আমিও খুবই ভালবাসি নিজেকে, নইলে—!

—নইলে কি?

—নইলে এত দিন বিয়ে থা করে বেশ আনন্দে থাকা যেতো। আমার সংসারে তোমায় এক আধ দিন নেমন্তন্নও করতে পারতাম।

রমিতা উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা পরমেশ, তোমাকে কি প্রভঞ্জন কিছু বলেছে?

একটু বিস্মিত হয়ে পরমেশ উত্তর দিল—কই, না ত! কি আবার বল্‌বে সে! এই আজকাল তোমাদের বড্ড বেশি বলা-কওয়ার হিড়িক হয়েছে। কেন যে মেয়েদের নাম অবলা হল জানি না!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রমিতা নিশ্চিন্ত হল।

তারপর বল্‌লে—তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো পরমেশ। আমি কিছুই দিতে পারিনি। আজ ইচ্ছে করছে তোমাকে কিছু দিই।

পরমেশ হেসে উঠল। পরক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গেল তার হাসি।

পরমেশ বল্লে—সত্যিই যদি কিছু দিতে চাও তবে দয়া করে এইটুকু ভরসা দাও যে কিছু দেবে না তুমি।

—না, সে কি পারি, তুমি আমার দুর্দিনের আকাশে ধ্রুবতারার মত সুনিশ্চিত অবলম্বন। তোমাকে যে দিতেই হবে তোমার প্রাপ্য।

নারীর চিরন্তন জিজ্ঞাসা রমিতাকে কৌতূহলী করে তুলল। ওর চটুল চপলতা নাচিয়ে তুলল ওর মনকে। ও একটা হাত পরমেশের কণ্ঠলগ্ন করে দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল—আমি তোমায় ভালোবাসি।

ওষ্ঠপ্রান্তে ওর বাঁকা হাসি, দীর্ঘ পক্ষ্মপাতে আবেশের মদিরা—নিজের অভিনয়দক্ষতায় রমিতা নিজেই বিস্মিত হয়।

কিন্তু পরমেশের মুখেচোখে যে বিস্ময়নিবিড় সৌন্দর্য ফুটে উঠল, সে রূপময় বিবশতা জীবনে খুব কমই দেখেছে রমিতা। হ্যাঁ, আবছা মনে পড়ছে যেন, একদিন মিহিরের চোখে মুখেও এই অভিব্যক্তি দেখেছিল ও।…

একটা প্রচণ্ড শব্দে রমিতা জেগে উঠল। এত গোলমাল কিসের!

পরিবর্তন ডাকছে—খুকী! খুকী! সান্ত্বনা!

ও সাড়া দিল—কি, কি হল বাবা! এত গোলমাল হচ্ছে কেন?

—অমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ছিস কেন রে খুকী!

আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল রমিতা—সত্যিই খাটের বাজু ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাথার কাছে টি-পয়ের ওপর যতগুলি ওষুধপত্র ছিল এবং জলের কুঁজো, গ্লাসটি পর্যন্ত মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। রমিতা অপ্রতিভভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

পরিবর্তন মেয়ের এই অপ্রতিভ ভাব দেখে একটু হেসে বলল—তোর ঘরে যেন লড়াই হচ্ছে—রাতদুপুরে কাঁচের শিশি ভাঙার শব্দে চমকে উঠলাম, বলি যাই দেখে আসি কি ব্যাপার!

কুণ্ঠিত ভাবে রমিতা বলল—তাই ত, কেন এমন হ'ল!

পাছে রমিতা মনে কিছু কষ্ট পায় সেজন্য পরিবর্তন বলল—ওঃ, ঘুমের ঘোরে মানুষ কী না করে! যাক্, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়। জল দেবো, একটু জল খাবি!

—না, না, কিছু দরকার নেই। বাবা, তুমি যাও নিশ্চিন্ত হয়ে শোও গিয়ে।

পরিবর্তন চলে গেল—দরজার ওপারে তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ স্পষ্টই রমিতার কানে এসে বাজ্‌ল।

সে রাত্রে রমিতা আর বালিশে মাথা ঠেকায় নি। বসে বসে বাইরের শূন্য রহস্যের দিকে তাকিয়েই ওর বাকী রাতটুকু কাটল। আস্তে আস্তে ঘন শূন্যতায় একটু একটু ফিকে আলোর আভা জেগে উঠল। ফর্সা হল চারদিক। পরিবর্তনের প্রাতঃকালীন স্তববন্দনার ধ্বনি অখণ্ড স্তব্ধতাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে গম্ভীর তরঙ্গ তুল্‌ল।

রমিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রভঞ্জনের সংকল্পে মনে মনে সম্মতি জানাল। রিক্ততার একটা অদ্ভূত আনন্দানুভূতি আছে—রমিতার মনেও ভোরের মিষ্টি বাতাসের সঙ্গে মিশে তেমনি একটা হাল্কা হাওয়া দিচ্ছে।

শ্রান্ত কণ্ঠে বল্‌ল রমিতা—জয় হোক—তোমারই জয়!

ক্লান্তিতে হাত-পা শির শির করছে।

কড়িকাঠের পাশে একটা টিকটিকি জড়সড়ো হয়ে আটকে রয়েছে—সেই দিকে ওর দৃষ্টি আবদ্ধ। মনটা ব্যস্ত প্রভঞ্জনকে নিয়ে। মন বল্‌ছে—সত্যি, আমার দেবার মত কিছু নেই। অনেক বেলায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবু, আমার এই শুক্‌নোপাতা-ছড়ানো মনের পথ দিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ আমাকে যে আদেশ দিয়ে, তাই আমি বহন করব। এই ব্রতই আমার শেষ সম্বল। পরমেশকেই আমি আশ্রয় বলে গ্রহণ করব! হ্যাঁ তাই করব। তোমার মহান লক্ষ্য মহত্তর সত্তার স্পর্শে সার্থক হোক—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

রমিতার চোখের শুক্‌নো পাতায় অশ্রু-পুঞ্জ যেন তুষারের মত জমাট বেঁধে গেছে—নইলে ঝরে পড়ত।

শীতশেষের পুঞ্জীভূত ধূলিরাশি ঝরাপাতার আশ্রয়চ্যুত হয়ে পথ চল্‌তি যানবাহনের চাকার টানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দুপুরের রোদটা এখন আর তেমন মিষ্টি লাগে না। ছোট আদালতের নূতুন বহাল হওয়া হাকিমের একটু উষ্ণ মেজাজ যেমন অদূর ভবিষ্যতের অধিকতর উগ্রতার ইঙ্গিত দেয়, এখনকার রোদেও ঠিক তেমনি আসন্ন বৈশাখের রুদ্রমূর্তির আভাস।

বেলা এগারোটা। ট্যাংরার একটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন বস্তী। বস্তী বল্‌লে আগেকার কালে যে শ্রেণীর আবাস এবং বাসিন্দার ছবি চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ত এটি সে পর্যায়ে পড়ে না। মার্চেণ্ট আপিসের কনিষ্ঠ কেরাণী হরেন বাবু থেকে শুরু ক'রে কারখানার মিস্ত্রী নন্দ দাস পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই বস্তীর কৌলিন্য বজায় রাখে। নফর এবং ললিতার এককামরা ঘরের ছোট্ট বাসার পাশের ঘরখানায় অনিলা'দি আর তার বিধবা মা থাকেন। অনিলা কোন এক হাসপাতালে চাকরী নিয়েছে। অনিলার কাকা এবং ছোট ভাই এখনও পাকিস্তানেই রয়েছে। আপাততঃ মেয়েদের স্থানান্তরিত করে তারা নিশ্চিন্তভাবে ভিটেমাটি বজায় রাখ্‌ছে। আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে আবার মেয়েদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। ইতিমধ্যে অনিলা নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য হাসপাতালে নার্সের চাকরী নিয়েছে, সেই সঙ্গে মিড্‌ওয়াইফারীও পড়ছে। অনিলার মামারা হরেনবাবুর দেশের লোক তাই অনেক তদবির ক'রে নামমাত্র একশ' টাকা সেলামী দিয়ে, পনেরে টাকা ভাড়ায় এই ঘরখানি সংগ্রহ করা ওদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সে-ও ত দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। অনিলা এ পাড়ায় এখন সুপরিচিতা অনিলার সবচেয়ে বড় পরিচয় পরের বিপদে-আপদে অনায়াসে সেবাশুশ্রূষা করে ও।

ওর ঘরের সাম্‌নে অনেকগুলি মেয়ে এসে জমেছে। একজন বল্‌ল—কতটা হাঁটতে হবে ভাই অনিলা!

অনিলা ঘর থেকে বেরিয়ে তালা লাগিয়ে মায়ের হাতে চাবীটা দিয়ে বল্‌ল—তুমি আর এসবের মধ্যে না গেলেই পারতে মা। একটা হাঙ্গামা হ'লে তখন তোমাকে নিয়েই মুস্কিল বাধবে।

অন্যান্য মেয়েরাও সায় দিয়ে বল্‌লে—থাক, আপনার গিয়ে কাজ নেই মাসিমা।

অনিলার মা ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—আমার নিজের জীবনটাই বড় হ'ল? ছেলেটা রইল আর এক দেশে তারওপর মেয়েটার যদি বিপদের মুখে পড়ে একটা ভালো মন্দ কিছু হয় তবে আমার বেঁচে থাকার কি দাম বলো মা!

পাশের ঘর থেকে ললিতা বেরিয়ে এল এদের মিলিত কোলাহলের শব্দে; মেয়েদের দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—ও মা, তোমরা সব দল পাকিয়ে কোথায় যাচ্ছ গো অনিলাদি!

অনিলাকে কথা বল্‌বার ফুরসৎ না দিয়ে একটি কালো শীর্ণ মেয়ে এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বল্‌লে—একেই বলি পড়শী! এতক্ষণে হুঁস হ'ল ভাই। তুমি বুঝি নাকে সরষের তেল লাগিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?

ললিতার অপ্রতিভ মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে অনিলা বল্‌লে—আমাদের হাসপাতালে ধর্মঘট কিনা, তাই এরা সবাই যাচ্ছে।

কে একজন বল্‌লে—তোমার অত বড় অসুখের সময় দু'হাতে সেবা করল অনিলাদিরা মায়ে-ঝিয়ে, আর আজ তুমি এত বড় বিপদের খবর কিছুই রাখো না?

অনিলা বাধা দিল—তুই থাম বকুল, ও বেচারী সাদাসিধে মানুষ, তায় শোকতাপে কাহিল—ওকে অমন করে শোনানো কেন বাপু!

ললিতা বল্‌লে—তা তোমরা সবাই সেখানে গিয়ে কি করবে গো?

কালো মেয়েটি হাতের মুঠো পাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—দাবী জানাবো। জানে, হাসপাতালের দেড়শ' নার্সকে ওরা যা মাইনে দেয় তাতে একটা মানুষের একবেলা খেতে কুলোয় না। তারওপর পশুর মত নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেয়। নাইট ডিউটি করতে হবে সারারাত জেগে, তারপরও ছুটি দেওয়া হয় না! কেন সেবা করতে হবে ব'লে কি নার্সদের বাঁচবার অধিকার নেই! কেন, নার্স কি মানুষ নয়? আমরা সেই জন্যে যাচ্ছি, এঁদের দাবী জানাতে! তেল—কাপড়া—রোটি!

—ওরা দেবে? ললিতা ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকে।

—দের কোন্ মিঞা, আদায় করে নিতে হবে। এ তো ভিক্ষে নয়, এ ন্যায্য অধিকার! চলো না তুমিও!

ললিতা বললে—ওঁকে যে বলা হয়নি ভাই! অবিশ্যি অনিলাদির সঙ্গে গেলে উনি কিছু বলবেন না। আচ্ছা দিদি কারখানার ভোঁ বাজবার আগে ফিরতে পারব তো?

অনিলা বলল মৃদুস্বরে—থাক, ললিতা তুমি না-ই গেলে। বরং কলে জল এলে আমার জলটা তুলে রেখো, কখন ফিরব ঠিক নেই ত।

ললিতা কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল—কিন্তু দিদি আমার যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। চলো, যাই—।

শেষ পর্যন্ত ললিতা যেন নিজের গরজেই ওদের সঙ্গে রওনা হ'ল।

এতগুলি মেয়ের এই অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে ওর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তার প্রয়োজনই বা কি! সকলের হাবভাবে ও বুঝেছে যে এক্ষেত্রে দলের বাইরে থাকলে অনিলাদির কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে। অনিলাকে ও ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। সেই অনিলাদির বিপদে দূরদূরান্তরের মেয়েরা এসে জুটেছে আর ললিতা তার পাশের ঘরের মেয়ে হয়ে এমন সময়ে চুপ করে ঘরে বসে থাকবে! নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে ললিতা অত্যন্ত সচেতন—তবু যখন বুঝল যে অনিলা তাকে অক্ষম বলেই হাসপাতালের ব্যাপার কিছু জানায় নি তখন মনে মনে নিজের ওপর রাগ হ'ল ললিতার। হয়ত সেইজন্যই পথে চলবার সময় ললিতা সকলের আগে আগে চলছিল।

এদের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য কি ললিতা ঠিক জানে না, তাই মাঝে মাঝে অনিলাদির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে—আশপাশের মেয়েদেরও লক্ষ্য করছে ও অনবরত।

হাসপাতালের সামনের দরজা খোলা। লোকজন বিশেষ নেই। বড় বড় বাড়িগুলোর কার্নিশে পায়রারা বসে বসে আওয়াজ করছে। লম্বা দেবদারু গাছের স্বল্পপত্র ডালে বসেছে কাকেদের মজলিস।

এপাশ ওপাশ থেকে কৌতূহলী পথিকের জনতা আর পুলিশের গাড়ি জমে উঠেছে। মেয়েদের তীক্ষ্ণ মিলিত কণ্ঠস্বর প্রবল থেকে প্রবলতর ধ্বনিতে

প্রতিবাদ ঘোষণা করছে। ললিতার ভারী বিচিত্র লাগছে এই সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশটা। ওর বুকের মধ্যে কেমন একটা দাপাদাপি শুরু হয়েছে।

হঠাৎ চারিপাশে লোকজন ছুটে পালাতে শুরু করল। বড় রাস্তার মুখে যে গলিগুলো ছিল সেগুলো সহসা বড় নদীর জোয়ারে উপছে পড়া জলে ভরা নালার মত আকণ্ঠ হয়ে উঠল। 'গুম গুম্-গুর্‌র্' গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষে বাতাস ভারী হ'ল—ভিড় হাল্কা হ'ল এক পলকে।

ললিতা অসহায় ভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখল ওর আশপাশে কেউ নেই, নানাদিকে মেয়েরা সব ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন দম্‌কা ঝড়ো হাওয়া হঠাৎ এসে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে সব কিছু। তার পাশে যে কালো রোগা মেয়েটি অনাবশ্যক হাত ছুঁড়ছিল সে নেই, এমন কি অনিলাদিকেও দেখা যাচ্ছে না। এখন কি করবে ললিতা! ওই যে, ওইখানে অনিলাদি গলির মুখে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ডাকছে হাত নেড়ে নেড়ে কাদের! ললিতা ছুটে গেল অনিলার কাছে।—কি বল্‌ছ অনিলা দি!

ওকে দেখে অনিলা যেন খুব জরুরী কিছু বল্‌বে মনে হ'ল—এই যে ললিতা! শোনো, তুমি এই গলির মধ্যে পালাও—আমি আর কয়েকজনকে নিয়ে হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে পড়ব! শোনো, মাকে খুঁজে নিয়ে বাড়ি যেয়ো। মাকে তুমি দেখো, আমি যাচ্ছি! যদি না ফিরি তাহলে ভেবো না।

পরক্ষণে অনিলা রাস্তার মাঝখানে চলে গেল। ললিতাও ওর পিছু পিছু চলেছে—অনিলাদি, এবারে হাঙ্গামা শুরু হয়েছে বুঝি!

ললিতার মনে হল, এইবারে ওর মত অযোগ্য মেয়ের কাজ করবার সুযোগ বুঝি মিল্‌বে।

অনিলা পিছন ফিরে বল্‌ল—ললিতা পালাও! ছেলেমানুষী ক'র না।

ললিতার মনের মধ্যে কি যেন একটা উত্তেজনা লাফিয়ে উঠেছে—অনিলার কথার কোনো জবাব দিল না ও, কিন্তু পালিয়েও গেল না। অনিলাদি ললিতাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে চলেছে। অনিলাদির দৃপ্ত গতিভঙ্গিতে নিষেধের কোনো ইঙ্গিত নেই, আছে দৃঢ়তার অনমনীয় ছন্দ।

আবার আওয়াজ হল। এবারে কয়েকটি মেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। গুলী! গুলী চলছে! কে যেন বল্‌লে, কাঁদুনে গ্যাস! ললিতা বুঝতে পারছে না, এত শব্দ কিসের।···সে তাকিয়ে দেখল কালো রঙের একখানা মস্তবড় গাড়ি। পরমুহূর্তে ওর মনে হ'ল মাথার ওপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লেগেছে। চোখের সাম্‌নে পৃথিবী দুলে উঠ্‌ল। তারপর কেমন একটা ঘোলাটে অন্ধকার। ওর হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তিটুকুও আর নেই। অনিলাদির কথা মনে পড়ছে। কোথায় অনিলাদি! সাম্‌নে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। অস্পষ্ট একটা কোলাহলের ধ্বনি কানে এসে বাজ্‌ছে। ক্রমশঃ সেটুকুও স্তিমিত হয়ে গেল। শুধু নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকছে! মা—মাগো!

অস্ফুটস্বরে ললিতা বলে উঠ্‌ল—পাঁচটার ভোঁ বেজে গেল?

পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে বিছানার উপর উঠে বস্‌ল ললিতা। উঃ সর্বাঙ্গে কী দুঃসহ যন্ত্রণা!

শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কে বল্‌ল—অমন চম্‌কে উঠ্‌লে কেন ভাই—উঠে বসলে কেন! শুয়ে পড়ো।

ললিতা বিস্মিত ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল—সুন্দর সাজানো একটি ঘর, ফর্সা দেওয়াল, আর বিছানাটাও আশ্চর্য নরম। ওর বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টির সাম্‌নে ছবিতে আঁকা নিখুঁত সুন্দরীর মত একটি মূর্তি কোথা থেকে এল! ললিতার দুর্বল মস্তিষ্ক এতখানি বিস্ময়ের ধাক্কা সইতে পারল না।

কিছুক্ষণ পরে আবার যখন ও চোখ মেলে তাকাল তখনও সেই অপরিচিতা রমণীটিকে দেখে আস্তে আস্তে বল্‌ল—আপনি কে?

—এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে ভাই!

পুনরায় প্রশ্ন করল ললিতা—আমি এখানে কেন? এটা কি হাসপাতাল বুঝি!

ললিতার স্মরণ পথে একটু একটু ক'রে ছায়ার মত জেগে উঠেছে—অনিলা দি···সেই অনাবশ্যক হাতে মুসি পাকিয়ে চীৎকার করছিল যে মেয়েটা

তার চেহারা···অনিলাদি'র মা, কালো গাড়ি···! আবার সব ঝাপসা হয়ে গেল।

এমনি ক'রে মাঝে মাঝে এক একটা চেতনার ঢেউ আসে আবার কয়েক সেকেণ্ড পরে ঝিমিয়ে পড়ে ললিতা। যখন জ্ঞান হয় তখনও বেশির-ভাগ সময় ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়েই থাকে ও।

ললিতাকে গাড়ি থেকে নামিয়েই রমিতা পরমেশকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল।

পরমেশ দেখে শুনে বল্‌লে—তা তুমিই বা এত হাঙ্গামা পোয়াতে গেলে কেন? পুলিশের গাড়ি, এ্যাম্বুলেন্স, কেউ না কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেতোই। আজ বাদে কাল আমার পরীক্ষা, এখন কি না একটা মাথায়—!

রমিতা ব্যস্তভাবে জবাব দিল—তোমার অসুবিধে থাকে পারবে না বলে দাও, কলকাতায় ডাক্তারের অভাব নেই।

—অমনি চটে গেলে ত! আরে ডাক্তারের যে অভাব নেই তার প্রমাণ ত স্বয়ং আমিই রয়েছি—অভাব থাকলে ত দায়ে পড়ে আমায় পাশ করিয়ে ওরা দল বাড়াবার চেষ্টাই করত। তা নয়, আমি ভাবছি এ'কে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা।

—না তার দরকার নেই।

—তা ছাড়া হাসপাতালের নার্সেরা সব স্ট্রাইক করেছে, এখন ত ভর্তি করাও শক্ত। একে জোটালে কি করে?

—বাড়িতে বসে বসেও ঠিক ভালো লাগছিলো না। ভাবলাম, বাইরের হাওয়ায় যদি গতির সন্ধান মেলে! তা বেশি দূর যেতে হ'ল না, ওই হাসপাতালের কাছাকাছি গিয়েই কাঁদুনে গ্যাসের গন্ধ পেলাম। তা করতে করতে একটি মজবুত গোছের মেয়ে আমার গাড়ির ফুটবোর্ডে চড়াও হয়ে বল্‌লে,—একটি মেয়েকে আপনি উঠিয়ে নিন্ আপনার গাড়িতে। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। এই মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরেই তোমার কথা মনে পড়ল। তাই ডেকেছি।

—প্রয়োজন ছাড়া যে তুমি আমায় ডাকতে নারাজ তা বেশ বুঝি! সে যাই হোক, তুমি কিন্তু একটি বিপ্লবী মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছো। হাস-পাতালের সাম্‌নে আজ খুব হাঙ্গামা হয়েছে—এ মেয়েটি সেই দলেই ছিল, নইলে জখম হ'ল কি করে?

—বিপ্লবী মেয়ে? চেহারা দেখে ত মনে হচ্ছে না। এর চেহারায় শুধু শান্তশ্রীই দেখ্‌ছি।

—হুঁ ওই রকমই মনে হয় বটে!

—তোমায় তর্কের জন্যে ডাকা হয় নি—কাজ করো।

পরমেশ অসহায়ভাবে একবার রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাণ্ডেজের কাজে লেগে গেল। ড্রেস করতে করতে বল্‌লে সে—দেখে মনে হচ্ছে বোমার টুক্‌রো ছিট্‌কে এসে লেগেছে। আঘাতটা শারীরিকের চেয়ে মানসিক—মানে আওয়াজে ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিল যা দেখ্‌ছি। তেমন মারাত্মক কিছু নয়।

রমিতা পাশে দাঁড়িয়ে পরমেশের কাজ দেখ্‌ছিল। দরকারের সময় ললিতার অচেতন দেহ উঁচু ক'রে তুলে ধরছিল রমিতা। অভ্যাস না থাকলেও রমিতা বেশ পটুত্ব সহকারেই পরমেশকে সাহায্য করতে লাগল। মুখে কোনো কথা বল্‌বার মতো মনের অবস্থা ওর নয়। ব্যাণ্ডেজ সারা হয়ে গেলে পরমেশ বল্‌ল—জ্ঞান হ'লে ভাইনামগ্যালিসিয়া আর দুধ দিও, মোটে উঠ্‌তে বস্‌তে দেবে না, বুঝলে?

ঘাড় নেড়ে রমিতা নীরবে সায় দিল।

কিছুক্ষণ পরে চা খেতে খেতে পরমেশ প্রশ্ন করল—ডাক্তারের কোনো চিঠিপত্র পেয়েছো?

ইদানীং সে 'ডাক্তার' বল্‌তে প্রভঞ্জনকেই বোঝায়।

রমিতা পিরিচের চা-টুকুতে বাঁ হাতের অনামিকাটি ডুবিয়ে আঁক কাট্‌ছিল, বল্‌লে—না, তিনি চিঠিপত্র দেবার সময় কখন পাবেন? তা ছাড়া তুমি তো জানো—!

পরমেশ নিশ্চিন্ত মনে হাণ্ট্‌লি পামারের 'গোল্ডেন পাফ'-বিস্কুটে খানিকটা মাখন মাখিয়ে নিতে নিতে বল্‌লে—না, আমি ত কিছু জানি নে।

রস্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে পরমেশের সন্দেহ হ'ল, গুরুতর একটা কিছু ওর মনের মধ্যে তোলপাড় করছে বুঝি বা। এখনই এই মুহূর্তে 'সিরিয়াস' ব্যাপারে মাথা দেবার মত মনের প্রবণতা নেই পরমেশের, কিন্তু কি ভাবে এড়ানো যায় সে বুঝে উঠ্‌তে পারল না।

রস্মিতা বল্‌লে—আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উনি একটা ছক কেটে দিয়ে গেছেন!

পরমেশ পরিহাসসুলভ কণ্ঠে প্রশ্ন করে—কি, জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী নাকি?

রস্মিতার গাম্ভীর্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না, ও বল্‌লে—তুমি যা খুশি তাই বলতে পারো, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা এ ভাবে হাল্কা ক'রে নেওয়া সম্ভব নয় পরমেশ। যে মানুষকে আমি জীবনের সব কিছুর উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছি তাকে নিয়ে নিজে ত তামাসা করতেই পারি না, আর কেউ করলেও তা সহ্য করা শক্ত আমার পক্ষে।

—কিন্তু সান্ত্বনা, তুমি মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করো তো?

—অবশ্যই করি।

—তাহ'লে ডাক্তারকে বিলেত থেকে ফিরতে দাও। তারপর তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে—!

—পরমেশ তুমি বড্ড ছেলেমানুষ রয়ে গেছো! তাঁর দেশে ফেরা-না-ফেরা নিয়ে আমার বর্তমান-ভবিষ্যত কি চুপ ক'রে থাকতে পারে? জীবনটা সময়ের চাবুক খেয়ে চল্‌ছে সব সময়ের জন্য। সময়ের গতি পানা-পুকুরের মত বাঁধা থাকতে পারে কি!

—তবে যা ভালো বোঝো করো। তোমার ওই ছকের এলাকায় আমার স্থান নেই, অতএব সে আলোচনায় আমাকে জড়াও কেন?

—প্রয়োজন আছে তার। উনি যাবার আগেই একটা নিষ্পত্তি করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু আমি তখন সময় চেয়েছিলাম।

—অর্থাৎ?

—বলি, বলি ক'রে এতদিন সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি।

—সঙ্কোচ? কার কাছে—

পরমেশ রীতিমত বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল।

রমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির মৃদু স্ফুরণ, ওর জাফ্‌রান ফুলের পাপড়ির মত পাতলা ঠোঁটকে কাঁপিয়ে দিল। রমিতা বল্‌লে—সে কথাটা জান্‌তে চেয়ো না।

পরমেশ রমিতার চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে বলল—কই তুমি চা খেলে না?

—না, আজ ঠাণ্ডা একটা কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

পরমুহূর্তে রমিতা জিজ্ঞাসা করল—পরমেশ, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

চমকে উঠল পরমেশ, কিন্তু রমিতার কথার জবাব দেবার সময় অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বল্‌ল—তুমি কি সে রকম কোনো প্রয়োজন বোধ করছ?

—না, উনি সেই রকম ছকই—

—ও, তাহলে ওঁর অভিপ্রায়ে তোমার এই দাক্ষিণ্য!

—না, আমিও অনেক ভেবে দেখেছি! এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

পরমেশ রমিতার চায়ের পেয়ালাটা করতলগত ক'রে জবাব দিল—তার আগে তাঁকে দেশে ফিরতে দাও। দেখি যদি উনি ডরোথিকে শাড়ি পরিয়ে এনে হাজির করেন, তখন ধীরেসুস্থে বিয়ের কথা ভাবা যাবে।

রমিতার মাথার মধ্যেটা বিদ্যুতের ধাক্কায় অবশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ও বল্‌লে—অবশেষে একজনের সম্বন্ধে তোমার ঈর্ষা দেখে অনুমান হচ্ছে অনুভূতিশীলতা তোমার এখনও রয়েছে। কিন্তু পরমেশ, ডাক্তারের সম্বন্ধে তোমার এই রকম কঠিন কথা আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই। তিনি জীবনকে কর্মের পথে চালিত করেছেন। তাঁর মনে আমারও স্থান আছে, ডরোথিরও আশ্রয় আছে—কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে কর্মের আবেদন।

—আমার মন অন্য কথা বল্‌ছে। জানো তো আমি মানুষটা বড় সন্দেহবাদী! আমি ভাবছি, ডাক্তার বুঝে উঠতে পারছে না,— রমিতা, না, ডরোথি, কাকে ও বেশি আপনার ক'রে পেতে চায়। একদিকে প্রথম প্রেমের উন্মেষের মর্যাদা, আর একদিকে তার নূতন ক'রে ফিরে পাওয়া

বাসন্তী হাওয়ার সান্ত্বনা !···এই দোটানায় পড়ে' ডাক্তারের মত আদর্শবাদী মানুষ কি করে, তার শেষটুকু দেখবার বাসনা আমার রয়েছে !

পরমেশের এ কথায় রমিতা খুব খুশি হ'তে পারল না। ও বল্‌লে—তুমি কি বল্‌তে চাও, স্পষ্ট ক'রে বলো তো !

—আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওখানে গিয়ে ডরোথির সঙ্গে যখন দেখা হবে,—কিম্বা এতদিনে নিশ্চয় হয়েছে, তখন ওর মন নরম হয়ে উঠবে বা এত দিনে উঠেছে।

—খুব ভালো কথা !

—না, অতটা সহজ ভালো নয়। কোনো মানুষই একজনের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ কি না, ওখানে গিয়ে ডরোথির কাছে বসে তোমার কথা মনে পড়বে ডাক্তারের।···তারপর ডিগ্রি পকেটে ক'রে হয়ত সে একলাই দেশে ফিরবে, তখন যদি ছাখে তুমি তারই ছককাটা পথে বিয়ে-থা ক'রে বসে আছো, তখন একটুও খুশি সে হবে না। আর এটাও ঠিক যে, তুমিও তখন নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং— এবারে ভেবে ছাখো দেখি, আমি বেচারী তখন কি বেকায়দায় পড়ে যাবো।··· তোমার আর কি, ভুনম্বর বিয়ে নাকচ ক'রে তিন নম্বর করবে। আর আমি ?

রমিতা সেখানে বসে থাকতে পারল না। উঠে যাবার সময় বল্‌লে অস্ফুট স্বরে—উঃ, জীবনে কোনোদিন সিরিয়াস হ'তে পারলে না তুমি পরমেশ !

পরমেশ সে কথার জবাব দিল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার রিং তৈরী করতে সে ব্যস্ত।

নিজের ঘরেই রমিতা ললিতাকে রেখেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে চেয়ারে পরমেশ বসে ললিতার মাথায় ব্যাণ্ডেজ ক'রেছিল সেই চেয়ারে বসে রমিতা অচেতন মেয়েটিকে দেখছিল। মেয়েটির সীমন্তের সিঁদুর অম্লান—সেই দিকেই রমিতার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এক সময়ে পরমেশ ঘরে এসে বল্‌ল—আমি এখন বাড়ী যাবো ?

—যদি বোঝো এখানে আর দরকার হবে না তোমাকে, তাহলে যাও।

—দরকার পড়লে ফোন করে দিও! মনে হচ্ছে তেমন জরুরী কোনো প্রয়োজন হবে না।

রমিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—চলো ওঘরে।

এ ঘরে এসে পরমেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রমিতা বল্‌লে—পরমেশ, আমি খুব ভেবে চিন্তে তোমার কাছে যে কথাটা বল্‌লাম সেটা হাল্কা নয়। তুমি একটু চিন্তা করে দেখো।

—কিন্তু সান্ত্বনা আর ছেলেমানুষী খেলার দিন তোমার নেই, আমারও নয়।

—তার মানে?

—জীবনটাকে ভাড়াটে ট্যাক্সির মত অপরের নির্দেশ মত যেদিক-সেদিক চালাতে যেয়ো না। তোমার নিজস্ব চিন্তাকে স্বীকার করে নাও।

—একবার নিজস্ব চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে অনেকগুলো দিনের আলো বাজে-খরচ করেছি। জীবনটা ত প্রশান্ত মহাসাগরের জলরাশির মত অতল, অসীম নয়—মানুষের আয়ুর পরিমিতি আছে, যৌবনের আয়ু আরও ছোট, তাই জীবনকে একটু গুছিয়ে পাওয়ার কামনা যদি করি ত ভুল কি থাকতে পারে তাতে?

—কে বল্‌লে বাজে খরচ! ওটারও দরকার ছিল। নিজেকে আবিষ্কার করার সাধনাই ত জীবনের একমাত্র সার্থকতা! আমি গুরুবাদী নই—

—জীবন ত একটা গবেষণার তত্ত্ব নয় পরমেশ। এতদিন যা করেছি তা চুকে গেছে. আজ আর ওসবে তেমন রস পাইনে। ওর মধ্যে নিজের দেখা পাই নে, যাকে পাই তার মুখোশটাই বড়. মুখও নেই, শ্রী-ত নেই-ই!

—খ্যাতির নেশা আছে, যশের মাদকতায় মন দুলে ওঠে, রূপোর ঝন্‌-ঝন্‌ ঝন-ঝণাৎ শব্দ শুনতেও খারাপ লাগে না—কিন্তু এসব কিছুই যেন আমার নয়। চিত্রাঙ্গদার মনের যে বেদনা অর্জুনের প্রেমসুধার আস্বাদে গুমরে উঠ্‌ত আমার মধ্যেও সেই ব্যথা কেঁদে ফেরে। এ বেদনা ব্যক্তিত্বের বেদনা, মন দিতে চাওয়ার আকুলতা, পরমেশ। মন বলে, এ যে আমি নই, আমাকে এরা কেউ দেখতে পায় না, চায় না—এরা রূপের কাঙাল! এখানে রূপাতীত আমি'র

আশ্রয় নেই। একদিন যে যৌবনের অস্ত্র নিয়ে গর্বিতা ছিলাম আজ সেই অস্ত্রের আঘাত যেন আমাকেই চূর্ণ ক'রে দিতে উদ্যত হয়েছে।

—খুব ধারালো তলোয়ারও একদিন ভোঁতা হয়ে যায়, এই আশঙ্কা না কি?

—না, সে সময় এখনও আসে নি। সেদিক দিয়ে আক্ষেপ করতে হবে না তোমায়।

পরমেশ স-রবে হেসে উঠ্‌ল। এতক্ষণের থম্‌থমে পরিবেশ এই হাসির প্লাবনে যেন ধুয়ে হাল্কা হয়ে গেল।

রমিতা উৎকর্ণ হয়ে ফিরে তাকাল—মেয়েটি যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে।

ওরা দু'জনে পুনরায় রোগিণীর কাছে ফিরে গেল।

ললিতা অল্প তিন চার দিনের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ল। ইতিমধ্যে নফরকে খবর দিয়েছিল পরমেশ ট্যাংরার বস্তিতে গিয়ে। নফরও রোজ সন্ধ্যার সময় দেখে যাচ্ছে নিয়মিতভাবে।

আজ ললিতা ঝোঁক ধরে বসল—দিদিমনি আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে, আর আমিও বেশ ভালোই আছি ত—

রমিতা কমলালেবুর রস করতে করতে বল্‌লে—আমার কষ্টের কথা তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি ভালো হয়ে সেরে ওঠো, তারপর না হয় আমাকে যত্নআত্তি ক'রে শোধ দিয়ে বাড়ী ফিরো।

ক্ষীণ হাসিতে ললিতার পাংশু মুখখানা একটু সজীব দেখাচ্ছে, ও বল্‌লে—আমি কি আপনার মত লেখাপড়া জানি যে, ভালোভাবে সেবা করতে পারব? আমি অজ মুখ্যু দিদিমণি! আপনার হাতের সেবা নিতে কেমন লজ্জা করে।

—তাই বুঝি চলে যেতে চাচ্ছ?

—না, তা নয়, এই আজ বাদে কাল রবিবার ওর কারখানার ছুটি আছে, যদি কাল আমার না-যাওয়া হয় তবে আবার সাত দিন এখানে আপনার—।

বল্‌তে বল্‌তে রমিতার মুখের পানে তাকিয়ে ললিতার কি মনে হ'ল, ও বল্‌লে—না, আপনার কষ্ট যা হবে তা ত হবেই! কিন্তু ওকে সেই সাত-

সকালে নিজের হাত পুড়িয়ে খেয়ে যেতে হচ্ছে ত। ওদিকে অনিলাদি যদি থাকতেন তাহলেও অতটা ভাবনা ছিল না, অনিলাদিকে ত ওরা হাজতে রেখেছে,—আবার বিপদের ওপর বিপদ, সেদিনের সেই হাঙ্গামার পর থেকেই অনিলাদির মায়ের জ্বর হ'য়েছে। এই সব ভেবেই আরও আমার এখানে থাকতে মন সরছে না।

রমিতা সব খবরই নফরের মারফতে শুনেছে। দুদিন আগেই যাদের কাউকেই ও চিনত না আজ হঠাৎ সেই নফর, ললিতা, অনিলাদি তার মা, এদের প্রত্যেককেই যেন অনেক কালের পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওর। এদের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার সঙ্গে রমিতার আবেষ্টনীর বিশেষ কোনোই যোগাযোগ থাকবার কথা নয়, তবু এই মুহূর্তে এই অসম্ভবটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রমিতাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ললিতার মনে একটু ভরসা হ'ল, ও বল্‌ল—তা হ'লে আজ বিকেলে ওকে বল্‌বেন ত নিয়ে যাওয়ার কথা!

হঠাৎ রমিতা ঘাড় নেড়ে ঘোরতর অসম্মতি জানাল—না, সে আমি পারব না। তোমার ওই কোমর আর তলপেটের যন্ত্রণা যতদিন না কমছে তত-দিন আমি যেতে বল্‌তে পারি না। ইচ্ছে হয় তুমি ব'লো!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ললিতা পাশ ফিরল। ও জানে, ভালোভাবেই জানে যে রমিতার সম্মতি ছাড়া ললিতার এক পাও নড়বার উপায় নেই।

কারণ এই ক'দিনেই নফরচন্দ্র রমিতার কথা বেদবাক্যের মত মেনে চলেছে, তা ললিতার মত বোকা মেয়েও বুঝতে পেরেছে। অবশ্য ওর বিশ্বাস রমিতার কথার অবাধ্য হওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—কী যেন একটা যাদু জানে এই অপরূপ রূপসী মেয়েটি।

রমিতা বল্‌লে—রাগ ক'র না ললিতা! তোমার মাথার জন্তে আমি একটুও ভাবছি না। মাথার ঘা শুকিয়ে যাবে চট ক'রে, কিন্তু এই যে কোমরের সাংঘাতিক যন্ত্রণা, তার ফল কি হবে বলা খুবই কঠিন। মেয়েদের এই অবস্থায় আঘাত লাগ্‌লে জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। তুমি ছেলেমানুষ এ সবের কি বুঝবে!

ললিতা নিজের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বল্‌ল না কিছুই।…একটি দিনের কয়েক মুহূর্তের হঠকারিতায় আবার ওর মাতৃত্বের স্বপ্ন বুঝি বা স্বপ্নেই অবসিত হয়ে যাবে। প্রথমবারের ধাক্কা ভালো ক'রে সাম্‌লে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে আবার নূতন ক'রে দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের পথে আকস্মিক এই দুর্ঘটনা যেন ওর জীবনকে বিস্বাদ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেবারও এইরকম যন্ত্রণাই হ'ত! তীব্র তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত একটা কিছু তলপেটের মধ্যে প্রচণ্ড তাণ্ডবে ছুটে বেড়াচ্ছে—উঃ—উঃ!

রমিতা চেয়ারে বসে ভাবছে। কত ছোট জীবনের আবেষ্টনী এই ললিতার কিন্তু তবু কেমন ভরপুর ওর মন। কোথাও কোনো অভাবের উৎপীড়ন ললিতাকে স্পর্শ করে না—ললিতার মুখের অসহায় পরম নির্ভরশীল ভাবটুকু ওর ভারী ভালো লাগে।

অনেকক্ষণ পরে রমিতা নিজের মনেই মাথা নেড়ে বল্‌লে—আর হয় না।

সেদিন এয়ার-মেলে প্রভঞ্জনের চিঠি এলো। অল্প কথায় গুছিয়ে অনেক কিছুই লিখেছে প্রভঞ্জন। প্রথমেই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ।—এখানে এসেই এতরকম কাজের মধ্যে পড়ে গেলাম যে অবশ্য পালনীয় অনেক ক'টি কাজের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাই নি। ডরোথির কাউন্টিতেও মাত্র এই পরশুদিন গিয়েছিলাম। এখানে খুব ভালো লাগ্‌ছে। এখানকার চিকিৎসার ধারায় সত্যিই শিখবার অনেক কিছু আছে। সব চেয়ে বেশি নজরে পড়ে, প্রত্যেকটি রোগীকেই যথেষ্ট যত্নসহকারে পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়। মানুষকে যথার্থ মানুষের মর্যাদা যারা দিতে পারে একমাত্র তাদেরই চিকিৎসায় অধিকার আছে, সেকথাটা এতদিন পরে নতুন ক'রে বুঝতে শিখলাম।

সত্যি কথা বল্‌তে কি, ইচ্ছে করছে এই স্টেটভিস্টক্ ক্লিনিকের কাজের ছাঁচটা নিয়ে গিয়ে আমাদের দেশে বসিয়ে দিই। শুধু চিকিৎসার কথাই বা কেন, সেবাশুশ্রূষার দিক দিয়েও এখানকার রোগীরা ভাগ্যবান। এ দেশের লোকেরা হাসপাতালে ভর্তি হতে পারলে খুশি হয় কেন তা এখন ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।

ডরোথির ছোট চিকিৎসাকেন্দ্রটি চিত্তাকর্ষক। ওকে অনেকদিন পরে দেখলাম, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের সেই ছাত্রীটি এখনও তেমনি তীক্ষ্ণ এবং নিষ্ঠাপরায়ণা। তবে, কোথায় যেন সুরের সাড়া পেলাম না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওর কৌতূহলের শেষ নেই, কিন্তু সেটা কেমন বৈদেশিকতাপূর্ণ। মহাত্মাজীর কথা অনেকবার বল্‌ল ও। বল্‌তে বল্‌তে চোখ জলে ভ'রে গেল—'The only man after Tagore.' ও বল্‌লে, 'ভারতবর্ষে এখন আর কে রইলেন? জহরলাল, 'That dreamer!' শেষে বল্‌লে, 'অবিশ্যি গান্ধীজী আর বেশিদিন বেঁচে থাকলেই বা কি হ'ত, ওঁর কথা কে-ই বা শুনছিল? বরং এ যেন অসুখে ভুগে মরার চেয়ে অনেক বেশি Dramatic end হ'ল!' আমাকে ও খুবই আদরযত্ন করেছে। তবু মনে হচ্ছে যে-সমুদ্রটা পেরিয়ে এসেছি সেটা মানসিক দিক দিয়ে পার হওয়া যায় না—দুটি মনের মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান যে এত দুস্তর সেকথাটা সমুদ্রপারের বিশেষ একটি কাউকে না জানিয়ে পারছি না।...দোষটা হয়ত আমারই মনের। আমি ভারতবর্ষকে এখান থেকে বড়বেশি অনুভব করছি।

সে যাক, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত মনের ঢেউ ওঠাপড়ার খবর ছাড়া পৃথিবীতে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ আছে।...এবার ফিরে গিয়ে মনের মত একটি হাসপাতাল গড়ব। যতটা জোর ক'রে বল্‌ছি বাস্তবে অতটা জোরালো কিছু না-ও ঘটতে পারে। তবু চেষ্টা করব। একটা কিছু দিয়ে জীবনের বাঁচাটা সার্থক না করলেই চলবে না। পরমেশের এবার পাশ করা চাই। তাকেও দরকার আমার।...

পরমেশ আসতেই রমিতা প্রভঞ্জনের চিঠির কথা জানাল। তার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত আর কোনো কিছুই রমিতার মনে স্থান পায় নি। একা একা নিজের মনেই তোলপাড় করেছে সারাটা দিন। পরমেশকে হাতের কাছে পেয়ে গিয়ে রমিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনের কথা সব সময় মনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকার জন্ত নয়। মুক্তির আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায় এমন মনের কথাই কি কম!

পরমেশ সব শুনে বল্‌লে—কি ললিতা বোনটি তোমার কি মত!

যদিও ললিতা পাশের ঘরে শুয়েছিল, অকস্মাৎ পরমেশের এই দিল্‌খোলা কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হয়ে উঠে এল।

ললিতাকে উঠে আসতে দেখে রমিতা ব্যস্তভাবে বল্‌ল—এ কী, তুমি উঠে এলে, কি আশ্চর্য! না তুমি কাজটা ভালো করো নি ললিতা। চলো শোবে চলো। তোমার না ওঠা-হাঁটা একদম বারণ!

পরমেশ বাধা দিয়ে বল্‌ল—আহা ওকে আর বিছানার সঙ্গে অমন সেঁটে রেখো না, বেচারী! এস ললিতা।

রমিতা ধমক দিল—রাখো তোমার ছেলেমানুষী! ওই জন্তেই বুঝি তোমার পাশ করায় না। চলো ললিতা শোবে চলো।

পরমেশ স্খলিতকণ্ঠে বল্‌লে—অন্ধ নাচার বাবা! আচ্ছা, এবারে দেখে নিয়ো, এবারে আমি আর ধপাস করে পড়ে থাকব না, নির্ঘাৎ পাশ করবই। প্রভঞ্জন সরকারের সাকৃরেদীর লোভ সোজা নয়।

অগত্যা রমিতার কাঁধে ভর দিয়ে ললিতাকে বিছানায় গিয়ে শুতে হ'ল।

পরমেশও ঘরে এসে বসল।

রমিতার চোখে মুখে উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তি এতই সুস্পষ্ট যে পরমেশ আর তা নিয়ে তামাসা করতে ভরসা পেল না। সে চুপ ক'রে চেয়ারে বসে দেওয়ালের এক কোণে আশ্রিত একটি টিক্‌টিকির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ভাববার চেষ্টা করছিল বোধ হয়। টিক্‌টিকিটা অনেক দিন এ ঘরে বসবাস করছে।

রমিতা বিছানার একপাশে বসে বল্‌ল—পরমেশ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। হয়ত সেটা শুন্‌লে তুমিও হেসে উড়িয়ে দেবে।

দেওয়ালের দিকে আগের মতই তাকিয়ে রইল পরমেশ, তবে তার জবাব এল—আমার হাসিতে তোমার কথার উড়তে ভারী গরজ! এতটুকু নড়চড়ই হবে না, তোমার কথা যে ভারী দামী!

—ভাখো, আজকাল বড্ড বাঁকা বাঁকা কথা শোনাও তুমি! ছেলেমানুষী রেখে দয়া ক'রে সিরিয়াস হও দু'মিনিটের জন্তে।

সোজাসুজি সাম্‌নে ঘুরে বসে বল্‌ল পরমেশ—বেশ, বলো।

—না, তুমি আমাকে ইদানীং অবজ্ঞা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হও না। কেন, তা জেনে আমার লাভ নেই। তবু আজ একথা একমাত্র তোমাকেই বল্‌তে পারি।

—বেশ ত বলো। তবে আর বেশি বলো না, দেখচ ত বল্‌বার আগেই আধমরা করলে। অনেক দুঃখেই মেয়েদের নাম অবলা রেখেছিল।

—আবার ?

—না, এই কিছু না বলে চোখ রাঙিয়েই অবলারা অমিত বলের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

—আচ্ছা তাহ'লে তুমি এইসবই করো, আমার কাজ আছে, চলি।

—পাগল হয়েছো। আজও তুমি আমার মুখের কথা শুনে মনের হিসেব কষতে চাও। জানো তো চিরকাল এই সদর-অন্দর অভ্যেসের জন্তে আমার দুঃখের শেষ নেই!

রমিতা বল্‌লে—আমি ভাবছিলাম ডাক্তার সরকারের হাসপাতালে একটা নার্স হতে গেলে তার আগে কি কি করতে হবে!

পরমেশ বিস্মিত হ'ল—দাঁড়াও ডাক্তারের হাসপাতালই হোক আগে!

—হাসপাতাল হবেই, তাতে ভুল নেই। ততদিনে যদি খানিকটা শিখে নিতে পারা যায় তাহ'লে কাজের সুবিধে হবে অনেক।

—অবিশ্যি ডাক্তার এমন একটা মানুষ যার পক্ষে মন্ত্রের সাধন সত্যিই সম্ভব। সেদিক দিয়ে তুমি ঠিকই বলেছো। তবে আমার মনে হয় তোমার ওসব দিকে না যাওয়াই ভালো!

—কেন ?

—কোনো দিন অভ্যেস নেই। তা ছাড়া—

—অভ্যেসটা চিরকাল অভিনয়েই ছিল কি ?

—দুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা রাজ্য।

—হোক না তা, একটা পৃথিবীরই মধ্যে ত দুটো রাজ্য—পৃথিবীর বাইরে ত নয়।

—ভাখো, খামখেয়ালেরও একটা হিসেব-হদিস আছে।

—এতে তুমি খাম্‌খেয়ালে বল্‌লে !

—কিন্তু সত্যের খাতিরে ব্যথা দিচ্ছি বলেই ব্যথা দেওয়াটা আমার পক্ষে এত সহজ, বুঝলে ! নার্স হওয়ার সখ তোমার দু'দিনে ঘুচে যাবে।

—আমার পক্ষেও তোমার এই সত্যের খাতিরটা উল্টে দেওয়া আরও ঢের বেশি সোজা। আমারও জীবনে কিছুটা সত্য আছে যে !

—তা না হয় মেনে নিচ্ছি। নার্সিং শেখাটা হয়ত তোমার পক্ষে কঠিন কিছু নয়, কিন্তু ওটাকে নিজের ব্রত ব'লে সারা জীবনের মত গ্রহণ করা কি সম্ভব !

— কেন নয় ?

—পূর্বাপর আত্মবিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবে। ভাবালুতা আর সেবাশুশ্রূষা একপথে চলে না।

—আমি যদি বলি যে, সেসব ভেবে দেখেই এ সংকল্প করছি।

—আরও গভীরে ডুব দিয়ে ছাখো।

—দেখেছি, ভাঙনের পালায় আবর্জনার স্তূপ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়, ধূলো আর পুরনো চামচিকের উৎপাতে দৃষ্টি বাধা পায়। কিন্তু সেদিক ছাড়াও যে একটা বড় দিক সব সময়ের জন্যে খোলা মাঠের মত পড়ে থাকে সেই দিকেই আমার পা বাড়িয়ে দিতে চাই।

পরমেশের কণ্ঠে সংশয়ের শ্লেষ—তোমার চোখেমুখে চেহারায় যে বৈষ্ণবীর সেবাব্রতের তৃষ্ণা, ভ্রসংস্থার রসকলির বঙ্কিম রেখা সান্ত্বনা. ভিক্ষের [illegible] ভেক নিতে গেলে পরে অনুতাপ করতে হবে না ত ? ভিক্ষে যদি না মেলে ?

রমিতা এগিয়ে এসে পরমেশের একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে বল্‌ল—কেন ! কেন এই অবিশ্বাস বল্‌তে পারো ! পরমেশ, তোমার সঙ্গে ত কোনো দিন ছলনা করি নি !

রমিতার চোখের কোলে শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ মেঘের প্রতিপাত হয়েছে যেন। রমিতা বল্‌ল—একদিনের জন্যও বলি নি ত, তোমায় আমি ভালোবাসি তবে কেন এত ঘা মারছ ?

পরমেশ বল্‌লে—এতদিন ত সেই ভরসাতেই নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু সেদিন যখন ভয় দেখালে, বিয়ে করবে আমায়, সেই থেকেই কেমন

যেন এলোমেলো ঠেকছে দুনিয়ার চেহারাটা। কেন, ও কথাটা না বললে হ'ত না?

স্তম্ভিত কণ্ঠে রমিতা যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়েই বললে—যদি বিয়ে করি তবে ক্ষতি কি! যদি এমন হয়, তুমি আর আমি দু'জনেই ডাক্তার সরকারের হাসপাতালে থাকি।

—সে ত এমনিতেও থাকতে পারি! তার জন্যে বিয়েটা বাহুল্য।

—না, বাহুল্য নয়। আমি তার পাশে পাশে চলতে পেলেই খুশি, পায়ে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে বাধা হতে চাইনে।

—বুঝেছি। কিন্তু এভাবে তুমি প্রত্যেককে ঠকাতে চাও কেন, লাভ কি?

—লাভ, সত্যকার কাজের লোকের পথে বাধা না হয়ে প্রেরণার উৎস হবার স্পর্ধা করা।

—অর্থাৎ অঙ্কের হিসেবের মত ছকে ফেলে জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া।

—সে তুমি যাই বলো না কেন আমার আপত্তি নেই—

—কিন্তু বিপত্তির পথ কেউ অঙ্ক কষে আজও পর্যন্ত বন্ধ করতে পারেনি সান্ত্বনা।

তা ব'লে চেষ্টা করব না? আর, এখানে আমি ত দেখতে পাচ্ছি ওঁর মত মানুষের কাছে এসব পৌঁছায় না।

—তাই যদি বলো, তবে 'তুমি আছো—আমি আছি' যেমন, তেমনি থাকাই ভালো।

—কিন্তু আমাকে নিয়েই যত ভয়। যদি কোনো দুর্বল মুহূর্তে তাঁকে নামিয়ে আনি, এই আশঙ্কা!

—ওসব বাদ দাও। মানুষের মনটাই যদি বড় বলে স্বীকার করো তবে বাইরের বেড়া দিয়ে মিথ্যে নিজেকে ঠকানোর অর্থ হয় না। তুমি এত বোঝো আর এটুকু কাটিয়ে উঠতে পারছ না? আমি বলি কি, যেমন আছো তেমনি থাকো।

রমিতা শূন্য দৃষ্টিতে পরমেশের মুখের পানে চেয়ে রইল। পরমেশ বললে— চলো অনেকদিন ঘরে আটকা পড়ে আছো—বেড়িয়ে আসা যাক চলো।

রমিতা সেকথারও কোনো উত্তর দিল না।

ললিতা যে ওদের খুব কাছাকাছিই রয়েছে একথাটা পরমেশ বা রমিতা কারুরই খেয়াল ছিল না। ওদের একটু চুপ করে থাকতে দেখে ললিতা যখন ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল 'ক'টা বাজল' তখন ওরা উভয়েই যেন একটু অপ্রতিভ হ'ল। পরমেশ বলুল—সাড়ে পাঁচটা।

রমিতা বলুল—আজ ত শনিবার, নফরের এতক্ষণে আসার কথা।

ললিতা যেন এই কথাটাই বলুতে চাচ্ছিল, রমিতার মুখে কথাটা শুনে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রমিতার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলুলে—কি জানি, হয়ত ওপরটাইম খাটতে হচ্ছে। কারখানার মালিকদের মর্জি দিদি, তুমি ওর জন্যে ভেবো না। ছুটি পেলেই সে গুটিগুটি এখানে এসে হাজির হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ললিতা কয়েকবারই নিজে থেকে রমিতাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—অমন এক একদিন রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত ওপরটাইম খাটতে হয়। প্রথম প্রথম আমারও ভাবনা হ'ত, কলকাতা শহরে কখন কি হয় কে বলুতে পারে,—তারপর, বুঝলে দিদিমণি আস্তে আস্তে সয়ে গেল। আজকাল আর মোটেই ভাবনা হয় না। আগে হ'লে এর মধ্যে তিনবার বড় রাস্তার মোড় অবধি দেখে আসা হয়ে যেত—মানুষটার ব্যাপারখানা কি! তাই বলুছি দিদিমণি ভাবনার কিছু নেই।

অবশেষে রমিতা বলুলে—তুমি অত উতলা হয়ো না ললিতা। আমার মনে হচ্ছে তোমার সেই অনিলাদির মায়ের অসুখ হয়ত বাড়াবাড়ি হয়েছে, তাই নফর তাঁকে ফেলে আস্‌তে পারছে না।

নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল ললিতা—হবেও বা!

প্রায় পৌনে ন'টার সময় নফর শুকনো মুখে এসে হাজির। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ পেল যে, যেহেতু নফর অনিলার পাশের ঘরের ভাড়াটে সেহেতু তাকে বিপ্লবী সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাকে বিশেষ কোনো একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে নানাবিধ জেরায় যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন দেশের শৃঙ্খলাও শান্তিরক্ষকেরা দাবি করলেন—'অনিলা সেন সম্পর্কে

যা যা জানো বলো—'সেক্ষেত্রেও নফর আশানুরূপ কিছু খবর দিতে পারল না। তখন কর্তারা বল্‌লেন—'একেবারে পাকা ঘুঁটি। সোজা পথে হবে না—র'স তোমার যাতে ভাত না জোটে এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিছু জানো না যদি, তবে ওই অনিলা সেনের মায়ের অসুখে তোমার অত মাথাব্যথা কেন?' নফর সরলভাবেই জবাব দিয়েছিল—'উনি না হয়ে যদি আপনি আমার পাশের ঘরে থাকতেন তাহলে আপনার বিপদেও দেখতে হ'ত বই কি!'

এইসব জেরার ধাক্কা সামলাবার পরই নফরের ভাবনা হয়েছে ললিতাকে নিয়ে। এ বাড়িতে পদার্পণ করেই রমিতাকে দেখতে না পেয়ে সে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল।

ললিতা বল্‌ল—এই এতক্ষণ বসে থেকে থেকে উনি একটু বেরুলেন। ওনার আর কাজ থাকতে নেই, দিনরাত ত তোমার পরিবার আগলেই বসে রয়েছেন ক'দিন।

নফর বল্‌লে—তা ত সবই জানি, তোমার সুভাগ্য বল্‌তে হবে। মানুষ ত নন দেবী! আমাদের সাধ্যি ছিল না এমন ক'রে চিকিচ্ছে করানোর। তা তিনি কখন ফিরবেন্ জানো?

—বেশি দেরি করবেন না নিশ্চয়, তাঁর কর্তব্যের হুঁস আছে।

নফরের আর বেশি কথা বল্‌তে ভালো লাগছে না। সে গলা খাটো করে বল্‌লে—এটা বিড়ি ধরাবো? বুড়ো কর্তা আবার এসে না পড়ে।

দ্বাদশীর দিন প্রভাতে গঙ্গাস্নান ক'রে এসে পূজার্চনার পর নাতিনাতনীদের হাতে প্রসাদ দিয়ে তারপর চমৎকারিণী জলগ্রহণ করেন। আজ দ্বাদশী। সকালে নীলাম্বর এবং শচীন মাষ্টারমশাই-এর কাছে পড়তে পড়তে ইতিমধ্যে দু'এক বার দিদিভাই-এর ঠাকুর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে খোঁজ খবর নিয়ে গেছে। লিলি নিজের তিনটি পুতুলের সংসার নিয়ে খুব ব্যস্ত—নিজের মনেই সে ছোট মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার জন্য ন্যাকড়া পেতে বিছানা ক'রে রেখেছে। এখন দুধ খাওয়াচ্ছে—দুধ না খাইয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো

চলে না। লিলির কল্পিত মেয়ের দুষ্টুমীর আর অন্ত নেই, সেজন্য মাঝে মাঝে খুব ভারিক্কি গলায় ধমক দিচ্ছে লিলি—'আ রে মেয়ে!' যেমন ক'রে লিলির মা লিলিকে শাসন করে থাকে, কতকটা সেই ধরনের গলার আওয়াজ করছে লিলি। ওদিকে পার্বতী রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত। আজকাল পার্বতীর মন যেন অনেকটা সুস্থ হয়েছে। জয়ন্তকে ব'লে ক'য়ে পার্বতী কলকাতায় কিছুদিন থাকবার মেয়াদ আদায় করে নিয়েছে। দেশে ফিরে যাবার সময় জয়ন্ত শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলে গেছে—"আপনি যতদিন ইচ্ছে রাখুন না মা—আপনারই ত মেয়ে!"

চমৎকারিণী প্রায়ই বলেন—ভাগ্যিস তোরা আছিস পারু, নইলে একা এ বাড়িতে আমি দম ফেটে ম'রে যেতাম।

পারু গদগদ কণ্ঠে উত্তর দেয়—ওসব কথা বলো না মা! তোমার মেয়ে হয়েও গরীব ব'লে কতটুকুই বা করতে পারছি।

এমনি ক'রে একটা নিবিড় শান্তির মধ্যে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। যদিও এর মধ্যে প্রভঞ্জনের অনুপস্থিতিটা কেউ ভুলতে পারে না—তবু এই অভাব-বেদনা পরস্পরের মনে থাকার ফলে অন্তরঙ্গতা যেন নিকটতর হয়েছে।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে চমৎকারিণী ডাকলেন—লিলি!

উত্তর এল—কি বল্‌ছ দিদিভাই—আমি কাজ করছি যে!

—এস আগে আমার কাজটা উদ্ধার ক'রে দিয়ে যাও দিদিমণি! দাদাদের ডেকে আনো।

দুমিনিটের মধ্যে কোলাহল কলরবে নিশ্চুপ বাড়িটা যেন জেগে উঠল।

সেদিন দুপুরে দু'খানি চিঠি এলো—একখানি পোষ্টকার্ড জয়ন্তর, আর একখানি বিলেতের মেল প্রভঞ্জনের।

জয়ন্তর পোষ্টকার্ডখানাই চমৎকারিণী আগে পড়লেন। জয়ন্ত খুব দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছে যে, সে বেশ বুঝতে পারছে নীলাম্বর, শচীন এবং লিলিকে কাছে রাখতে না পেলে চমৎকারিণীর খুবই কষ্ট হবে, তবু নিরুপায় হয়েই সে তাদের পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছে। পার্বতী দীর্ঘদিন মায়াকোলে না থাকার ফলে সেখানকার সংসারের সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তা ছাড়া এই অনিত্য সংসারে যখন কেউই চিরকাল বেঁচে থাকে না, তখন চমৎকারিণীই বা মেয়েকে নিজের কাছে আটকে রাখতে চেষ্টা করছেন কেন! অতএব এই পত্র টেলিগ্রাম মনে ক'রে চমৎকারিণী যেন অবিলম্বেই নীলাম্বরদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। বর্ত্তমানে জয়ন্তর ছুটি পাওয়ার আশা নেই, কাজেই কম্পাউণ্ডার বাবুকে দিয়ে যেন নীলুদের পাঠানো হয়।

প্রভঞ্জনের চিঠি খুব ছোট—কুশল সংবাদ ছাড়া বড় বেশি কিছু নেই। ডরোথির কথা একটু আছে,—ডরোথির হাসপাতাল খুব সুন্দর। সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থাও চমৎকার। ডরোথি চমৎকারিণীর শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেছে। আর একটা কথা—ডরোথি নাকি প্রভঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—প্রভঞ্জনের বৌ নিশ্চয় দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। ক'টি ছেলেমেয়ে হয়েছে তাও জিজ্ঞাসা করতে ডরোথির ভুল হয়নি!

চমৎকারিণী পার্বতীকে ডেকে বল্লেন—তা হলে গোছগাছ করে নাও!

পার্বতী বল্ল—কেন মা? এর মধ্যেই অত ব্যস্ত হচ্ছে কেন! তোমার জামাই লিখেছে বলে সঙ্গে সঙ্গে হুজুর—হুজুর করে দৌড়ে যেতে হবে? দাদা আগে আসুক!"

—না মা, মিথ্যে একটা অশান্তি ক'রে কি হবে! সে যখন সব জেনেশুনেই তোমার পাঠানোর কথা লিখেছে তখন আমার আটকানো উচিত নয়। বেশ ত এখন যাও, তারপর যদি পারো তাদের মত নিয়ে আবার আসতে পারো এসো!

—হুঁ, একবার সে গোয়ালে ঢুকলে—দু'চার বছরের মধ্যে যে বেরুনো যাবে না তা তুমিও ত জানো মা! তার চেয়ে তুমি লিখে দাও, তোমার শরীর খারাপ। আর এই সেদিন ছেলেদের জন্যে মাষ্টার রাখা হ'ল, এখানে থাকার মত সব উজ্জুগ-আয়োজন হ'ল—এরই মধ্যে যাওয়া হবে কি ক'রে।

চমৎকারিণী একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—না, তোকে আর ফাঁপরে ফেল্‌ব না মা! আমার একার জন্যে ভাবনা কি? এই ত ললিতার মা আছে, নিধু আছে! সত্যিই ত শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়ে দিয়ে চিরকাল মায়ের পায়ে তেলমালিশ করলে ত চল্‌বে না মা!

পার্বতী অনেক তর্কবিতর্কেও মায়ের সংকল্প টলাতে পারল না। তিনি পঞ্জিকা দেখে দিন স্থির করে ফেললেন এবং পার্বতীকে বললেন—আমার জবানী দিয়ে লিখে দাও জয়ন্তকে, সে যেন দুর্ভাবনা না করে। লেখো, আমরা সবাই ভালো আছি। আজ দিকশূল, কাল মঘা—কাজেই পরশুর আগে পাঠানো যাচ্ছে না। আশীর্বাদ দিও!...আর দেখ, আজ রাত্রে প্রভুকে চিঠি লিখতে হবে, একটু সকাল সকাল হেঁসেলপাট চুকিয়ে রেখ!

পার্বতী বলল—তাহ'লে দুখানা চিঠিই রাতে লিখব মা!

—বাঃ, তা কি হয়! জয়ন্তর চিঠি আজকের ডাকেই যাবে যে।

রাত্রে যখন পার্বতী মায়ের কাছে এসে বসল তখন চমৎকারিণী বললেন—আজ যেন শরীরটা তেমন জুৎ নেই পারু!

পার্বতী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—কি হ'ল মা! শরীর আনচান করছে? মাথা ধরেছে?

—না রে, তেমন কিছু নয়। উপোস লেগেছে—তাই বলছিলাম আজ আর প্রভুর চিঠি লিখে কাজ নেই। তুই ত পড়িস নি ওর চিঠি, না!

—বাঃ, তোমার সামনেই ত পড়লাম।

—ও তা'ই নাকি! কি লিখেছে আর একবার পড়ে শোনা ত!

পার্বতীর চিঠি পড়া শেষ হ'লে চমৎকারিণী বললেন—খাঁটি সোনা, ডরোথি হচ্ছে খাঁটি সোনা! আমি একটা কথা ভাবছিলাম, বুঝলি পারু!

পার্বতী উৎসুকভাবে মায়ের মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে রইল।

চমৎকারিণী চোখ বুজে কথা বলছেন—ভাবছি, আর ক'দিনই বা বাঁচব! মিথ্যে ওদের কষ্ট দিয়ে গেলাম সারাটা জীবন ধ'রে। ডরোথি আর প্রভঞ্জনের বিয়েতে মত দিলেই হ'ত। আচ্ছা, এখন যদি লিখে দিই যে, তোমাদের দু'জনকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে তোমাদের বিয়েতে অনুমতি জানাচ্ছি—তাহলে কেমন হয় বল্ ত!

পার্বতী বুঝতে পারে যে, তার মা নিজের মনের সঙ্গে কথা কইছেন, অতএব পার্বতীর মতামত দেওয়ার দরকার নেই। চুপ ক'রে রইল পার্বতী।

চমৎকারিণী বল্লেন—আচ্ছা সেসব কাল ভেবে দেখা যাবে।

পরদিন প্রভঞ্জনকে যে চিঠি দেওয়া হ'ল তাতে পার্বতীর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার খবরটা উল্লেখ করা হ'ল না, পাছে বিদেশে বসে প্রভঞ্জন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় এই আশঙ্কায়। আর বিশেষ ক'রে ডরোথির কথায় লেখা হ'ল—ডরোথি যে চমৎকারিণীর কুশল জিজ্ঞাসা করেছে এতে চমৎকারিণী বিস্মিত হন নি, কারণ তিনি জানেন ডরোথি তাঁর কত আপন। তিনি ডরোথিকে দেখতে পেলে খুবই খুশি হবেন—কিন্তু তেমন সৌভাগ্য কি আর হবে ?

প্রসঙ্গতঃ পার্বতীকে বল্লেন—আমি জানি যে প্রভঞ্জন আমার মত পেলেও ডরোথিকে বিয়ে করবে না, মনে করবে যে, এটা মায়ের মনের কথা নয়, মন-রাখা কথা, তাই ওসব লিখ্লাম না। মিথ্যে মনে কষ্ট দিয়ে কি হবে !

বিকেলের দিকে ললিতার মা নিজের বিছানাপত্র নিয়ে এসে হাজির হ'ল। আজ থেকেই রাত্রে ললিতার মা এখানে থাকবে—শ্রীপতি অবশ্য এখানে খাওয়াদাওয়া করবে আর বস্তিতে ঘর আগ্লাবে।

অনেক ভেবেচিন্তে রমিতা নূতন দু'খানি ছবির চুক্তিপত্রে সম্মতি দিল। এই দু'টি ছবিই সিনেমার পর্দায় শেষ ছবি হবে ওর। এরপর আর নয়। এখন ওর মনে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা—হাসপাতালের জন্য প্রচুর টাকার দরকার, সে টাকা কি ক'রে সংগ্রহ করা যায়! ও মনে মনে স্থির করে রেখেছে—অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা নিজে সংগ্রহ ক'রে দিবে। পারলে, আরও বেশি দেবে রমিতা। তাই, নূতন ছবির কন্‌ট্রাক্ট নিল—এদিকে নার্সিং সম্বন্ধে বাড়িতে ব'সে পড়াশুনোও শুরু করল। পরমেশ ভরসা দিয়েছে, ওর পরীক্ষাটা শেষ হ'লেই হাসপাতালে একটা চাকরী জুটিয়ে দেবে। আপাততঃ সেও পড়াশুনো নিয়ে মহাব্যস্ত। প্রভঞ্জনের চিঠি আসার পর থেকে পরমেশ সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করছে। ললিতাকে সে আর দেখ্তে আসে না, অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পরমেশ বলেছে—"এবার আমাকে পাস করতেই হবে।"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ললিতার এবাড়িতে থাকা প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল। ও এখন এ সংসারের অনেক কাজ দেখাশুনো করে, পরিবর্তনকে সেবাযত্নে মুগ্ধ করেছে। বুড়ো বয়সে এই অযাচিত স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেয়ে পরিবর্তন ললিতাকে আর কাছ ছাড়া করতে চায় না।

সেদিন নফর আসতেই রমিতা বল্‌ল—এবার তোমার বৌকে নিয়ে যেতে পারো।

নফর একটু মাথা চুল্‌কে বল্‌লে—এই ত দেখুন না, নিয়ে যাই-যাই ক'রে অনেক দেরি হ'য়ে গেল। পাড়াতে ভারী গোলমাল, ধরপাকড়-খানাতল্লাসী আর শেষ হচ্ছে না। অনিলাদির মাকে নজরবন্দী করেছে।

পরিবর্তন বারান্দায় বসে বোধহয় সব কথাই শুনেছিল, নইলে হঠাৎ বল্‌বে কেন—তাহলে এত ব্যস্তই বা হচ্ছ কেন—এখানে ত ভালোই আছে ললিতা।

—আজ্ঞে সে আর বল্‌তে? বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে কিন্তু ওর চেহারাটা ফিরে গিয়েছে, সোন্দর লাগছে দেখতে ওকে।

রমিতা বল্‌ল—আমার মনে হয় এখানে এভাবে বসে না থেকে ও আমার সঙ্গে নার্সিং শিখুক।

পরিবর্তন ঘরে উঠে এল—তা নার্সিং শেখাটা খুব ভালো কাজ সন্দেহ নেই। তবে তুইই বা নার্সিং-এর কি জানিস?

—জানি না, কিন্তু শিখ্‌তে ত পারি। এইটুকু মেয়ে, ওর যখন মাথার ওপর বোঝা চাপানো নেই তখন এসব শিখ্‌তে আপত্তি কি?

কতকটা অসহায়ভাবেই নফর বল্‌লে—তা বেশ ত!

পরিবর্তন বুঝে উঠ্‌তে পারল না মেয়ের হঠাৎ এই সেবাবিদ্যার উপর এত ঝোঁক পড়ল কেন। কিন্তু অহেতুক কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ তাই কোনো কথা জিজ্ঞাসা করল না। শুধু বল্‌ল—দেখিস মা, ও মেয়েটাকে ঘর গেরস্থালী থেকে একেবারে টেনে নিস নে। ও বড় ঠাণ্ডা মেয়ে।

রমিতা শান্তকণ্ঠে জবাব দিল—শান্ত মেয়ে ব'লেই কি তার ওপর যা নয় তাই অত্যেচার করতে হবে? তুমি সংসারের কোনো খবরই রাখো না,

অথচ মাঝে পড়ে কথা বল্‌তে যাও কেন বাবা! জানো, ললিতার এই বয়েসের মধ্যে দু'বার সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে! তুমি কি জানো যে, নফরের মত ছাপোষা লোকের ওই সামান্য আয়ে ছেলেপুলে মানুষ করা সম্ভব নয়। ঘর গেরস্থালি কথাটা শুনতে ত খুব মিষ্টি। যে দিনকাল এসেছে এখন প্রত্যেকেরই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করাই ভালো।

পরিবর্তন বল্‌ল—হ্যাঁ, তা ত বটেই। ওরা ত লেখাপড়া শেখেনি। ওদের কাছেও সে প্রয়োজনটা ধরা পড়েছে—তবে কি জানিস, ওরা ঠিক পথটি এখনও দেখ্‌তে পায় নি।

—না বাবা, পথ আমরা সবাই সমান দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সময় লাগ্‌বে একটু। যে পথটা এতদিন চলে চলে মুখস্থ হয়ে গেছে, সেটা ভুল্‌তে ভুল্‌তেও কিছুদিন কেটে যাবে।

নফর যে কখন পিতা এবং কন্যাকে তর্ক-বিতর্কের সুযোগ দিয়ে ললিতার খোঁজে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল তা কেউই লক্ষ্য করে নি।

ললিতাকে নার্সিং শেখাবার কথাটা আগে কখনও মনে হয় নি রমিতার—হঠাৎ কথাটা মাথায় যেমন এসে গেল তেমনি সেটা বেশ শক্ত ক'রে ধরে রাখল রমিতা। সেদিন রাত্রে শোবার আগে রমিতা ললিতাকে নিজের ঘরে ডাকল—আচ্ছা তোমার এতে মত আছে ত?

—আমার মতামতের কি দরকার দিদিমণি, আপনি যা করবেন আমার তাতে ভালোই হবে।

—না, না, তাই বা হতে যাবে কেন? তোমার নিজের মনের সাধ-ইচ্ছে ব'লে একটা কথা থাকতে পারে ত! আমি জোর ক'রে তোমায় দু'চার দিন আমার মতে চালাতে পারি হয়ত, কিন্তু চিরকালত পারব না!

ললিতা চুপ করে রইল।

রমিতা বল্‌ল—ভাখো ললিতা, সংসারে সুখ সকলেই চায়, সুখ না পেলেই ভাগ্যের দোষ দিয়ে হা-হুতাশ করা সোজা কিন্তু সব সময় ভাগ্যকে দায়ী করাটা ভুল। আমরা যদি একটু হিসেব করে পা ফেলি তাহলে অনেক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারি।

—কেমন করে?

—সেটাই ত শিখতে হবে, তোমাকে, আমাকে—আমাদের প্রত্যেকটি প্রাণীকে।

—আমি যে একেবারে লেখাপড়া জানিনা দিদিমণি, শিখব কি ক'রে?

—লেখাপড়া না জানলেও শেখা যায়।

—কই অনিলাদি ত সেকথা বলেন নি। আমায় বলেছিলেন, ম্যাট্রিক পাশ না করলে নার্স হওয়া যায় না।

—সে কথা ঠিক নয়। আমি তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো।

—আপনি কখন কি করবেন? নতুন ছবিতে নামবেন, নিজে শিখবেন, আবার আমাকে শেখাবেন!

বিস্ময়ে ললিতার সরল চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠ্‌ল।

রমিতা বল্‌ল—প্রথম প্রথম একটু খাটতে হবে। তারপর সব অভ্যেস হয়ে যাবে ভাই! তোমরা শুধু পাশে থেকো।

—কী যে বলেন দিদিমণি!

—আচ্ছা, নফর তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছে ত!

—ইস্, তা কেন হবে? তবে—

ব'লে ললিতা অদ্ভুত মমতামাখা দৃষ্টিতে রমিতার মুখের পানে চাইল।

রমিতা বল্‌ল—জানো ললিতা, আজ থেকে দশ বছর পরে তুমি একজন নামকরা মেট্রন হবে।

—সে আবার কী!

—মেট্রন হচ্ছে নার্সদের ওপরওয়ালা। আমাদের একটা মস্ত বড় হাসপাতাল হবে যে! সেই হাসপাতালের জন্যেই ত আমাদের তৈরী হ'তে হ'চ্ছে। বিলেত থেকে ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার ফিরে এলেই আমরা হাসপাতালের কাজে লাগতে পারব!

প্রভঞ্জনের নাম শুনে ললিতা অবাক হয়ে রমিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—ডাক্তার প্রভঞ্জন সরকার খুব বড় ডাক্তার, না দিদিমণি?

—নিশ্চয়। এমন একদিন আস্‌ছে যখন তাঁকে ভারতবর্ষের সবাই এক ডাকে চিন্‌বে।

ললিতা আবেগরুদ্ধ স্বরে বল্‌লে—আমাদের মামাবাবু এতবড় ডাক্তার!

বিস্মিত হয়ে রমিতা প্রশ্ন করল—মামাবাবু মানে?

—হ্যাঁ, আমার মা যে তাঁদের বাড়ি কাজ করে! আমাদের মামাবাবুই ত উনি!

—ও, তাই নাকি? এত দিন ত সেকথা বলো নি কিছু!

—আপনি তাঁকে চেনেন তা কি ক'রে জানব বলুন! মামাবাবুর নিজের হাসপাতাল হবে!

—হাঁ! তিনি বিলেত থেকে চিঠি লিখেছেন যে, ওখানকার মত একটা আদর্শ হাসপাতাল নিজে হাতে গড়ে তুলবেন দেশে ফিরে।

—আর আমরা সেই হাসপাতালে কাজ করব? তা খুব রাজি আছি। তবে দিদিমণি নার্সিং শেখা আমার কম্ম নয়, মামাবাবুর হাসপাতালে ঝি-মেথরাণীর কাজের জন্মেও ত লোক লাগবে, সেই কাজই আমাকে দেবেন! অমন মানুষের কাজ করতে পারাও ভাগ্যি!

—ঝি-মেথরাণীর কাজ বলে ত আলাদা কিছু থাকবে না ভাই! দরকার হ'লে সবাই সব কাজ করবে। তোমায় কাজের যোগ্য হয়ে উঠ্‌তে হবে একথা সব সময় মনে রাখলে দেখবে আর কোনো হাঙ্গামাই থাকবে না।

তারপর কখন কিভাবে যে হাসপাতালের প্রসঙ্গ পার হয়ে তারা প্রভঞ্জনের মহিমাকীর্তন শুরু করেছে তা রমিতা বা ললিতা কেউই টের পায় নি।

পরিবর্তন এসে ললিতাকে ডাকল—মা ললিতা, তোমার শরীর ত খুব সুস্থ নয়, আর জেগে কাজ নেই—যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে।

—ক'টা বেজেছে বাবা!

রমিতা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল। হঠাৎ যেন এভাবে নিজের পরিচয়টা ললিতার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়াতে রমিতার কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।

এতক্ষণ যেন ললিতাকে জোর ক'রেই ধরে রেখেছিল রমিতা। ললিতা চলে গেল। পরিবর্তনও মেয়েকে আর কিছুই বলল না।

একা ঘরে শুয়ে শুয়ে রমিতার মনে ললিতার এতক্ষণের প্রতিটি বাক্য জীবন্ত হয়ে ছবির মত চলাফেরা শুরু করেছে। ললিতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে প্রভঞ্জনের পারিবারিক অনেক কথাই রমিতা জান্‌তে পেরেছে আজ। এতদিন পরে যেন প্রভঞ্জনের সত্যকার পরিচয় পেল রমিতা। রমিতা জানত যে ডরোথিকে প্রভঞ্জন গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে নি, কারণ পুরুষ মানুষের মনে সত্যকার প্রেম ব'লে কিছু বস্তু নেই—মেয়েদের ভালোবাসার প্রভাব কিছুকাল পুরুষের অস্থির মনকে সম্মোহিত করে তখনই পুরুষ বলে—"আমি তোমায় ভালোবাসি।" রমিতার বিশ্বাস ছিল পুরুষের প্রেম বস্তুত: রমণীর প্রেমের প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছু নয়।···কিন্তু আজ ললিতার নানা কথার মধ্যে থেকে বুঝল যে, প্রভঞ্জনের মন ডরোথিকে গ্রহণ করবার জন্য আকুলিবিকুলি করেছে। প্রভঞ্জন যে শুধুই কাজের মানুষ নয়, তার মনটা কেবল কষ্টিপাথরই নয় এ খবরটা অর্ধ পরিচিতা অশিক্ষিতা একটি মেয়ের মুখ থেকে শুনে রমিতা মনে মনে স্বস্তি অনুভব করল। কিন্তু কেবলই স্বস্তি অনুভব ক'রে ক্ষান্ত হওয়া রমিতার সক্রিয় মনের পক্ষে সম্ভব নয়। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই পরমেশকে ডেকে একটা পরামর্শ ক'রে প্রভঞ্জনকে 'কেব্‌ল্' ক'রে দেয়। প্রভঞ্জন যেন ডরোথিকে সঙ্গে নিয়েই দেশে ফেরে—ডরোথি এলে এখানকার হাসপাতালের কাজের পক্ষে মস্ত বড় সুবিধা হবে। ডরোথি নিশ্চয় আস্‌তে রাজী আছে—প্রভঞ্জনের তরফ থেকে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। রমিতার মানসনেত্রে ভেসে উঠ্‌ল, কলকাতার উপকণ্ঠের একটি হাসপাতালের ছবি—তার সঙ্গে যাদবপুর হাসপাতালের বিরাট পরিধির অনেকক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ পরে রমিতা সোজা হয়ে উঠে বসল, বসে বসে দেখতে পেল—সারি সারি বাড়ি, অনেক লোকজন,, অথচ একট' শান্ত পরিবেশ ঘিরে থাকবে, বাগান সাজানো পুকুর বাঁধানো কিছুরই অভাব থাকবে না। প্রভঞ্জন, ডরোথি, রমিতা,পরমেশ, ললিতা আরও অগণিত কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে এই

স্বপ্ন যে বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করবে এতে কোনো সংশয় থাকে না রমিতার।

আপন মনে রমিতা অন্ধকার ঘরে বসে বসে কত বার বল্‌ল—হ্যাঁ, হবে! নিশ্চয় হবে বই কি। এ হ'তেই হবে।

বিংশ শতাব্দীর এক একটি দশক যেন পৃথিবীকে উল্কার বেগে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে শতবর্ষের পথ অতিক্রম ক'রে। মানুষের দাঁড়াবার অবসর নেই, ফিরে চাইবার অবকাশ নেই পশ্চাতের পদাঙ্কের পানে।' দিনের পর দিন দিয়ে বাঁধা থাকে না আজকের পৃথিবীর মানুষের জীবনছন্দ। বিচিত্র ঘটনার প্রবাহ, বিবিধ চিন্তাধারার সংঘাত চিত্তস্থৈর্যের কেন্দ্রকে কক্ষচ্যুত করছে প্রতিনিয়ত। এককালে ছিল যখন গোযান ছিল যাত্রার বাহন, যখন জীবনের গতিতে কারুকার্যের কলাকুশলতা সৌন্দর্যবিকাশের অবসর রাখত। জীবনে অনুভূতির বিস্তার একটা অখণ্ড মালায় গাঁথত বিভিন্ন টুকরো পরিচ্ছেদকে। সৌন্দর্যের চেতনা মানুষের মনে আজও মরেনি, কিন্তু প্রয়োজনের কড়া শাসন তাকে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ দেয়না। মানুষ এসেছে ট্যাঙ্কের যুগ থেকে ইন্‌সেণ্ডিয়ারী বোমার যুগে, তারপর যুগান্তর এসেছে এ্যাটম বোমার আত্মপ্রকাশে, হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কার বল্‌ছে পৃথিবীর মাঠে তার খেলা দেখানো পোষাবে না—এত ছোট জায়গায় ক'টাই বা বোমার খেলা হ'তে পারে! এ ত গেল ধ্বংসরথের জয়গান। কিন্তু মানুষ ত শুধু যারা ধ্বংস করে তারাই নয়—আরও যারা বাঁচবার এবং বাঁচাবার দুরাশার স্বপ্ন দেখছে তারাও এই পৃথিবীরই মানুষ। যাদের হাতে হাতিয়ার নেই, আছে শুধু মনের সুদৃঢ় বিশ্বাস—যারা মানুষের পরিচয় বল্‌তে বোঝে জীবজগতের পরমসুন্দর সৃষ্টি, যাদের চোখে মানুষ অমৃতের পুত্র, তারা এই বিপুল প্রলয়বিধ্বংসকে অতিক্রম ক'রে শাশ্বত মানবতার সুস্নিগ্ধ সুষমার সন্ধান-তপশ্চর্যায় ব্রাত্য।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ঊর্ধে যে চেতনার সাম্রাজ্য সেখানকার নিয়মে এবং নির্দেশ সম্পূর্ণ আলাদা, তারই অমোঘ নিয়মে প্রকৃতির আকাশে শীতের কুয়াশা কাটে, তরুণ কিশলয়ের কচি দল নবজীবনের সমারোহকে অভিনন্দন জানায়

নিঃসঙ্কোচ—এটা জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়মিত গতি, প্রগতির সঙ্গে এর কোনো আত্মীয়তা নেই। কলকাতা শহরের রাজপথে বসন্তের উন্মেষ ঘোষিত হয় নিষ্পত্র শিমুলের শাখা-প্রশাখায় রক্তরঙীন ফুলের মেলাতে, বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশে অনবলোকিত আমমঞ্জরীর অকুণ্ঠ সৌরভে, ভোরের হাওয়ায় হাল্কা কুয়াশার ওড়না ঢাকা মিঠে শীত-শীত পরিবেশে, দুপুর-রোদের গরম আমেজে, দীর্ঘায়িত অপরাহ্নে গোলদীঘির কাপড়ের হাটে ভিড় ঠেলে চলা ভ্রমণপ্রয়াসী নানা বয়সের পুরুষ ও রমণীর চোখের তৃষাদিগ্ধ চাহনিতে।

এতদিনের পিছনে ফেলে আসা অজস্র ঘটনাপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে রমিতা দেখল ঝাপ্‌সা ছায়ার মিছিল ছাড়া আর কিছু নেই। শুধুই কালো—ইসারার মত ছায়ার ভিড়।

মানুষের স্বপ্ন দেখাকে যারা হাজার রকমের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল ব'লে ছাপ দিয়ে দেয় তারাও জানে যে এই স্বপ্নদর্শী মনই মানুষের বাঁচার ...গ অনেকখানি সহায়তা করে। রমিতা যে ঘাত-প্রতিঘাতের পথ দিয়ে ...ছ সে পথে স্বপ্ন যে কোথায় আত্মগোপন ক'রে ছিল সে খবর কারও ...র ছিল না। যে মন একদিন সমাজকে পঙ্গু ক'রে দেব ... শক্তিকে সংহত ক'রে আপনি সংবৃত ক'রে ... ...পর্শে বীণাঝঙ্কার হয়ে উঠল!

...ক একে রাত্রির প্রত্যেকটি প্র... ...ব...

...বি... ...রি...

[illegible]। শুধু কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পরিবর্তনের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠের স্তোত্র পাঠের স্পষ্ট উচ্চারণ।

ও যেন একটা স্বল্প আলোর রেখা দেখতে পেল নিজের সামনে। সেই আলোকপথে অনাগত কালের আশা এগিয়ে আসছে যেন।

ওই অরুণোদয়ের ওপার থেকে কারা যেন হাতছানি দিচ্ছে—ওরাই ত আগামীকালের সম্ভাবনার দল। রমিতা চিনতে [illegible]ছে—ওই ওরা সাড়া দিয়েছে প্রভঞ্জনের কর্মপথের আহ্বানে। [illegible]নের অশথ গাছে কচি পাতাগুলো আন্দোলিত হয়ে অস্পষ্ট ঝিরঝির ধ্বনি জাগাচ্ছে। বিরাট বনস্পতির শাখায় শাখায় যে নূতন পত্রালিকার জন্ম হয়েছে তারাওত সম্ভাবনার বার্তাই বহন ক'রে এনেছে।......

দ্রুতপদে রমিতা নীচে নেমে এসে টেব্‌ললাম্পটা জ্বালিয়ে চিঠি লিখতে বসল প্রভঞ্জনকে। কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে রমিতার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল—ওর মনে ত কোনো দুঃখবোধ নেই, তবু যে এত অ[illegible] কেন ঝরছে রমিতা বুঝতে পারল না।

সমাপ্ত

এসেছে এ্যাটম বোমার [illegible]
পৃথিবীর মাঠে তার খেলা দে[illegible]
বা বোমার খেলা হ'তে পারে [illegible]
মানুষ ত শুধু যারা ধ্বংস করে তারা [illegible] [illegible]বং বাঁচাবার দুরাশার স্বপ্ন দেখছে তারাও এই পৃথিবীরই মানুষ। যাদের হাতে হাতিয়ার নেই, আছে শুধু মনের সুদৃঢ় বিশ্বাস—যারা মানুষের পরিচয় বলতে বোঝে জীবজগতের পরমসুন্দর সৃষ্টি, যাদের চোখে মানুষ অমৃতের পুত্র, তারা এই বিপুল প্রলয়বিধ্বংসকে অতিক্রম ক'রে শাশ্বত মানবতার সুস্নিগ্ধ সুষমার সন্ধান-তপশ্চর্যায় ব্রাত্য।

যুদ্ধ-বিগ্রহের উর্ধে যে চেতনার সাম্রাজ্য সেখানকার নিয়মে এবং নির্দেশ সম্পূর্ণ আলাদা, তারই অমোঘ নিয়মে প্রকৃতির আকাশে শীতের কুয়াশা কাটে, তরুণ কিশলয়ের কচি দল নবজীবনের সমারোহকে অভিনন্দন জানায়